সাহিত্যিকী

সংখ্যা ৫৪ | সেপ্টেম্বর ২০২৪

বাংলা গবেষণা সংসদ

সাহিত্যিকী
বর্ষ ৫৫ | সংখ্যা ৫৪ | আশ্বিন ১৪৩১ | সেপ্টেম্বর ২০২৪

ISSN 1994-4888

সাহিত্যিকী

সেমিনার লাইব্রেরী
তাং. ২০।৭।২৪
বাংলা বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সাহিত্যিকী

সংখ্যা : ৫৪ ॥ সেপ্টেম্বর ২০২৪
বর্ষ : ৬৫ ॥ আশ্বিন ১৪৩১

শহীদ ইকবাল
সম্পাদক

বাংলা গবেষণা সংসদ
বাংলা বিভাগ ॥ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সাহিত্যিকী
(Sahityiki)
চতুঃপঞ্চাশৎ খণ্ড

প্রকাশক
বাংলা গবেষণা সংসদ
বাংলা বিভাগ ॥ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

স্বত্ব
বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী ৬২০৫
বাংলাদেশ

মুদ্রণ
দি সিটি অফসেট প্রিন্টার্স ॥ রাজশাহী
ই-মেইল : thecitypressbd@gmail.com

প্রচ্ছদ
বিপ্লব দত্ত

মূল্য : চারশত টাকা

ISSN : 1994-4888

প্রাপ্তিস্থান : সম্পাদক, *সাহিত্যিকী*, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
ই মেইল : rubanglagobeshona@gmail.com

জ্ঞাতব্য : এ পত্রিকার প্রবন্ধসমূহে প্রকাশিত অভিমত সম্পূর্ণভাবে লেখকের/ লেখকবৃন্দের একান্ত নিজস্ব। এজন্য সম্পাদনা পরিষদ বা প্রকাশক কোনোভাবে দায়ী নন।

SAHITYIKI, Vol. 54, September 2024
Edited by Shahid Iqbal, Professor and Chirman, Department of Bangla, University of Rajshahi, Rajshahi, BANGLADESH. Published by Bangla Gobeshana Sangsad, Department of Bangla, University of Rajshahi; Printed by the The City Offset Printers, Talaimari, Rajshahi.

সাহিত্যিকী

সম্পাদনা পরিষদ
(২০২৩-২০২৪)

সম্পাদনা-পরিষদ

প্রফেসর শহীদ ইকবাল	সম্পাদক
প্রফেসর খন্দকার ফরহাদ হোসেন	সদস্য
প্রফেসর মনিরা কায়েস	সদস্য
প্রফেসর শামীমা হামিদ	সদস্য
প্রফেসর এ কে এম মাসুদ রাজা	সদস্য

বিউপনিবেশায়ন ও নজরুলের অসাম্প্রদায়িকতা

সৈয়দ আজিজুল হক*

সারসংক্ষেপ

কাজী নজরুল ইসলামের অসাম্প্রদায়িক চেতনা বহুল-আলোচিত, বহুল-চর্চিত, প্রমাণিত ও মীমাংসিত একটি বিষয়। এ নিয়ে নতুন করে প্রবন্ধ রচনার আপাতদৃষ্টিতে কোনো অর্থ হয়ত খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু আমরা যখন দেখি, আমাদের সমাজ সাম্প্রদায়িকতা ও অসাম্প্রদায়িকতার বিষয়ে কোনো মীমাংসিত পর্যায়ে উপনীত হতে বারবার ব্যর্থ হচ্ছে তখন আমরা বাধ্য হই নজরুলের দ্বারস্থ হতে। তখন নজরুলের অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিষয়টি হয়ে ওঠে অতিশয় প্রাসঙ্গিক। নজরুল এক্ষেত্রে হয়ে ওঠেন ধ্রুবতারা, হয়ে ওঠেন তুলনাহীন দৃষ্টান্তস্থানীয় এক আদর্শ নাম। তাঁর এই অসাম্প্রদায়িক চেতনার ভিন্ন কোনো তাৎপর্য আবিষ্কারও হয়ত সম্ভব, সম্ভব এক্ষেত্রে নতুন কোনো দিকের উদ্ভাবন বা নতুন কোনো চিন্তার আলো ফেলা। এ প্রবন্ধে তারই প্রয়াসে নিয়োজিত হব আমরা।

এক.

সম্প্রদায়-ভাবনার ঊর্ধ্বে উঠে মানবভাবনায় উন্নীত বা স্থিত হওয়ার বিষয়টির একপ্রকার সমাধান করেছিল ইওরোপীয় রেনেসাঁস।[১] সেই ধরনের চিন্তাই মানবজাতিকে মধ্যযুগীয় পরিসর থেকে আধুনিকতার এক উন্নত প্যারাডাইমে পৌঁছে দিয়েছিল। মানবমণ্ডলীকে সম্প্রদায়-পরিচয়ের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে উদারনৈতিক মানবমহিমায় মণ্ডিত করার এই রেনেসাঁসীয় উদ্যোগের সঙ্গে নানা সীমাবদ্ধতা নিয়েই কিছুটা হলেও একাত্ম হয়েছিল উনিশশতকীয় বাংলার শিক্ষিত প্রাগ্রসর অংশ, যেটি গঠিত হয়েছিল জনগণের একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মাধ্যমে।[২]ফলে সৃষ্টিশীলতা ও জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিকতার বাতাবরণের মধ্যেই রাজধানী কলকাতায় তৈরি হয়েছিল নবজাগরণের এক খণ্ডিত বিকলাঙ্গ পরিবেশ। এই পঙ্গুত্বের মূলে ছিল বাংলায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির ‘বিভক্তির মাধ্যমে শাসন করা’র চাতুর্যপূর্ণ নীতিকৌশল। বাংলার প্রধান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদমূলক সম্পর্ক সৃষ্টির সূক্ষ্ম পরিকল্পনা তাদের ছিল; আর এক্ষেত্রে জমিদারি ব্যবস্থাপনায় ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে’র (১৭৯৩) প্রয়োগই মোক্ষম ফললাভের সুযোগ এনে দিয়েছিল।

মোগল যুগেও জমিদারদের মধ্যে হিন্দু-প্রাধান্য কম ছিল না, কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যেভাবে সমাজের খোলনলচে পালটে দেয়, তাতে সে-প্রাধান্যের তাৎপর্য অনেকখানি বদলেও যায়। নতুন ব্যবস্থায়, কেবল জমিদার নয়, তৃতীয় প্রাকরণিক ক্ষেত্রে [পরিবহণ, সওদাগরি, প্রশাসন] নিযুক্ত ব্যক্তিদের বেশির ভাগই ছিলেন হিন্দু, তাও আবার উচ্চ বর্ণের হিন্দু। রাজভাষা হিসেবে ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজির প্রচলন [১৮৩৫], অন্তত

---

*অধ্যাপক (অব.) ড. সৈয়দ আজিজুল হক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গোড়ার দিকে বর্ণ হিন্দুদের শ্রীবৃদ্ধির সহায়ক হয়। গোটা উচ্চবর্গীয় সমাজটাই চলে আসে তাঁদের হাতে। সে-সমাজ মনকে যে এক দুর্মর হিন্দুকেন্দ্রিকতা আচ্ছন্ন করে নেবে তাতে আশ্চর্য কী। হিন্দু-প্রধান জমিদারদের নিরঙ্কুশ প্রতিপত্তির সুবাদে জমিদার-রায়ত দ্বন্দ্বকে হিন্দু-মুসলমান বিভেদের আদলে সাজিয়ে নেবার পথটাও খুলে যায়। (শিবাজী, ১৯৯১: ২৯)

এরূপ খণ্ডিত অগ্রযাত্রার ফলে কলকাতাকেন্দ্রিক বাংলার নবজাগৃতির চেতনায় যে-অসম্পূর্ণতা নিশ্চিত হয়েছিল সে-বিষয়টি ইতিহাসবিদ ও সমাজতাত্ত্বিক থেকে শুরু করে সাহিত্যসমালোচক অনেকেই যথার্থভাবেই অনুধাবন করতে পেরেছেন। স্মরণীয় প্রাসঙ্গিক একটি মূল্যায়ন:

> ইতিহাসের অনিবার্য আকর্ষণে শতাব্দীর পর শতাব্দীর প্রলেপে কলকাতা নগরীর ক্রমনির্মাণ হয়নি।... কলোনির প্রয়োজনে নির্মিত শহরের বহিরঙ্গের জেল্লা-জৌলুস বড়জোর 'বাবুদের মেলা'। শিল্প-রূপান্তরের প্রবল আকর্ষণে উদ্ভূত শিল্প শহরগুলির মূলে ইংলন্ডীয় জীবনে যে-যন্ত্রণা যে-আবেগ, কলকাতা শহর সৃষ্টির মূলে তা অনুপস্থিত। কলকাতা শুধু বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত জেগে রইল। (সরোজ, ২০০৩: ৫০)

ঔপনিবেশিকতার আশীর্বাদপুষ্ট কলকাতার এই বিচ্ছিন্ন-বিকাশ তার নাগরিকমানসেও সৃষ্টি করেছিল কলোনি-সৃষ্ট আধুনিকতা আর রেনেসাঁস-উদ্ভূত আধুনিকতার এক বিপুল-বিস্তৃত টানাপড়েন, দ্বন্দ্ব-ক্ষোভ। আর এইসব দুর্বলতা ও অপূর্ণতার মধ্যেও রেনেসাঁসীয় মানবতাবোধ যে কারো কারো সৃষ্টি ও কর্মকে দীপ্ত ও উচ্চকিত করে তুলেছিল তারও সাক্ষ্য বহন করে ইতিহাস। একই সমালোচকের আরেকটি অনুধাবন:

> হিন্দু কলেজীয় অত্যুচ্ছ্বাস এবং অনুস্বরবাদীদের মানসিক কার্পণ্য যে কদাচ রামমোহন-বিদ্যাসাগর-মধুসূদন এবং আংশিকভাবে বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রভাবিত করেনি, তার কারণ এইখানে যে কলকাতার নব্যজীবনের মিতপরিসর অতিদীপ্তিকে এঁরা কেউ স্বদেশজীবনের বিকল্প ভাবেননি। এঁদের মানসআকাশে স্বদেশ-বিদেশের ভাববিস্তৃতি সত্ত্বেও এঁদের জীবনের মূল ছিল দেশজ মৃত্তিকায়, ...। এই অর্থে এঁরা কলকাতার বাইরের হওয়া সত্ত্বেও যথার্থ নাগরিক মনের অধিকারী।
>
> কিন্তু এই নাগরিকতার প্রসাদ সমগ্র বাংলাদেশ কখনো লাভ করেনি। (সরোজ, ২০০৩: ৪৯)

নবজাগৃতির এমন অপূর্ণাঙ্গ অথচ মহত্তম পরিবেশের মধ্যেও উনিশ শতকের শেষার্ধে এসে সূচিত হয়েছিল ভিন্নতর এক নতুন ধারা। সত্তরের দশকের শেষ থেকে সূচিত এই নতুন ধারার মূলে ছিল বাঙালি মধ্যবিত্তের স্বপ্নভঙ্গ। উপনিবেশবাদের ছত্রছায়ায় বিকশিত এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি ক্রমশ উপলব্ধি করতে পারে যে, ঔপনিবেশিক প্রভুদের আশীর্বাদেরও সীমা অপ্রতুল। ব্রিটিশ উপনিবেশবাদী শাসনের প্রতি বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তের মোহভঙ্গ শুরু হওয়ার পটভূমিতে তখন কয়েকটি নতুন ধারায় এর প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ত্রিধাবিভক্ত এই নতুন ধারার একটি শাখায় উস্কে উঠেছিল সাম্প্রদায়িক মনোভাব। এই ধারা তিনটিকে এভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। প্রথমত, একটি ধারা আমাদের সকল উন্নত মহিমাকে অস্বীকারের উপনিবেশবাদী প্রচারণার বিপরীতে ইতিবাচকভাবে এদেশের অতীতের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের প্রয়াসে

নিয়োজিত হয়েছিল।[৩] দ্বিতীয়ত, আরেকটি ধারা সংগঠিত হয়েছিল উপনিবেশবাদী শাসননীতির প্রতিবাদ রচনার এমন সব পাটাতনে যেখানে ক্রমান্বয়ে স্বচ্ছ হয়ে উঠেছিল সামাজিক-রাজনৈতিক সচেতনতা।[৪] তৃতীয় ধারাটির ভূমিকা ছিল নেতিবাচক; তারা মোহভঙ্গজনিত হতাশার তিমির থেকে বের হওয়ার উপায় হিসেবে প্রথাগত ধর্মের কিংবা ধর্মীয় চিন্তার পরিসরে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজেছিল।[৫] নিজ ধর্মকে শ্রেয়জ্ঞানের অবিবেচনাপূর্ণ মোহাবিষ্ট সিদ্ধান্তে তাদের মধ্যে উজ্জীবিত হয়েছিল পরধর্মবিদ্বেষ। বাংলার শিক্ষিত মানসের একাংশের মধ্যে এভাবেই যাত্রা শুরু হয় সাম্প্রদায়িকতার।

এরূপ পটভূমিতে রাজধানী কলকাতাকে ঘিরে বঙ্গের রাজনীতিসচেতনতা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠলে বিশ শতকের শুরুতেই তারা 'বঙ্গভঙ্গ'-এর পরিকল্পনা আঁটে। একথা সর্বজনবিদিত যে, ভারতশাসনের সূচনালগ্নে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতির বশবর্তী হয়ে বাঙালির একটি সম্প্রদায়ের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলে সমাজের এই অংশটি নানাভাবে নিজেদের সমৃদ্ধ করার সুযোগ লাভে সমর্থ হয়।[৬] শতাধিক বছরের শাসনশেষে এই সুবিধাপুষ্ট শক্তির একাংশের মধ্যে শাসক সম্বন্ধে মোহভঙ্গ ঘটার পটভূমিতে শাসকশক্তি তাদের 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতিতে কৌশলের পরিবর্তন ঘটায়। 'বঙ্গভঙ্গ'-এর পরিকল্পনা এই নতুনতর কৌশলেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই নতুন শাসন-কৌশলে এতদিনকার সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণির স্বার্থহানির আশঙ্কা সৃষ্টি হলে তাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে তীব্র হয়ে ওঠে বিরুদ্ধবাদী প্রতিরোধমূলক মনোভাব। সেই সঙ্গে জাগ্রত হয় বাঙালিত্বের চেতনাসঞ্চারী স্বাদেশিকতার এক প্রবল আবেগপুষ্ট বোধ। ঔপনিবেশিক শাসকের স্বার্থ, শাসিতের স্বার্থহানি, উত্থিত স্বদেশপ্রেমের ভাবাবেগ ও প্রতিবাদের ঘটনা প্রভৃতির যৌথতায় সংঘাতের যে পরিবেশ রচিত হয় তারই মধ্য থেকে স্ফুরণ ঘটে বাঙালি জীবনের আরেক অভিশাপমূলক চেতনার।[৭] আর সেটি হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা, প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের প্রতি হিংসাত্মক অনুভূতি।[৮] উনিশ শতকের শেষার্ধে উত্থিত সাম্প্রদায়িকতারই ধারাবাহিক ও প্রলম্বিত রূপ এটি। দীর্ঘ-দীর্ঘকাল যাবৎ প্রতিবেশী হিসেবে বসবাসরত বাংলার দুই প্রধান সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে এরকম অনাকাঙ্ক্ষিতভাবেই স্পষ্ট ও তীব্র হয়ে ওঠে পারস্পরিক বিদ্বেষমূলক মনোভঙ্গি।

দুই.

প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, স্বসম্প্রদায়ের কল্যাণকামনা দোষণীয় নয়। সেটাকে যদি আমরা সাম্প্রদায়িকতা বলে আখ্যায়িত করি তাহলে তা হতে পারে প্রশংসনীয়।[৯] কিন্তু স্বসম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার বাসনায় কেউ যদি ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে তাদের ক্ষতিসাধনে উদ্যত হয় সেটা নিশ্চিতভাবে দোষণীয়।[১০] বাংলাভাষী অঞ্চলের হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের একাংশের মধ্যে আমরা গুরুতরভাবে নিন্দনীয় এরূপ

সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত মনোভাব লক্ষ করি। যার পরিণামে সংঘটিত হয়েছে বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও বাংলাভাগের মতো ইতিহাসখ্যাত মর্মান্তিক সব ঘটনা।

কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯–১৯৭৬) বাল্য-কৈশোর-যৌবনসহ লেখকজীবনের পুরোটা কেটেছে এই বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্বমূলক পরিবেশের মধ্যে। কিন্তু বিস্ময়কর হলো, এর কলুষতা তাঁকে কোনোভাবে এতটুকুও স্পর্শ করতে পারেনি। বরং বরাবর তিনি এর বিরুদ্ধতায় ছিলেন অসাধারণভাবে সক্রিয়। তিনি মানুষকে সম্প্রদায়গত বা জাতগত পরিচয়ের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়ে শ্রদ্ধা করেছেন। ব্যক্তিজীবনাচার ও সৃষ্টিশীলতায়, কবিতায়, গানে, কথাশিল্পে, প্রবন্ধে সর্বত্রই তিনি ছিলেন সাম্প্রদায়িক বিভেদমুক্ত উদারনৈতিক জীবনদৃষ্টিসম্পন্ন।

প্রথম কাব্যগ্রন্থ *অগ্নি-বীণা* (১৯২২) তিনি উৎসর্গ করলেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে; যাঁর সম্প্রদায়গত পরিচয় স্পষ্ট, কিন্তু এর চেয়েও তাঁর বড়ো পরিচয়, তিনি ছিলেন স্বদেশি আন্দোলনে জীবননিবেদিত এক বীর। যাঁর প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়ে, যাঁকে বিয়ে করে দাম্পত্যজীবনে সংশ্লিষ্ট হয়ে জীবনব্যাপী একনিষ্ঠ থাকলেন তাঁর প্রণয়ের প্রতি, তিনিও ছিলেন না তাঁর স্বসম্প্রদায়ের। সম্প্রদায়গত চিন্তা যে তাঁকে কখনো কোনোভাবে আলোড়িত করেনি এটা তার প্রমাণ। আসলে এসবের মূলে ছিল বাল্য-কৈশোরের বেড়ে-ওঠার কালের লোকায়ত জীবনের অসাম্প্রদায়িক পরিবেশ যেমন কার্যকর, তেমনি রুশ বিপ্লবের প্রভাব, সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শের প্রতি একাত্মতা, কমিউনিস্ট নেতা মোজাফফর আহমেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব প্রভৃতি অনুষঙ্গও ছিল সক্রিয়। তিনি যখন ইসলামি সংগীতের পাশাপাশি শ্যামাসংগীত রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন, কিংবা খ্রিস্টান-চরিত্রকে কথাশিল্পের বিষয় করে তোলেন, তখন তাঁর মানসিকতায় কোনো একটি সম্প্রদায়ই মুখ্য হয়ে থাকে না। সমগ্র মানবমণ্ডলীর প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধাই এর মধ্য দিয়ে পরিস্ফুটিত হয়।

আমরা জানি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) ছিল ইওরোপীয় উপনিবেশবাদীদের মধ্যেকার সংকটের প্রথম বীভৎস পরিণতি। অথচ এই যুদ্ধকালেই, যুদ্ধের ভয়াবহ সংঘাতময়তার মধ্য থেকেই জন্ম নিল রুশ বিপ্লবের (১৯১৭) মতো বৈশ্বিকভাবে কল্যাণকর ইতিবাচক এক পরম সম্ভাবনাপূর্ণ ঘটনা। বাংলা সাহিত্যেও নজরুলের আবির্ভাব তেমনই এক সদর্থক সম্ভাবনাকে সংকেতময় করে তুলল। এই বক্তব্যের সত্যতা বিচারের জন্য রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রবিরোধীদের মূল দ্বন্দ্বের বিষয়টি স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথের রোম্যান্টিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর আধুনিকতার জন্মদানসূত্রে তিরিশোত্তর কবিকুল অ্যান্টিরোম্যান্টিকতা, ব্যক্তিক হতাশা, নৈরাশ্য, বিচ্ছিন্নতা, অবক্ষয়, গ্লানি আর অনিকেতচেতনার ভাব বহন করে সুন্দর-অসুন্দরের সম্মিলিত রূপ সৃষ্টিতে বদ্ধপরিকর হন। তেমন একটি কালেই তাঁর আবির্ভাব ঘটলেও নজরুল ক্লেদ-গ্লানি-হতাশার পঙ্ক অতিক্রম করে নতুন প্রণোদনা হিসেবে রোম্যান্টিকতারই এক নতুন ভাষ্য উপস্থাপন করলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ

সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়েও যুদ্ধশেষে তাঁর কণ্ঠ থেকেই ধ্বনিত হলো পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ আর উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরোধিতায় তাঁর সাহিত্যে ধ্বনিত হলো যে বিদ্রোহ-প্রতিরোধের উচ্চমাত্রার স্বর তাতে রোম্যান্টিকতার সুর খুঁজে পাওয়া গেলেও এই নিয়েই তিনি হয়ে উঠলেন অনন্য। বিউপনিবেশায়ন প্রক্রিয়ায় তিনিই সবচেয়ে দ্বিধাহীন কণ্ঠ হিসেবে এভাবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান করে নিলেন।

দ্বিতীয়ত, বঙ্গভঙ্গের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি সম্প্রদায়গত বিভাজন নীতিতে যে নতুন কৌশলের আশ্রয় নিল তাতে তাদের দিক থেকে আপাতদৃষ্টিতে মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের একটি বাহ্যিক ভাবমূর্তি তৈরি হলো। কিন্তু নজরুল উপনিবেশবাদী শক্তির বিরুদ্ধে এতটাই নির্দ্বিধভাবে সচেতন ও সোচ্চার ছিলেন যে শাসকশক্তির ওই ধরনের মুখোশধারী কৌশল তাঁর সৎ ও সাহসী লেখনীতে এতটুকু বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়নি। এই যে বলা হচ্ছে, বঙ্গভঙ্গের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতি পক্ষপাতপুষ্ট আচরণ করেছে– সেটা যদি সত্যও হয়– তবু নজরুল এখানে একটা বড়ো দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন যে তিনি উপনিবেশবাদীদের সেই আশীর্বাদপোষণের শিকার না-হয়ে প্রবল বিরোধিতার পরিমণ্ডলে নিজের অবস্থানকে মোটেই অস্পষ্ট রাখেননি। কিন্তু তাই বলে নজরুল স্বসম্প্রদায়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন তাও না। তার কারণ, নিপীড়িত-বঞ্চিতজনের প্রতি নজরুলের অকৃত্রিম মমতা-ভালোবাসার প্রতি কারো কোনো সন্দেহ পোষণের অবকাশ সৃষ্টি হয়নি। তাঁর স্বসম্প্রদায়ের লোকেরা ছিল এদেরই গোত্রভুক্ত।

বরং নিজ সম্প্রদায়ের কল্যাণকামনায় তিনি কী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন সেটাই তৃতীয়ত বিবেচ্য বিষয়। সেটি হলো, ঔপনিবেশিক শোষণে-শাসনে পর্যুদস্ত শ্রেণি হিসেবে উপনিবেশিত জনগণের পক্ষেই তিনি শুধু দাঁড়ালেন না, এই শাসনে বিশেষভাবে 'অপর' হিসেবে বিবেচিত ও পরিকল্পিত বঞ্চনাঘাতে বিপুলভাবে অধঃপতিত শ্রেণি হিসেবে বাঙালি মুসলিম শ্রেণিকে হীনম্মন্যতার অভিশাপ থেকেও মুক্তি দিলেন। বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির সভাগৃহে দীর্ঘ-দীর্ঘকাল কোণঠাসা হয়ে-থাকা এই শ্রেণিটির মুখে সাহিত্যের যথার্থ ভাষা জুগিয়ে তিনি এদের মধ্যে নবজাগরণ সৃষ্টি করলেন।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এটা স্পষ্ট যে, নজরুলের অসাম্প্রদায়িক চেতনা তাঁর বিউপনিবেশায়ন চিন্তার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। তার কারণ, উপনিবেশবাদী রাজনীতিই এদেশে সাম্প্রদায়িক বিভেদ বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নজরুল এই বিভেদকে অতিক্রম করে উপনিবেশবাদী শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করে সর্বসম্প্রদায়ের কল্যাণসাধনে আত্মনিবেদন করেন। বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা পরিহার করে সম্প্রীতির বোধ জাগ্রত করতে প্রয়াসী হন। কেননা, নজরুল জানতেন, 'সাম্প্রদায়িক কলহের দুর্বলতা দিয়ে ভারতের মুক্তি সম্ভব নয়।'[১১] (সৈয়দ আকরম, ১৯৮৫: ৭৫)

নজরুলের অসাম্প্রদায়িক চেতনার একটি গুরুত্বপূর্ণ মহিমান্বিত দিক সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন মোতাহের হোসেন চৌধুরী (১৯০৩-৫৬)। তিনি লিখেছেন, নজরুল যে হিন্দুর ঐতিহ্য নিয়ে লিখলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মুসলিম ঐতিহ্য নিয়ে লিখলেন না, তার কারণ খুবই সোজা। তাঁর মতে, 'হিন্দুর ঐতিহ্যে নজরুলের তথা মুসলমানের উত্তরাধিকার রয়েছে, কিন্তু মুসলমানের ঐতিহ্যে রবীন্দ্রনাথের তথা হিন্দুর উত্তরাধিকার নেই।' (মোতাহের, ১৯৯৫: ১৪৭) তিনি আরো লিখেছেন, হিন্দু-মুসলিম দুই ঐতিহ্যকে 'সংমিশ্রণের দায়িত্ব মুসলমানেরই, হিন্দুর নয়; কেননা হিন্দুর দুই উত্তরাধিকার নয়, মুসলমানের দুই উত্তরাধিকার।' (মোতাহের, ১৯৯৫: ১৪৭) এই পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি যে মন্তব্যটি করেছেন সেটি বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তা হলো: 'উত্তরাধিকারের ব্যাপকতায় মুসলমান হিন্দুর চেয়ে বড়'। (মোতাহের, ১৯৯৫: ১৪৭) এই বিবেচনায়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে নজরুলের অসাম্প্রদায়িক চেতনার তাৎপর্য ও মহিমাকে আমরা অনুধাবন করতে পারি। উপলব্ধি করতে পারি তাঁর শ্রেষ্ঠত্বকে।

তিন.

নজরুলের সাহিত্যে কীভাবে এই অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে তার বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। প্রথমেই যদি তাঁর কবিতার দিকে তাকাই, বিশেষত তাঁর বিখ্যাত 'বিদ্রোহী' (১৯২১) কবিতার অবয়বগত উপাদান বিচার করি, তাহলে সহজেই আমরা ভারতীয় ও গ্রিক পুরাণের পাশাপাশি পশ্চিম এশীয় মিথের এক দেহে লীন হওয়ার বিষয়টি বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করব। বাইরের কাঠামো-বিচারে পুরো কবিতার অধিকাংশ স্থান জুড়েই ভারতীয় পুরাণের প্রাধান্য। অথচ পুরো কবিতার ভাবাকাশ জুড়ে রেনেসাঁসের মর্মবাণীই প্রাধান্য বিস্তার করেছে। পুরো কবিতা জুড়ে উড্ডীন হয়েছে মানবমহিমার বিজয়কেতন। সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতাকে পদপিষ্ট করেই এ কবিতায় গীত হয়েছে সর্বমানবের জয়গান। এটিই নজরুলের জীবনাদর্শ ও শিল্পদৃষ্টির মর্মকথা। 'কোরবানী' কবিতার দিকে যদি তাকাই তাহলে ওর নামটাই শুধু একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় আচারের ইঙ্গিত বহন করে। কিন্তু এ কবিতার ভাবলোকে বিরাজ করে ভিন্নতর সত্য। কবিতার প্রথম পঙ্ক্তি– 'হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্বোধন' (নজরুল, ১৯৯৩: ৩৬)– প্রকাশ করে এর মৌলবাণী। হত্যার মধ্য দিয়ে 'কোরবানী' পালনের পরিবর্তে তিনি চান ত্যাগ-স্বীকার ও শক্তির উদ্বোধনের মাধ্যমে সত্যকে গ্রহণ বা বরণ করতে। সমকালের ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তিকল্পে, তিনি 'কোরবানী' নামক ধর্মীয় আচারের প্রবর্তনসংক্রান্ত ইতিহাসের আভ্যন্তর-সত্য হিসেবে বৃহত্তর স্বার্থে ত্যাগধর্মী মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, শাসক-নিপীড়কের বিরুদ্ধে শক্তিমান হয়ে ওঠার আহ্বান জানান। সমকালীন রাজনীতিতে গান্ধীর 'সত্যাগ্রহ' আন্দোলনের পটভূমিতে নজরুলের 'সত্য-গ্রহ' শব্দ ব্যবহারের পার্থক্যটুকু অনুধাবনীয়। বৃহত্তর

মানবের কল্যাণসাধনই যে কবির কাম্য সেটাই অভিব্যক্ত হয়েছে পুরো কবিতার অবয়ব জুড়ে। 'কামাল পাশা' কবিতায় এই তুর্কি শাসকের যে বন্দনা তিনি করেছেন তার মূলে নিহিত ওই রাষ্ট্রনায়কের ধর্মনিরপেক্ষ, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক, মানবপ্রেমিক ও নিঃস্বার্থপর বৈশিষ্ট্য।

'জাতের বজ্জাতি' কবিতাটি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এ কবিতায় তিনি ভারতবর্ষীয় সনাতন ধর্মের চতুর্বর্ণ প্রথার অন্তর্গত জাতপাত বৈষম্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর মতে, জাতের নামে আসলে চলছে 'বজ্জাতি' আর 'জুয়া'র 'জালিয়াতি'। এই প্রথার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে অস্পৃশ্যতার যে বিবেকহীন নিষ্ঠুর অমানবিক রীতি প্রচলিত, নজরুল তাঁর প্রতিবাদী বয়ানে এর অন্তঃসারশূন্যতা তুলে ধরেছেন। শাস্ত্রের নাম করে যারা মনুষ্যত্ববিবর্জিত এসব অভ্যাসের দাসত্ব করে, কবি তাদের মূর্খ ও জড়বুদ্ধিসম্পন্ন বলে আখ্যায়িত করেছেন। বলেছেন, শাস্ত্রের চেয়ে সত্য বড়ো। এই সত্য হলো, কোনো মানুষকে ঈশ্বর ছোটো বড়ো করে সৃষ্টি করেননি। কবির ভাষায়: 'সকল জাতই সৃষ্টি যে তাঁর, এ বিশ্ব-মায়ের বিশ্ব-ঘর,/মায়ের ছেলে সবাই সমান, তাঁর কাছে নাই আত্ম পর।' (নজরুল, ১৯৯৩: ১১৭) এ প্রসঙ্গে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা কবি বলেছেন, স্রষ্টার কাছে যখন তাঁর সকল সৃষ্টিই সমান, তখন স্রষ্টার সৃষ্টিকে ঘৃণা করে স্রষ্টাকে পূজা করার বিষয়টি আসলে অর্থহীনতায় পর্যবসিত। আরো গুরুত্বপূর্ণ হলো, নজরুলের বিবেচনায় জাতপাত বৈষম্যের মধ্যেই নিহিত সাম্প্রদায়িকতার ঘৃণ্য বীজ। তাঁর অসাম্প্রদায়িক চেতনাই এই ঘৃণ্য ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর লেখনীকে উজ্জীবিত করেছে।

স্রষ্টার সকল সৃষ্টি যে সমান এই বোধটি প্রবলভাবে ব্যক্ত হয়েছে *সাম্যবাদী* কাব্যগ্রন্থের প্রত্যেকটি কবিতায়। বিশেষ করে এই কাব্যের 'সাম্যবাদী', 'মানুষ' ও 'নারী' কবিতা তিনটি বিশ্লেষণ করলেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি, তার বৈষম্যহীন সমমর্যাদার বিষয়টি স্পষ্ট হবে। 'সাম্যবাদী' কবিতার শুরুতেই বলেছেন, তিনি সেই সাম্যের গান গাইতে চান, যেখানে এসে সব বাধা-ব্যবধান দূর হয়ে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-ক্রিশ্চান সব একসূত্রে মিলিত হতে পারছে। মনুষ্যত্ব বা মানবতার এই মিলনাকাঙ্ক্ষা থেকেই তিনি মানুষের হৃদয়েই খুঁজতে চাইছেন সকল শাস্ত্র, ধর্ম ও দেবতাকে। কেননা, কবির মতে, শুধু এসবই না, সকল ধর্মের সকল তীর্থস্থানেরও অধিষ্ঠান এই মনুষ্যচিত্তই। সকল ধর্ম-প্রবর্তকও আপন হৃদয়-ধ্যানের মাধ্যমে মহাসত্যের পরিচয় লাভ করেছেন। সে-কারণেই তাঁর উক্তি: 'এই হৃদয়ের চেয়ে বড়ো কোনো মন্দির-কাবা নাই'। (নজরুল, ১৯৯৩: ২৩৩)

'মানুষ' কবিতায় সাম্যের গান গাইতে গিয়ে সকল ধর্ম-জাতির ভেদ ঘুচিয়ে দিয়ে মানুষতত্ত্বকেই তিনি দিয়েছেন সর্বোচ্চ মর্যাদার আসন : 'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান!' (নজরুল, ১৯৯৩: ২৩৪) ধর্মপ্রবর্তকগণ মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণায় সহানুভূতিপরায়ণ হয়েই মানবমুক্তির কথা ভেবেছেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ধর্মালয়

জুড়ে মোল্লাতন্ত্র ও পুরোহিততন্ত্রের যে সর্বময় কর্তৃত্ব সৃষ্টি হয়েছে, ধর্মপ্রবর্তকগণের চিন্তার বিপরীত, আর সে-কারণেই তার অবসান কামনা তিনি করেছেন। মানুষকে ঘৃণা করে যারা ধর্মগ্রন্থ শাস্ত্রগ্রন্থ চুম্বন করে ধর্মের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে তাদের তিনি স্বার্থপরায়ণ ভণ্ড বলে আখ্যায়িত করেছেন। স্বার্থান্বেষী এসব ধর্মব্যবসায়ী প্রতারক-দলের সংকীর্ণ আচরণের কারণেই ধর্মালয় থেকে মানুষ বিতাড়িত হয়েছে। স্বার্থবাদী লোভীদের কর্তৃত্ব থেকে ধর্মালয়গুলোকে মুক্ত করে সেখানে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা তাঁর কাম্য।

মানুষকে এভাবে তিনি ধর্ম-সম্প্রদায়ের সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি দিয়ে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী। শুধু তাই না, নারী-পুরুষকে পুরুষতান্ত্রিক চিন্তার ভেদ থেকেও তিনি মুক্তি দিতে চেয়েছেন। 'নারী' কবিতায় সাম্যের গান গাইতে গিয়ে তিনি বলেছেন, মনুষ্যত্বের প্রশ্নে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য তিনি দেখেন না। তাঁর দৃষ্টিতে, বিশ্বের চির-কল্যাণকর মহৎ সৃষ্টিসকলের মূলে রয়েছে নারী-পুরুষ উভয়ের সমান অবদান। এরই পাশাপাশি নজরুল বিশ্বের সকল অকল্যাণ-অশ্রুর জন্যও নর-নারী উভয়ের দায় স্বীকার করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি ব্যক্ত করেছেন একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য। আদি-পাপের জন্য নারীকে যে এককভাবে দায়ী করা হয় তাকে অস্বীকার করে তিনি পুরুষকেও সমানভাবে দায়ী করেছেন। বলেছেন, শুভবোধ কিংবা অপরাধপ্রবণতা নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে সমানভাবে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। তাঁর অসাম্প্রদায়িক চেতনার সঙ্গে মনুষ্যত্ববোধের যে নিবিড় সম্পর্ক সেই সূত্র ধরেই পুরুষতন্ত্র-সৃষ্ট নর-নারীর মধ্যেকার বৈষম্যকে বাস্তবতাবিবর্জিত বলে মনে করেন তিনি।তাঁর অসাম্প্রদায়িক চেতনা নর-নারীর ভেতরকার ব্যবধান নীতি নিরসনেও কার্যকর থেকেছে।

চার.

প্রবন্ধে নজরুল আরো বেশি স্পষ্টভাষী ও উচ্চকণ্ঠ। সাম্প্রদায়িক হিংসা-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে এখানে নিজ লেখনীকে তিনি করে তুলেছেন অতিমাত্রায় তীক্ষ্ণ ও ক্ষুরধার। 'নবযুগ' প্রবন্ধে তিনি নবযুগের মন্ত্রবাণী হিসেবে ধর্ম-বিদ্বেষহীন, জাতি-বিদ্বেষহীন, আভিজাত্য-অভিমানহীন তারুণ্যদীপ্ত বীরত্বব্যঞ্জকতাকেই গুরুত্ববহ বলে নির্দেশ করেছেন। সকল ধর্মের অনুসারীদের প্রতি তিনি উদারনৈতিক, সত্যনিষ্ঠ ও পরার্থপর ভ্রাতৃ সম্বোধন করে নির্বিবাদী জীবন নির্বাহের আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর ভাষায়: 'এস ভাই হিন্দু! এস মুসলমান! এস বৌদ্ধ! এস ক্রিশ্চিয়ান! আজ আমরা সব গণ্ডী কাটাইয়া, সব সংকীর্ণতা, সব মিথ্যা, সব স্বার্থ চিরতরে পরিহার করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভাই বলিয়া ডাকি। আজ আমরা আর কলহ করিব না।' (নজরুল, ১৯৯৩: ৮১১) কবির এই আহ্বানের মধ্যে দেশের জন্য কল্যাণবোধের তীব্র আকাঙ্ক্ষাই অভিব্যক্ত।

'ছুৎমার্গ' প্রবন্ধটিতে কবি নিজেই সর্বসম্প্রদায়ের মধ্যেকার তাঁর এই মিলনাকাঙ্ক্ষাকে অন্যভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'সত্যিকার মিলন আর স্বার্থের মিলনে আসমান-জমিন তফাৎ।' (নজরুল, ১৯৯৩: ৮২২) এই উপলব্ধিটি বাস্তবতাসম্মত।

কারণ তিনি দেখেছেন, সমাজের অনেক লোকই অন্তর্তাগিদের বশবর্তী না-হয়ে বিচিত্র-সব স্বার্থের অনুবর্তী। কিন্তু কবির মতে, সত্যিকার মিলন আনতে হলে স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে অন্তরের অন্তস্তল থেকে আহ্বান জানানো জরুরি। কবি মনে করেন, সত্তার শুদ্ধতা থাকলে স্বধর্মে নিষ্ঠাবান হয়েও বিশ্বপ্রেমে উচ্চকিত হওয়া সম্ভব, সম্ভব সীমার মধ্যে থেকেও অসীমের সুর-ব্যঞ্জনা সৃষ্টি, জাত-ধর্মনির্বিশেষে সকলকে আন্তরিকভাবে আলিঙ্গনের শক্তি অর্জন। এই প্রবন্ধে নজরুল একই ধর্মের মধ্যেকার জাতপাত-বৈষম্য সম্বন্ধে ধিক্কার দিয়েছেন। বলেছেন, মানুষ হয়ে মানুষকে কুকুর-বিড়ালের মতো ঘৃণা করা মনুষ্যত্বের পাশাপাশি আত্মারও অবমাননা। সেজন্য তিনি মানবধর্মে স্থিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। বলেছেন, 'হিন্দু হিন্দু থাক, মুসলমান মুসলমান থাক, শুধু একবার এই মহাগগনতলের সীমা-হারা মুক্তির মাঝে দাঁড়াইয়া– মানব!– তোমার কণ্ঠে সেই সৃষ্টির আদিম বাণী ফুটাও দেখি! বল দেখি, "আমার মানুষ ধর্ম।"... মানবতার এই মহা-যুগে একবার গণ্ডী কাটিয়া বাহির হইয়া আসিয়া বল যে, তুমি ব্রাহ্মণ নও, শূদ্র নও, হিন্দু নও, মুসলমান নও, তুমি মানুষ– তুমি সত্য।' (নজরুল, ১৯৯৩: ৮২৩-২৪) নজরুল ধর্ম-সম্প্রদায়-জাতপাত বৈষম্যের ঊর্ধ্বে উঠে চিরকালীন মানবতার এই বাণীই বহন করেছেন, মনুষ্যধর্ম বা মানবধর্মকেই মানুষের পরম ধর্ম বলে বিবেচনা করেছেন।

নজরুল রেনেসাঁসের মর্মবাণীকেই সর্বাংশে আত্মস্থ করেছেন। মানুষের মধ্যে কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায়গত, বর্ণগত, জাতপাতগত, শ্রেণিগত, অঞ্চলগত, জেন্ডারগত সর্বপ্রকার বিভেদ-বৈষম্যের বিরুদ্ধেই ছিল তাঁর দৃঢ় নৈতিক অবস্থান। উপনিবেশবাদের বিরোধিতা বা উপনিবেশবাদ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যেমন তাঁর অসাম্প্রদায়িক চেতনার গভীর সম্পর্ক তেমনি তা ব্যাপ্ত হয়েছে সকল প্রকার বৈষম্য-বঞ্চনার বিরোধিতায়। তিনি দেখেছেন, শোষণ-মূলক ব্যবস্থার সবচেয়ে ঘৃণিত সর্বগ্রাসী রূপ উপনিবেশবাদের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে সকল ন্যায়পরতাকে ধ্বংস করে শেকড়ায়িত হয়েছে। সুতরাং একে উন্মূলিত করতে না পারলে মনুষ্যত্বের ন্যায় প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর নয়। তাই নিজ সাহিত্যে যেমন তিনি সর্বমানবিক সাম্যের আকাঙ্ক্ষা বারবার ব্যক্ত করেছেন, তেমনি ব্যক্তিজীবনেও তা সততার সঙ্গে অনুসরণ করেছেন।

টীকা

১. মোতাহের হোসেন চৌধুরী তাঁর 'রিনেসাঁস : গোড়ার কথা ও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন, রেনেসাঁসের ফলে 'মানবমহিমা মেঘমুক্ত সূর্যের মতো প্রকাশিত হয়ে এই উজ্জ্বল প্রভাতের সৃষ্টি করলে।' (মোতাহের, ১৯৯৫: ৪৪) আরো লিখেছেন, 'মনুষ্যত্বে এই অপরিসীম শ্রদ্ধা, এ-ই রেনেসোঁসের গোড়ার কথা।' বা, 'রিনেসাঁসের মর্মকথা এই মানবতা।' (মোতাহের,১৯৯৫: ৪৬-৪৭)। গোলাম মুরশিদ লিখেছেন: 'রেনেসন্সের ঐতিহাসিক ইয়াকব বুর্কহার্টের ভাষায়, রেনেসন্সের ফলে মানুষের দৃষ্টি পারলৌকিকতা থেকে ইহলৌকিকতার দিকে মোড় নিয়েছিলো। অলৌকিক ও ধর্মকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি মানবমুখী হয়েছিলো।' (গোলাম, ২০১৫: ১১২)
২. এই শিক্ষিত প্রাগ্রসর অংশটি গঠিত হয়েছিল জনগণের একটি সম্প্রদায়ের মাধ্যমে। ঔপনিবেশিক প্রভুশক্তি শাসনের যে বিভদাত্মক নীতি নিয়েছিল তার সমগ্র সুবিধা লাভেই ধন্য হয়ে যে উচ্চবিত্ত-

মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে উঠেছিল তার সবটাতেই নিরংকুশ আধিপত্য বিস্তার করেছিল বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়। (দ্রষ্টব্য: শিবাজী, ১৯৯১: ২৮-২৯)

৩. উপনিবেশবাদীদের প্রচারণা ছিল, তারা শোষণ-শাসনের উদ্দেশ্যে এদেশে আসেনি, এসেছে বর্বরতা আর পশ্চাৎপদতার অন্ধকার থেকে আমাদের উদ্ধার করার মতো মহৎ কর্মযোগে। তাঁদের প্রচারণার সারকথা ছিল, শিক্ষা-সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য কোনো ক্ষেত্রেই আমাদের কোনো সমৃদ্ধ অতীত নেই, এটা একমাত্র তাদের অর্থাৎ পাশ্চাত্যেরই আছে। সুতরাং তারা এসেছে আমাদের সর্বক্ষেত্রে আলোকিত করতে। উপনিবেশবাদীদের এই মিথ্যাচারকে ভুল প্রমাণিত করতে একদল আলোকিত বাঙালি আমাদের সমৃদ্ধ অতীত পুনরুদ্ধারের কাজে মনোনিবেশ করেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীনেশচন্দ্র সেন, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার প্রমুখের নাম এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এঁরা কেউ বৌদ্ধ সাহিত্য, কেউ বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন 'চর্যাপদ', কেউ 'বৈষ্ণব পদাবলি', কেউ 'লোকছড়া', কেউ 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'সহ 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা', কেউ 'ঠাকুরমার ঝুলি' প্রভৃতি আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে আমাদের সমৃদ্ধ অতীত ঐতিহ্যকে বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করে বাঙালিকে হীনম্মন্যতা থেকে মুক্ত করার পাশাপাশি উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থানও স্পষ্ট করেন।

৪. দ্বিতীয় ধারায় একে একে গড়ে ওঠে 'হিন্দু মেলা' (১৮৬৭)র মতো স্বাদেশিক চেতনার প্রতিষ্ঠান, 'ইন্ডিয়ান লীগ' (১৮৭৫), 'ভারত সভা' (১৮৮১)সহ নানা পেশা-বৃত্তির সংগঠন, এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের (১৮৮৫) মতো রাজনৈতিক সংস্থা । এসব সংগঠন উপনিবেশবাদের সঙ্গে সরাসরি বিরোধে না জড়ালেও যার যার অবস্থান থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিজেদের বক্তব্য ও দাবি উপস্থাপনে সক্রিয় হয়। উপনিবেশবাদের স্বার্থপুষ্ট পরিকল্পনার বাইরে এসব সংস্থা স্বাদেশিক স্বার্থসমন্বিত চিন্তার প্রসারে মেলে ধরে স্বকীয় স্বর।

৫. ধর্মকেন্দ্রিক এই ধারার উল্লেখযোগ্য নাম বিবেকানন্দ। কিন্তু সাহিত্য পরিমণ্ডলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)। রেনেসাঁ দ্বারা পরিপুষ্ট বঙ্কিম, যিনি 'সাম্য' (১৮৭৯) প্রবন্ধ লেখেন, তিনি শেষপর্যন্ত ধর্মে আশ্রয় নেন। লেখেন 'কৃষ্ণচরিত্র' (১৮৮৬), 'ধর্মতত্ত্ব অনুশীলন' (১৮৮৮)। 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬) আর 'বিষবৃক্ষে'র (১৮৭৩) লেখক শেষকালে লেখেন 'আনন্দমঠ' (১৮৮২), 'রাজসিংহ' (১৮৮২) কিংবা 'সীতারাম' (১৮৮৮), যা উস্কে দেয় পরধর্মবিদ্বেষ। ১৮৮৪ সালের শ্রাবণ মাসের 'প্রচার' পত্রিকায় লেখা বঙ্কিমের 'হিন্দুধর্ম' শীর্ষক প্রবন্ধের জবাব দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'ভারতী'তে; প্রবন্ধের নাম ছিল 'একটি পুরাতন কথা'। বঙ্কিমের প্রবন্ধে বলা হয়েছিল, লোকহিতার্থে বা ধর্মার্থে মিথ্যা বলা প্রয়োজনীয় হলে কৃষ্ণোক্তি স্মরণপূর্বক তা বলা যেতে পারে। এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত করতে উদ্যত। রবীন্দ্রনাথের মতে, 'কোনোখানেই মিথ্যা সত্য হয় না; শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমবাবু বলিলেও হয় না, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিলেও হয় না।' (প্রভাতকুমার, ১৪২০: ২০৫-২০৬)

৬. চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কথা আগেই বলা হয়েছে। আরেকটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে। একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এরকম: '১৭৫৭ থেকে ১৭৮৫, এই ক-বছর কলকাতার প্রধান ব্যবসায়ীদের বেশির ভাগই ছিলেন উচ্চবর্ণ হিন্দু'। (শিবাজী, ১৯৯১: ২৬)

৭. সেটি হলো, বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের সময় হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যেকার বিরোধমূলক দিকটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ ব্যাপারে সবচেয়ে যথার্থ বিশ্লেষণটি করেছেন রবীন্দ্রনাথ। ইংরেজ মুসলমানদের গোপনে হিন্দুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করছে এমন অভিযোগ বিশ্লেষণ করে 'ব্যাধি ও প্রতিকার' (১৯০৭) শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বলেন, একথা যদি সত্যও হয় তবু ইংরেজদের এমন সুযোগসন্ধানী কার্যক্রমে রাগ করে তো কোনো লাভ নেই। বরং ভাবা দরকার ছিদ্র না জেনে শনি তো প্রবেশ করতে পারে না। শনির চেয়ে ছিদ্র সম্পর্কেই বেশি সাবধান হওয়া দরকার। তিনি আরো

বলেন, হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধ নিয়ে আমাদের দেশে অনেক দিন ধরে চলে আসা একটা পাপ আছে। এর ফল ভোগ না করে আমাদের নিষ্কৃতি নাই। দুই সম্প্রদায়ের ভেতরকার কলুষতার দিকটি বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে এমন বীভৎস আকারে দেখা না দিলে হিন্দু সমাজ একে স্বীকারই করত না। (দ্র. রবীন্দ্রনাথ, ২০১৬: ৫৬১-৫৬২)

৮. দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেকার এই দূরত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'লোকহিত' প্রবন্ধে বলেন, বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে মুসলমানরা যে এক হতে পারেনি তার কারণ, তাদের সাথে আমরা কোনোদিন হৃদয়কে এক হতে দেইনি। বাংলাদেশে নিম্নশ্রেণির মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা যে বেড়ে গেছে তার একমাত্র কারণ, হিন্দু ভদ্রসমাজ এই শ্রেণিকে হৃদয়ের সঙ্গে আপন বলে টেনে রাখেনি। (দ্র. রবীন্দ্রনাথ, ২০১৬ক: ৪০৮-৪০৯)

৯. এ ব্যাপারে স্মরণীয় কলম-সৈনিক আবদুল হকের ভাষ্য: 'সাম্প্রদায়িক অনুভূতি সেই পর্যন্ত সমর্থনীয় যে-পর্যন্ত তা ভালো অর্থে সমাজ-শৃঙ্খলা রক্ষার ও ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য বিকাশের অনুকূল, যে-পর্যন্ত স্ব-সম্প্রদায়ের প্রতি সম্প্রীতির পরিপোষক এবং স্ব-সম্প্রদায়ের মঙ্গল-চিন্তায় অনুপ্রাণিত।' (আবদুল হক, ১৩৮০/১৯৭৩: ৬৭)

১০. আবদুল হকের মূল্যায়ন হলো, 'সাম্প্রদায়িকতার (সব রকম সাম্প্রদায়িকতার) যে-সব অভিব্যক্তি আমরা এ যাবৎ দেখেছি তাতে এই ভাবাবেগের লক্ষ্য যতোটা না স্ব-সম্প্রদায়ের প্রতি সম্প্রীতি, তার চাইতে অনেক বেশী অপর সম্প্রদায়ের প্রতি অপ্রীতি; যতোটা না স্নিগ্ধ হৃদয়বৃত্তি, তার চাইতে অনেক বেশী অসূয়াবৃত্তি।' (আবদুল হক, ১৩৮০/১৯৭৩: ৬৭)

১১. নজরুল এও জানতেন, 'হিন্দু-মুসলিম ঐক্য কেবল স্বার্থের প্রয়োজনে হলে ব্যর্থ হবে। সে-মিলন ও ঐক্য আবশ্যক আত্মিক উদারতার ভিত্তিতে।' (সৈয়দ আকরম, ১৯৮৫: ৭৫)

গ্রন্থপঞ্জি

আবদুল হক, ১৩৮০/১৯৭৩, 'সাম্প্রদায়িকতা ও সংস্কৃতি', *বাঙালী জাতীয়তাবাদ এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বইঘর, চট্টগ্রাম।

কাজী নজরুল ইসলাম, ১৯৯৩, *নজরুল-রচনাবলী* প্রথম খণ্ড, আবদুল কাদির সম্পাদিত, (প্র প্র ১৯৬৬), বালা একাডেমী, ঢাকা।

গোলাম মুরশিদ, ২০১৫, *রেনেসন্স, বাংলার রেনেসন্স*, অবসর, ঢাকা।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ১৪২০/২০১৪, *রবীন্দ্রজীবনী*১ম খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ মাঘ ১৪২০ (প্র প্র ১৩৪০/১৯৩২), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা।

মোতাহের হোসেন চৌধুরী, ১৯৯৫, *মোতাহের হোসেন চৌধুরী রচনাবলী* প্রথম খণ্ড, সৈয়দ আবুল মকসুদ সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২০১৬, *রবীন্দ্র-রচনাবলি*: একাদশ খণ্ড, সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত, ঐতিহ্য, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২০১৬ক, *রবীন্দ্র-রচনাবলি*: ত্রয়োবিংশ খণ্ড, সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত, ঐতিহ্য, ঢাকা।

শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৯১, *গোপাল-রাখাল দ্বন্দ্ব সমাস/ উপনিবেশবাদ ও বাংলা শিশুসাহিত্য*, প্যাপিরাস, কলকাতা।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০০৩, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, পঞ্চম সংস্করণ: দে'জ পাবলিশিং (প্র প্র ১৯৬১), কলকাতা।

সৈয়দ আকরম হোসেন, ১৯৮৫, 'নজরুলের প্রবন্ধ: চেতনাপ্রবাহ ও শিল্পমান', *বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলাএকাডেমী, ঢাকা।

রফিকুন নবীর কাঠখোদাই চিত্র : রঙ, রেখা ও বিরচনের নৈপুণ্যেমোড়া আখ্যান

মো. বনি আদম*

সারসংক্ষেপ

রফিকুন নবী বাংলাদেশের শিল্পজগতে এক বহুমুখী প্রতিভার নাম। প্রবলভাবে রাজনীতিসচেন, সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ এ শিল্পী একজন কিংবদন্তীতুল্য কার্টুনিস্ট। তাঁর সৃষ্ট 'টোকাই' চরিত্র সামাজিক নানা অসঙ্গতি, বিভেদ-বৈষম্য, রাজনৈতিক কপটতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে থাকা এক পথশিশু, যে কণ্ঠে ধারণ করেছে জনমানসের ভাষা। প্রচ্ছদ ও অলংকরণচিত্রেও নবীর অসামান্য নৈপুণ্য লক্ষ করা যায়। লেখালেখিতে তিনি সমানভাবে দক্ষ। রফিকুন নবীর চিত্রতলে ধরা দিয়েছে জন-জীবনের কথা, প্রকৃতির বৈচিত্র্যময়তা। রেখাচিত্রে তাঁর প্রবল প্রাণশক্তি অনুভব করা যায়– বলা যায় শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের যোগ্য উত্তরসূরি। এ শিল্পী ছাপচিত্রী হিসেবেও চূড়াস্পর্শী খ্যাতি অর্জন করেছেন। রফিকুন নবী বাংলাদেশে বৃহৎ পরিসরের রঙিন ছাপচিত্রে নবদিগন্তের সূচনা করেন। এ প্রবন্ধে মূলত রফিকুন নবীর কাঠখোদাই ছাপচিত্র নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

বাংলার নদী, জল, সুউচ্চ পাহাড় আর সুবিশাল সমুদ্র, রাঙাধুলোর মেঠোপথ বেয়ে চলা রাখালের গরু-মহিষের দল, বাংলার বৈচিত্র্যময় প্রকৃতির সাথে পশু-পাখি ও মানুষের সম্পর্কের নিবিড়তা, সর্বোপরি ভূমিলগ্ন খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের নিত্যদিনের জীবনচিত্র তাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার কথামালা কখনও জলরঙে, কখনও তেল বা অ্যাক্রেলিক রঙে আবার কখনোবা কাঠের বুক চিরে নরুনের আঁচড়ে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে দৃশ্যবদ্ধ হয়ে ধরা দিয়েছে যে শিল্পীর হাতে তিনি বরেন্দ্রভূমিপুত্র– রফিকুন নবী। তিনি চিত্রকলার প্রায় সকল মাধ্যমে সিদ্ধহস্তে হলেও বাংলাদেশের ছাপচিত্রকলায় রঙিন উডকাট মাধ্যমে স্বকীয় ভুবন রচনা করেছেন। বলা যায় যে, এ মাধ্যমে তিনি পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন। বিচরনের মুন্সিয়ানা আর উজ্জ্বল রঙের সৌকর্যে সৃষ্টি করেছেন তাঁর কাঠখোদাই চিত্রের রঙিনভুবন।

রফিকুন নবীর শিল্পযাত্রা

১৯৫৯ সালে 'গর্ভনমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস'-এর শিল্পশিক্ষা থেকে ১৯৭৩-৭৬ সালে গ্রিসের 'এথেন্স স্কুল অব আর্টস' পর্যন্ত রফিকুন নবীর একাডেমিক শিক্ষাগ্রহণের কালপর্ব, এ দীর্ঘ শিল্পপরিসরে নবী প্রতিনিয়ত নিজেকে ঋদ্ধ করেছেন। শিল্পকলার নানা মাধ্যম নিয়ে নিরীক্ষায় ব্যাপৃত থেকেছেন, নিবিড় নিষ্ঠা ও একাগ্রতায় গড়েছেন নিজস্ব

*প্রফেসর ড. মো. বনি আদম, চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

শিল্পশৈলী, শিল্পভাষা এবং বিরামহীনভাবে নিয়োজিত রয়েছেন শিল্পচর্চায়। প্রতিনিয়ত অতিক্রম করে চলেছেন নিজেকে, মেলে ধরছেন তাঁর শিল্পের শক্তিমত্তাকে।

রফিকুন নবীর পারিবারিক আবহই যেন তাঁর শিশুমনে ছবি আঁকার প্রতি প্রবল আগ্রহ তৈরি করে। তাঁর তাঁর ছবি আঁকার ইচ্ছা জাগে তাঁর বাবার ছবি আঁকা দেখে। নবীর বাবা ছিলেন একজন সৌখিন শিল্পী–যিনি চারুকলায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হন মূলত পারিবারিক কারণে। রফিকুন নবীর দাদা পেশায় পুলিশ বিভাগে কর্মরত ছিলেন এবং তিনি মারা যাওয়ায় পারিবারিক চাপে নবীর বাবাকে পুলিশ বিভাগে চাকরি নিতে হয়। পেশায় পুলিশ হলেও তাঁর বাবার ছবি আঁকার প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল, ফলে অবসর সময় তিনি নিয়মিত ছবি আঁকতেন, তাঁর বাবার আঁকা ছবিই নবীর শিশু মনে শিল্পের বীজ বপন করে।[১] স্কুল ও পাড়ার দেয়াল পত্রিকা ছিল রফিকুন নবীর ছবি আঁকার ক্ষেত্র।

১৯৫৪ সালের একটি প্রদর্শনী যেন রফিকুন নবীর মনে শিল্পী হওয়ার বাসনা জাগিয়ে তোলে। এ বছরের শেষ দিকে ঢাকার বর্ধমান হাউস একটি বড়সড় চিত্র প্রদর্শনী আয়োজিত হয়। নবী তাঁর বাবার সাথে সেই প্রদর্শনী দেখতে যান এবং এক ধরনের অনুভূতি দানা বাঁধে তাঁর মনে। এ প্রসঙ্গে রফিকুন নবী বলেন, 'কোনো কিছু না জেনেই চুয়ান্ন সালের সেই প্রদর্শনী দেখার দিনটিতে একটি ইচ্ছা বা বাসনা জুড়ে বসে ছিল ভাবনায়।... শিল্পী হবার ইচ্ছা আমায় পেয়ে বসেছিল।'[২] এ প্রসঙ্গে শিল্পী ভুলে যাননি তাঁর শৈশবের মনীন্দ্র চন্দ্র পাল স্যারের কথা – 'তুই আর্ট কলেজে পড়িস। আর্টিস হইতে পারলে ভালো করবি।'[৩]

রফিকুন নবীর শিল্পকলার জগতে প্রবেশ যেন তাঁর বাবার আজন্মলালিত স্বপ্নের প্রতিফলন। 'আমার চাইতে তাঁর ইচ্ছায় প্রবল ছিল। আসলে এই ইচ্ছা তাঁর নিজের ব্যাপারে আজন্মলালিত ছিল। ... আর্টিস্ট হওয়ার স্বপ্নভঙ্গের কারণে পুলিশের চাকরিতে তিনি চিরকালই ছিলেন মিসফিট। এতটাই যে সারা জীবন প্রচণ্ড অর্থকষ্টে সংসার চালিয়েছেন, কিন্তু ছবি আঁকা ছাড়েননি। আমাকে শিল্পী বানিয়ে নিজের ব্যর্থতাকে ঢাকতে চেয়েছিলেন।'[৪] আর এভাবেই স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে নিজের ইচ্ছা ও তাঁর বাবার ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে ১৯৫৯ সালে ম্যাট্রিক পাশের পর আর্ট ইনস্টিটিউটে ভর্তির মধ্য দিয়ে। সেই থেকে শুরু হয় রফিকুন নবীর প্রাতিষ্ঠানিক চারুকলা-চর্চা।

ষাটের দশক বাঙালি জাতিসত্তা বিকাশের স্ফুরণকাল। এ সময়ের উত্তাল দিনগুলোতে আর্ট কলেজের প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার পাশাপাশি নবী জড়িয়ে পড়েন নানা কর্মকাণ্ডে। সেই সময়ের দিনগুলো সম্পর্কে শিল্পী বলেন :

> ... পঞ্চাশের দশকে ভাষা আন্দোলনকে উপজীব্য করে বাঙালির সর্বক্ষেত্রে যে উজ্জীবিত শক্তি অর্জন, তারই ধারাবাহিকতায় ক্রমাগত একের পর এক আন্দোলন চলেছিল ষাটের দশকের পুরোটা জুড়ে। রাজনীতিকে স্বৈরাচার আইয়ুব খানকে হটাও লড়াই চলেছে প্রায় পুরো দশক ধরে। ক্রমে

ক্রমে তা গণআন্দোলনের রূপ নিয়ে স্বাধীনতার জন্য একাত্তরের যুদ্ধে রূপান্তরিত হয়েছিল। সব আন্দোলনেই শিল্পীদের সম্পৃক্ততা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। আমার ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। বাঙালির স্বরূপ ও ঐতিহ্যচেতনা, সে যে সঞ্চারিত হয়েছিল হৃদয় ও মনে ও সমাজের সংকট উত্তরণের জন্য যে আন্দোলন তাতে গভীরভাবেই যুক্ত হয়ে পড়েছিলাম। ... এই সময়ে নানা দায়িদাওয়া সংবলিত রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের হাতে আঁকা পোস্টার লেখালেখি করতে হতো। ওইসবের কারণে ইলাস্ট্রেশন ও ব্যঙ্গচিত্রের দিকে মোহ জন্মে। ... আনন্দিত হতাম আন্দোলনে শিল্পকলার ছাত্র হিসেবে কিছু করতে পেরেছি ভেবে। দেশচেতনা উদ্দীপক হয়ে গেঁথে গিয়েছিল।'[৫]

রফিকুন নবী বাঙালির স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতার আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন, সর্বদা উচ্চকিত থেকেছে তাঁর তুলির ভাষা। তিনি পত্রিকার পাতায় রাজনৈতিক কার্টুন এঁকেছেন, শহীদ মিনারে টানানোর জন্য ছবি সম্বলিত ব্যানার এঁকেছেন, এঁকেছেন প্রতিবাদী পোস্টার। ১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থানের সময় বন্ধু শাহাদত চৌধুরীর সাথে 'উনসত্তুরের ছড়া' শীর্ষক সংকলনের অলংকরণ করেছেন।

১৯৭১ সালের ১৬ মার্চ 'বাংলা চারু ও কারুশিল্পী সংগ্রাম পরিষদ'-এর ব্যানারে ঢাকার শিল্পীসমাজ 'স্বাধীনতা' শব্দকে ধারণ করে রাজপথে বেরিয়ে আসেন। এই মিছিলের পরিকল্পনা ও আয়োজনের সঙ্গে রফিকুন নবী সম্পৃক্ত ছিলেন। ১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ মাওলানা ভাসানির জনসভা উপলক্ষে স্টেডিয়ামের প্রবেশ পথে টানানো হয় রফিকুন নবীর প্রায় শ-খানেক কার্টুন যার বিষয় ছিল সরকারের সমালোচনামূলক। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের জন্য 'সাপ্তাহিক ফোরাম' পত্রিকার জন্য কার্টুন সংবলিত প্রচ্ছদ আঁকেন। কিন্তু মধ্য রাত থেকে শুরু হয় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অমানুষিক বর্বরতা-তাণ্ডবলীলা। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার প্রবল ইচ্ছা থাকলেও বন্ধুদের পরামর্শে ঢাকায় অবস্থান করেন এবং গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেন।[৬] রফিকুন নবীর শিল্প-সাধনায় তাই দেশচেতনা, সমাজ ও রাজনৈতিক সচেতনতার প্রকাশ লক্ষ করা যায় প্রবলভাবে। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিল্পশিক্ষার জন্য বৃত্তি নিয়ে গ্রিসে পাড়ি জমান রফিকুন নবী। সেখানে তিনি অবস্থান করেন ১৯৭৩-৭৬ সাল পর্যন্ত, ভর্তি হন 'এথেন্স স্কুল অব ফাইন আর্টস' এ। পেইন্টিংয়ে পড়াশুনা করতে গিয়ে পাঠগ্রহণ করেন ছাপচিত্রকলার উডকাট মাধ্যমের ওপর। রফিকুন নবীর উডকাট মাধ্যমের প্রতি ভালোলাগা তৈরি হওয়া বা এ বিষয়ে পড়ার আগ্রহ সৃষ্টির কারণ হিসেবে তিনি বলেন :

এথেন্স স্কুল অব ফাইন আর্টে ভর্তি হয়ে যাওয়ার পর চোখটা খুলে গেল অন্যদিকে। সেটি এমন একটা দিক, যা চর্চায় আনার কথা কোনো দিনও ভাবিনি। দিকটি কাঠ-ছাপচিত্র (উডকাট)। এই একটি মাধ্যমকে নিয়ে ঢাকায় ছাত্রজীবনে সবচাইতে ভীত থাকতাম। ... কাঠের মতো 'ক্রুড' একটি জিনিসের সারফেসে নরুন দিয়ে কাটাকুটি করে ছাপ নেওয়ার ব্যাপারটি রসালো মনে হতো না কখনই। ... তো সেই মাধ্যমটি এথেন্সে গিয়ে ভালো লেগে গেল গ্রিসের প্রথিতযশা এবং প্রবীণ শিল্পী অধ্যাপক গ্রামাতোপুলসের কাজ দেখে। তবে তাঁর বিভাগে ভর্তিটা অত সহজ হয়নি। যেহেতু বৃত্তিটা ছিল পেইন্টিংয়ের এবং আমি ছাত্র ও শিক্ষক পেইন্টিংয়ের, অতএব ছাপচিত্রের ক্ষেত্রটিতে নেওয়ায় তিনি রাজি হচ্ছিলেন না। অবশেষে একটি কাঠখোদাই করে, প্রিন্ট নিয়ে তাঁকে দেখাতেই সব মুশকিল আসান হতে পেরেছিল। মেজাজি, বৃদ্ধ অধ্যাপক ছবিটি দেখে এতই খুশি হয়েছিলেন যে, তা ইনস্টিটিউটের অনেক শিক্ষককেও দেখিয়েছিলেন।[৭]

গ্রিস থেকে ফেরার পর রফিকুন নবীর শিল্পচর্চার মাধ্যম হয়ে ওঠে রঙিন উডকাট। এতে বাংলাদেশের ছাপচিত্রকলায় তথা রঙিন উডকাট মাধ্যমে নতুনমাত্রা সঞ্চারিত হয়। নিজস্ব শৈলী, রঙ-রেখা আর আঙ্গিক নির্মাণের ভিন্নতায় তাঁর ছাপাই ছবি নবব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

রফিকুন নবীর কার্টুনিস্ট সত্তার ব্যাপক বিকাশ সাধিত হয় ১৯৭৮ সাল থেকে *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*-এর পাতায় 'টোকাই' শীর্ষক কার্টুন আঁকার মধ্য দিয়ে। 'টোকাই' স্রষ্টা 'রনবী' ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। 'এই চরিত্রটির মধ্যদিয়ে তাঁর রসবোধ, কৌতুকবোধ, সমাজসমালোচনা, বুদ্ধির দীপ্তি, নিসর্গের প্রতি মমতা প্রভৃতি তাঁকে বিশেষভাবে জননন্দিত করে তোলেন।'[৮] শুধু কার্টুনিস্ট হিসেবেই জনপ্রিয় নন, বইয়ের প্রচ্ছদ ও অলংকরণচিত্রেও রাখেন মুন্সিয়ানার ছাপ। রফিকুন নবী অতিক্রম করেছেন শিল্পযাত্রার দীর্ঘ কালপর্ব এবং বর্তমান সময়ে হয়ে উঠেছেন বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় শিল্পীদের একজন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের চিত্রকলা বিভাগের ইমেরিটাস অধ্যাপক রফিকুন নবী তাঁর দীর্ঘ শিল্পীজীবনের কাল পরিক্রমায় দেশ-বিদেশের নানা প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন, পেয়েছেন বিরল সম্মান ও পুরস্কার। বিশেষ করে ১৯৮০ সালে বার্লিন ইস্টারগ্রাফিক্স থেকে তিনি আন্তর্জাতিক জুরি পুরস্কার অর্জন করেন। ১৯৯১ সালে পেয়েছেন রাষ্ট্রীয় 'একুশে পদক'। আন্তর্জাতিক নানা প্রদর্শনীতে সেমিনারে সিম্পোজিয়ামে তিনি আমন্ত্রিত হয়েছেন। পরিভ্রমণ করেছেন পৃথিবীর নানাদেশ, পরিচিত হয়েছেন সেসব দেশের শিল্প-সংস্কৃতির হালচাল সম্পর্কে। নানা দেশের শিল্পের আলোয় যেমন তিনি আলোকিত হয়েছেন, তেমনিভাবে সমৃদ্ধ করে চলেছেন বাংলাদেশের শিল্পাঙ্গনকে।

রফিকুন নবীর শিল্পভাবনা ও শিল্পের বৈশিষ্ট্য

'ছবিতে রস সৃষ্টিই অন্যতম প্রধান দিক। আমি অন্তত তা-ই ভাবি। তেমনটাই অনুশীলন করে থাকি নিজ চর্চায়।'[৯] শিল্পী এ রস সৃষ্টি করে চলেছেন বৃহৎ আঙ্গিকে, রঙের বিচিত্র সমাবেশে, বিরচনের মুন্সিয়ানায় আর বাস্তবধারার স্টাইলইজড রেখার গড়নে। রফিকুন নবীর চিত্রকলা প্রসঙ্গে সৈয়দ আজিজুল হকের মন্তব্য খুবই প্রাসঙ্গিক। তাঁর মতে :

> রফিকুন নবীর চিত্রমালা দর্শকদের জন্য সব সময় এক অনির্বচনীয় আনন্দের আকর। এর মূলে রয়েছে তাঁর ছবির দৃশ্যতা-গুণ, রুচি, সরসতা এবং বিষয়গত বিন্যাসের ক্ষেত্রে নাটকীয় সংবেদনা। তাঁর আরাধ্য বিষয় হলো জীবন, বিশেষত নিম্নবর্গের জীবন এবং সেই জীবনের বিপুল রহস্য, বিস্তৃত দেশকাল, এই জন্মভূমির বৈচিত্র্যময় নিসর্গ ও প্রাণের সমারোহ। এসবের সঙ্গেই রয়েছে তাঁর শিল্পীসত্তার এক গভীর ও অন্তর্ময় সম্পর্ক। এ কারণেই রফিকুন নবীর চিত্রতল এত বেশি উজ্জ্বল, সজীব, প্রাণবন্ত যা দর্শকচিত্তকে ভরে দেয় এক গভীর প্রশান্তিতে।[১০]

রফিকুন নবীর চিত্রের মূল বিষয়ই হলো মানুষ। নানাভাবে মানুষই ঘুরে ফিরে আসে তাঁর চিত্রতলে। এ মানুষকে দেখা যায় কখনও গ্রামীণ পরিবেশে আবার কখনও শহরে

জীবন-জীবিকার মাঝে। বাংলার নৈসর্গিক প্রকৃতি, পশু-পাখিসহ নানা জীবন ঘনিষ্ঠ বিষয়ে ঠাসা তাঁর চিত্রের জমিন। রফিকুন নবীর চিত্রের জগৎ নির্মিত হয়েছে মূলত তার চিরচেনা পরিবেশ থেকে, শিল্পীর শৈশব-কৈশোরের সেই বরেন্দ্রভূমির প্রকৃতি পরিবেশ, জীবন-জীবিকার কথা ঘুরে ফিরে দৃশ্যবদ্ধ হয়েছে তাঁর চিত্রতলে।

এ প্রসঙ্গে শিল্পী বলেন :

> চমৎকারিত্বে ভরা এই গ্রাম দ্বারা চিরকালই স্মৃতিতাড়িত হই। এখনো বাড়ির সেইসব বিষয় প্রায়ই আমার ছবিতে এসে যায়। আসলে গ্রামীণ পরিবেশটি অফুরন্ত বিষয়াদিতে সমৃদ্ধ। ছবি আঁকতে গিয়ে ভাবনার দৌড়টি কোথাও ঠেকে গেলে গ্রামের স্টাডিগুলোই সহায়ক হয়ে ওঠে। কুঁড়েঘর, মাটির চৌচালা-আটচালা, আমবাগান, ফসলি মাঠ, পুকুরঘাট, ধানের গোলা, গরু-মোষের গাড়ি, এদের রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত সুঠামদেহী রাখাল-যুবক, কুলবধূ, রমণী, ন্যাংটো শিশুদের দৌড়ঝাঁপ-হল্লা, রাবারের পামসু পায়ে গরিব স্কুল মাস্টার, মলিন পাঞ্জাবি আর সফেদ লুঙ্গি পরিহিত মসজিদের হতদরিদ্র ইমাম সাহেব ইত্যাদি কত কী-ই না আমার স্টাডির বিষয় ছিল তার ইয়ত্তা নেই। এখনও এসব থেকে খুব দূরে সরে আসিনি।[১১]

রফিকুন নবী শৈশবে বাবার চাকরির বদলিজনিত কারণে ঘুরে বেড়িয়েছেন দেশের নানা প্রান্ত, গ্রাম থেকে শহর। থিতু হয়েছেন পুরাণ ঢাকায়। ফলে নবীর স্মৃতিতে যেমন রক্ষিত আছে গ্রামীণ প্রকৃতি তেমনি পুরাণ ঢাকার অলিগলি। তবুও তাঁর চিত্রের জমিনে গ্রামবাংলার প্রাধান্যই লক্ষ করা যায় প্রবলভাবে। এসবের মূলেই রয়েছে রফিকুন নবীর গভীর দেশাত্মবোধ, মানুষের প্রতি অসীম মমত্ববোধ, এ থেকে রফিকুন নবীর শিল্পী হিসেবে সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গাটিও স্পষ্টভাবে ধরা দেয়। রফিকুন নবীর চিত্রের আঙ্গিকও নির্মিত হয়েছে বাস্তবধারায় তবে স্বাতন্ত্র্যরীতিতে তাঁর চিত্রের মূল আকর্ষণ হলো অসামান্য নৈপুণ্যেভরা রেখাচিত্র। ড্রইং বা রেখাচিত্র প্রসঙ্গে নবীর বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য:

> ... ড্রইংয়ের অ্যাকাডেমিক চর্চা থাকলে নিজের চিত্রকলাও ভালো বাঁধুনি পায়, তা সে যে স্টাইলের দিকেই যাওয়া হোক না কেন। এই বিশ্বাসটা আমারও আছে। যেহেতু বিষয়ভিত্তিক ছবিতেই রয়ে গেছি চিরকাল। সে কারণেই পেইন্টিং অথবা ছাপচিত্র যা-ই করি, ড্রইংকে প্রশয় না দিযে পারি না। বরং ড্রইংই সহায়। কার্টুনের দিকটাও এভাবেই এসেছে। কাঠখোদাই ছবিতেও তাই। আসলে ড্রইং বাদ দিয়ে কিছু ভাবার জো নেই। অ্যাকাডেমিকতার খুঁটিনাটি হয়তো এক সময় আর প্রয়োজন হয় না। সরলীকরণ ঘটে যায়। তাতেও আলাদা রস তৈরি হতে পারে। এই ভাবনা থেকে নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আঁকার চেষ্টা করি।[১২]

রেখাচিত্রে যেমন তাঁর অসামান্য দক্ষতা লক্ষ করা যায় তেমনি চিত্রতলে ছড়িয়েছেন রঙের দীপ্তি। উজ্জ্বল রঙের বৈচিত্র্যময়তায় মুগ্ধতা ছড়ায় তাঁর চিত্রের জমিনে। সূক্ষ্ম, স্বচ্ছ ও পরিশীলিত রঙের ব্যবহারে তাঁর চিত্র হয়ে ওঠে মনোমুগ্ধকর, যেন প্রশান্তির পরশ ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর চিত্রে কালো রঙের ব্যবহার খুব বেশি লক্ষ করা যায়, তবে তিনি এ রঙটি এমনভাবে ব্যবহার করেন যা চিত্রের জন্য অপরিহার্য হয়ে ওঠে, চিত্রতলকে দেয় এক অন্যমাত্রা। এ প্রসঙ্গে শিল্পী বলেন– 'কালো রঙের মাহাত্ম্যই

আলাদা। ... এমনিতেও কালো রেখার ব্যবহারে ছবি ভিন্ন মাত্রা পায়। জয়নুল তাঁর দুর্ভিক্ষের ড্রইংগুলোতে তা দেখিয়ে গেছেন।'[১৩]

রফিকুন নবীর দীপ্তিময় চিত্রতলে যে বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষণীয় তা হলো তাঁর কম্পেজিশন বা বিরচন কৌশলগত দক্ষতা বা মুন্সিয়ানা। চিত্রতলে তাঁর স্পেস ছাড়ার বিষয়টি অর্থাৎ চিত্রের জমিনে কতটুকু জায়গা শূন্য বা ফাঁকা রাখবেন, বস্তুটিকে কোথায় স্থাপন করলে তা হয়ে উঠবে দৃষ্টিনন্দন, মনোগ্রাহী।[১৪] রঙ-রেখা, বিন্যাস, আলো-আঁধারি পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁর চিত্র নাটকীয় আবেদন তৈরি করে যা নবীকে দিয়েছে অনন্য মাত্রা। রফিকুন নবী আজীবন সুন্দরের সাধনা করে চলেছেন। তাঁর চিত্রতলে কখনও অসুন্দর, কুৎসিত বিষয় স্থান পায়নি-যা তিনি পরিহার করেছেন সচেতনভাবেই। নবীর এ শিল্পবৈশিষ্ট্য নিয়ে সৈয়দ আজিজুল হক যথার্থই বলেছেন, '... তাঁর ছবি সর্বদা উজ্জ্বল সদর্থক ও আনন্দঘন। কখনো তা জীবনবিরোধী উপাদান বা অস্বাস্থ্যকর রুগ্‌ণ বিষয় (মরবিডিটি) দ্বারা আক্রান্ত হয় না। অর্থাৎ স্পষ্টই সমাজ ও জীবনের কুৎসিত বিষয়গুলো তিনি পরিহার করেন। সুন্দরই তাঁর একমাত্র আরাধ্য। ... এভাবে তাঁর চিত্র জীবনের আশাবাদকেই বিপুলভাবে ব্যক্ত করে। রাজনৈতিক বোধ ও বিশ্বাসের জগৎ তাঁর যতই স্বচ্ছ, দৃঢ় ও শোষণবিরোধী হোক না কেন, চিত্রতলকে তা কখনো করে তোলে না উগ্রগন্ধী, নেতিবাচক বা নৈরাশ্যময় ভাবনাপুষ্ট। সব সময় তাঁর ছবি থাকে মাটির গন্ধে ভরপুর। এতে ছড়িয়ে থাকে দেশমাতৃকার প্রতি দায়বোধ।'[১৫]

বাস্তবের ব্যঞ্জনায় আখ্যানধর্মী চিত্রতলে রফিকুন নবী মেলে ধরেছেন সমগ্র বাংলাদেশকে। বাংলার মানুষ তাদের স্বপ্নের জগৎ দৃশ্যবদ্ধ হয়েছে সুনিপুণ রেখায়, রঙের দীপ্তিতে, বিচরনের দক্ষতায়, আলোর প্রতিফলন ও মনোগ্রাহী রূপায়ণে। আর এখানেই রফিকুন নবীর শিল্পের স্বকীয়তা।

রফিকুন নবীর উডকাট চিত্র

রফিকুন নবীর উডকাট চিত্র বাংলাদেশের ছাপচিত্রকলায় নতুন দিনের সূচনা করে। বলা যায় নবব্যঞ্জনায় আবির্ভূত হয় তাঁর উডকাট চিত্র। চিত্রকলার ছাত্র ও শিক্ষক রফিকুন নবী ছাপচিত্রের উডকাট মাধ্যমের প্রতি আকৃষ্ট হন তাঁর গ্রিসের শিল্পশিক্ষার কালপর্বে। গ্রামাতোপুলস-এর উডকাট চিত্রই তাঁকে এ বিষয় প্রবলভাবে আগ্রহী করে তোলে। গ্রামাতোপুলসের কাজ ভালোলাগার কারণ হিসেবে শিল্পী স্মৃতিচারণ করেন এভাবে :

> গ্রামাতোপুলসের কাজ দেখে কেন আকর্ষণ বোধ করলাম তা একটু না লিখলে আমার কাঠখোদাইতে যাওয়ার ব্যাপারটি নিয়ে বলা অসম্পূর্ণই থেকে যাবে। প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো যে, দেশের কাঠখোদাই করে ব্লক ছাপার নিয়মটি ছিল প্রাচ্যপদ্ধতির। রঙিন ছবির জন্য প্রথমে ওয়ার্ম রং ছাপতে হতো। অতএব প্রথমে হলুদ, প্রয়োজন নীল এবং পর্যায়ক্রমে অন্যান্য রং। সবশেষে কালো বা মূল ড্রইংয়ের রং। গ্রামাতোপুলসের ধরণটি এই পদ্ধতির একেবারে উলটো। বলা যায় প্রচলিত নিয়ম নীতির বাইরের। প্রথমেই ডার্কে চলে গিয়ে ধীরে ধীরে আলোকিত দিকে যাওয়া। মাঝপথে প্রতি কাঠে প্রয়োজনে নানান রং আর টোনের কাজে ভেরিয়েশন আনতেন।

ছবির ইমেজটা কী হবে তা রাখতেন মাথায়, ভাবনায় কাটাকুটিটা ছিল আপাতদৃষ্টিতে খেলা-খেলা মতো। মনে হতো 'যা-খুশি তাই'। কাঠের টেক্সচারের সঙ্গে রঙের পুরুত্বকেও যাতে বোঝা যায় তার একটা ধরন ঘটাতেন তাছাড়া একেবারে একেকটি ছবি শেষ করতেন রঙের ভেজা ব্যাপারটিকে কাজে লাগাতে। এসব দেখে অভিভূত না-হয়ে পারিনি।[১৬]

শিক্ষাগুরু গ্রামাতোপুলসের মতো রফিকুন নবীও একই পদ্ধতিতে ছাপাই ছবি নির্মাণ করেন। কাঠের ব্লকে ছাপ নিতে প্রথমে ডার্ক রঙ, সাধারণত কালো রঙের প্রলেপ দিয়ে ধীরে ধাবিত হন আলোর দিকে। কাঠের বুকে বিষয়কে ভিত্তি করে নরুন চালান, প্রচুর স্পেস ছেড়ে, কাঠের টেক্সচার বা বুনটকে কাজে লাগিয়ে যতটা সম্ভব কম কাটাকুটিতে, রঙের পাতলা আস্তরণে কতকটা জলরঙের মতো স্বচ্ছতায় রঙের ভিন্নতায় একাধিক ব্লক ব্যবহার করে ছাপাই ছবি নির্মাণ করেন। রফিকুন নবীর কাঠখোদাই ছাপচিত্র প্রসঙ্গে শিল্পসমালোচক নজরুল ইসলাম বলেন, 'কাঠখোদাই ছাপচিত্রে রফিকুন নবী এদেশ নতুনত্ব এনোছিলেন। কাজের আয়তন- আকৃতির বিশালতায় যেমন, রঙের নির্বাচনে তেমনি এবং টেকনিকের বিশিষ্টতার জন্য। আধাবিমূর্ত থেকে প্রায় বিমূর্ত আঙ্গিক ব্যবহার করেন। ... উজ্জ্বল রঙেরই প্রাধান্য থাকে নবীর ছাপাই ছবিতে।'[১৭] বলিষ্ঠ ড্রইং, জলরঙের স্বচ্ছতা আর কম্পেজিশনের আসাম্য নৈপুণ্যে রফিকুন নবীর ছাপচিত্র বা রঙিন উডকাটের জমিনে মুগ্ধতা ছড়ায়। উডকাটে নৈপুণ্যতার স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৮০ সালে জার্মানির বালিনের ইন্টারগ্রাফিক্স থেকে তিনি আন্তর্জাতিক জুরি পুরস্কার লাভ করেন। এ পুরস্কার প্রসঙ্গে নিসার হোসেন বলেন, 'এটি শুধু ছাপচিত্রের ক্ষেত্রেই নয়, আমাদের সমকালীন শিল্পকলাকে আন্তর্জাতিকভাবে সমাদৃত ও প্রশংসিত করে তুলবার ক্ষেত্রেও ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোর অন্যতম। সীমিত পরিসরে হলেও সেই থেকে আজ অবধি বাংলাদেশের উডকাট চিত্রের যে প্রসার, উন্নতি এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন, তা গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রেক্ষাপটে একটি অতুলনীয় নজির স্থাপন করেছে।'[১৮] রঙের দীপ্তি ছড়ানো, বৃহৎ পরিসরের কাঠখোদাই ছাপচিত্র নির্মাণে রফিকুন নবী পালন করেছেন অন্যতম পথিকৃৎ এর ভূমিকা। তাঁর ছাপচিত্র, চিত্রকলার মতোই রঙের ঐশ্বর্যে, বিষয় বৈভবে, সূক্ষ্মতায় সংবেদনায়, স্বকীয়তায় অনন্য।

রফিকুন নবীর উল্লেখযোগ্য উডকাটচিত্রসমূহ

বাউল (১৯৭৫)

উলম্ব বিন্যাসের 'বাউল' শীর্ষক চিত্রটি নির্মিত হয়েছে আবহমান বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে। এ চিত্রের জমিনে লক্ষ করা যায় একজন বাউল একতারায় মগ্ন, আর তার সহযোগী ছড়াচ্ছে বাঁশির সুরের মূর্ছনা। দূর থেকে অবলোকন করছে দুই রমণী। গ্রামের দো-চালা ঘর, কলাগাছের ঝোপ ইত্যাদি মিলে পল্লীজীবনের এক বাস্তবচিত্র অঙ্কিত হয়েছে সমবিমূর্তের আদলে। এ চিত্রের প্রধান চরিত্র গানের ধ্যানে মগ্ন এক বাউল– এ যেন বাঙালি জাতির হাজার বছরের অসাম্প্রদায়িক চেতনা লালনকারী

চরিত্রের প্রতিরূপ। বাউল যারা সংসার জীবন ত্যাগ করে ঐক্য ও সাম্যের সাধনায় মগ্ন, গেয়ে যায় মানবতার জয়গান। তাইতো বাউলের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় :

নানাবরণ গাভীরে ভাই একই বরণ দুধ
জগৎ ভরমিয়া দেখিলাম এই মায়ের পুত।[১৯]

বাঙালির সমন্বয়বাদী চেতনার বিষয়টিও ইঙ্গিত দিয়েছেন শিল্পী এ ছাপচিত্রের মধ্য দিয়ে আর বিষয়ভাবনাকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন রঙ আর বিন্যাসের সুরেলা উপস্থাপনে।

দুই রমণী (১৯৭৫)

মনোক্রমিক রঙে ছাপা এ চিত্রটিতে কালো রঙের প্রাধান্য লক্ষ করা যায় পুরো জমিন জুড়ে। এ চিত্রে দুই নারীকে উপস্থাপন করা হয়েছে স্টাইলাইজড ড্রইংয়ে। ড্রইংয়ের নিপুণতায় নারীদের চোখ-মুখে ঠিকরে পড়ছে লাবণ্য। আলো-ছায়ার প্রয়োগটাও যেন অনেকটা হিসেবী। দুই নারীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তাদের শরীরীভঙ্গিতে ধরা দিয়েছে। শিল্পীর নরুন চালানোর দক্ষতায় চিত্রটিতে এক ধরনের মুগ্ধতা ছড়াচ্ছে। বিরচন কৌশল, আলো আধারী পরিবেশ সৃষ্টি আর নরুনের কাটাকুটিতে চিত্রটিকে মনোগ্রাহী করে তুলেছে।

একা (১৯৭৫)

উলম্ব বিন্যাসের সাদা কালো এ ছাপচিত্রটিতে একাকী বসে থাকা এক মানুষকে উপস্থাপন করা হয়েছে। বিষয়টি খুবই সাদামাটা হলেও এর মূল আকর্ষণ উপস্থাপন রীতিতে অর্থাৎ বিরচন কৌশলে। দর্শক মনে এক ধরনের ভাবনার উদ্রেক করে চিত্রটি- কেন বসে আসেন এমনভাবে?

চিত্রটিতে অন্ধকারের মাঝে যেন আলো ঠিকরে পড়ছে এখানেই শিল্পীর আলোছায়ার ব্যবহারে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। খুবই অল্প কাটাকুটিতে চিত্রটি এমনভাবে ছেপেছেন যা মনে ভাবনার সঞ্চার করে।

ভেজা কাক (১৯৭৫)

আয়তাকার বিন্যাসের এ চিত্রটিতে ভেজা জুবুথুবু এক কাককে উপস্থাপন করা হয়েছে। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন কাক এঁকেছেন ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে। রফিকুন নবীও কাক আঁকলেন, পার্থক্য– অংকনরীতিতে, মাধ্যম আর প্রেক্ষাপটে। জয়নুলের মতো রফিকুন নবীর কাকও স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। পরিমত রঙের ব্যবহারে, দক্ষ ড্রইং আর নরুনের আঁচড়ে কাঠের বুকচিরে ফুটিয়ে তুলেছেন এক কাক– যা আমাদের দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখে একভাবে।

গ্রীষ্মের কপোত (১৯৭৮)

উলম্ব বিন্যাসের এ চিত্রটিতে কাঠের বেড়ার ওপর উপবিষ্ট একটি কবুতরকে উপস্থাপন করা হয়েছে। খুবই সাধারণ একটি বিষয় হলেও চিত্রের করণকৌশলগত দিক অসাধারণ। কাঠের টেক্সার বা বুনটকে অক্ষত রেখে, পরিমিত রঙে আর বিন্যাসের যথার্থতাই অসারণের ব্যঞ্জনা ছড়িয়ে পড়ে চিত্রটিতে।

কালোতে আলোক রঙের প্রলেপে ছাপ তৈরির করণকৌশলগত দিক সুস্পষ্ট এ চিত্রটিতে। আঙ্গিক নির্মাণের অসাধারণ মুন্সিয়ানায় এ চিত্রটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে– ১৯৮০, বার্লিন ইন্টারগ্রাফিক্স থেকে আন্তর্জাতিক জুরি পুরস্কার।এ চিত্রটি বিশ্বশিল্পাঙ্গনে বাংলাদেশের ছাপচিত্রকে নতুনভাবে পরিচিত করে তোলে।

আত্ম-প্রতিকৃতি (১৯৭৯)

রফিকুন নবীর অন্য যেকোনো মাধ্যমে আঁকা প্রতিকৃতির চেয়ে ছাপচিত্রের এ প্রতিকৃতিটি স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। এ ছাপচিত্রটির করণকৌশলগত দিকও তাঁর অন্য উডকাট চিত্র থেকে আলাদা। এ চিত্রটি হালকা রঙ থেকে গাঢ় রঙের দিকে ধাবিত হয়ে ছাপা। অতি সূক্ষ্ম খোদাই আর রঙের পরিমিত ব্যবহারে ছাপা এ চিত্রটি দ্বারা তাঁর ব্যক্তিত্বের পরিশীলতার দিকটিই যেন ব্যক্ত হয়েছে প্রবলভাবে।

কবি (১৯৮০)

একজন কবি সমাজের অন্য সবার মতো নয়। তাঁর স্বভাব; তাঁর বেশ-ভূষা, চাল-চলন কিছুটা হলেও আলাদা। তাঁরা স্বপ্ন দেখেন, কল্পনা করেন। কল্পনা করেন নানা কিছু, আর শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে এমন কিছু রচনা করেন যা আমাদের মুগ্ধ করে, কল্পনা করতে শেখায়, উজ্জীবিত করে। শিল্পী রফিকুন নবীর 'কবি' শীর্ষক ছাপচিত্রও যেন ঠিক তাই। কবির বিচিত্র কল্পনা লক্ষ করা যায় এ চিত্রে। এ চিত্রে একজন মানুষ– যিনি কবি, দুহাত প্রসারিত করে তাকিয়ে রয়েছেন ওপরের দিকে। কবির ভাবনায় উঠে এসেছে লাগামহীন ঘোড়া, কল্পলোকের চাঁদ, পাখি, আমগাছ, সাপ, মাছ এসবই যেন প্রতীকী উপস্থাপন। কতকটা স্যুররিয়ালিস্টিক ধারার এ চিত্রের কবি যেন রফিকুন নবী নিজেই। এ চিত্রে যে উপাদানগুলো রয়েছে তার সবকিছুই যেন তাঁর ফেলে আসা শৈশব থেকে উৎসারিত। রফিকুন নবীর চিত্রের বড় বৈশিষ্ট্য হল গাঢ় জমিন থেকে ধীরে ধীরে আলোয় ধাবিত হওয়া, রঙের সরলীকরণ এবং হিসেবী বিন্যাস। এ চিত্রেও এ বিষয়গুলো লক্ষ করা যায়। এ চিত্রটি ভাবগত দিক থেকে দারুণ ব্যঞ্জনাময়।

শিকার (১৯৮০)

'শিকার' শীর্ষক এ ছাপচিত্রটি করণকৌশলগত দিক থেকে অনন্য। এ চিত্রের মাছের গড়নে লোকচিত্রের প্রভাব লক্ষ করা যায়। স্বল্প রঙের ব্যবহার আর কাটাকুটির বৈচিত্র্যময়তা চিত্রটিকে দিয়েছে আলাদা এক মাত্রা যা দর্শক মনকে আকর্ষণ করে প্রবলভাবে।

ভিখারী (১৯৮১)

একজন শিল্পীর দায়বোধ থেকে যায় তাঁর সমাজের কাছে, সমাজের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা প্রতিবিম্বিত হয় তাঁর শিল্পকর্মে। সামাজিক উৎকর্ষতায় যেমন তিনি উদ্বেলিত হন, প্রফুল্লতা অনুভব করেন, তেমনি সমাজের মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, হতাশা, আশাভঙ্গের কথায় মর্মপীড়ায় ভোগেন। সমাজের যুগযন্ত্রণার কথা বিধৃত হয় তাঁর শিল্পকর্মে। রফিকুন নবীর 'ভিখারী' শীর্ষক চিত্রটিও এমনই।

কাঠখোদাইয়ে ছাপা এ চিত্রটির ভিত্তিভূমিতে লক্ষ করা যায় ক্লান্তি-শ্রান্তিতে নুয়ে পড়া এক ভিখারী শুয়ে রয়েছে। যার হাতে ধরা রয়েছে ভিক্ষার শূন্য থালা। সারাদিন অভুক্তথাকা এ ভিখারী যেন ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখছে। তার স্বপ্নও তার জীবনের মতো সরল। এদের চাওয়া খুব বেশি নয়– এক ডালা ভাত, মাছ, ডিম খুব সামান্য কিছু খাবার। এ সামান্য চাওয়াটুকু পূরণে যেন ব্যর্থ এ সমাজ-রাষ্ট্র। এ বিষয়টি যেন প্রবলভাবে নাড়া দেয় শিল্পী মনকে। সাধারণ মানুষ তথা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতি সহানুভূতি আর অসামান্য জীবনবোধ সম্পন্ন এ শিল্পীর পক্ষেই শিল্পকর্মের বিষয় হিসাবে ভিখারীর জীবন উঠে আসাটাই স্বাভাবিক। এখানে ভিখারী যেন সামাজিক বৈষম্যের প্রতীক। এ বিষয়টি রূপ দিতে শিল্পী কাঠের বুকে নরুন চালিয়েছেন নিজস্ব ঢঙে। গাঢ় রঙের ওপর দিয়েছেন পাতলা রঙের পতেস্তরা যা নানা বুনটের সৃষ্টি করে। রঙের বাহুল্যতা নেই বললেই চলে। বিন্যাসের বা বিরচনের স্বার্থে কোথাও একটু উষ্ণ রঙের ছোঁয়া লক্ষ করা যায়। রঙের সরীকরণে যেন ভিখারী জীবনের রূপ প্রতিবিম্বিত হয়েছে সার্থকভাবে। সমবিমূর্তরীতিতে গড়া এ চিত্রটিতে সামাজিক বৈষম্যের দিকটি তুলে ধরেছেন শিল্পী এবং কামনা করেছেন বৈষম্যহীন সুন্দর সমাজ।

খোলা জানালা (১৯৮৯)

উলম্ব বিন্যাসের পুরোপুরি বিমূর্তরীতির এ ছাপচিত্রটি। গাঢ় রঙের ওপর পাতলা রঙের প্রলেপে জানালা সদৃশ অবয়ব সৃষ্টি হয়েছে ক্ষীণভাবে। চিত্রের উপরিতলে নীল, সাদা, হলুদ রঙের হালকা ছাপ লক্ষ করা যায়। ছাপচিত্রের কারিগরি দক্ষতাই এ চিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ চিত্রটি সম্পর্কে সৈয়দ আজিজুল হক বলেন, ‘এটি কিছুটা বিমূর্ত ধরনের সুনির্দিষ্ট কোনো বিষয় এতে না থাকলেও বিষয়গত আধুনিকতা আনার জন্য বিমূর্ততার আশ্রয় নেওয়া হয়।’[২০] মূলত রঙ রেখা টেক্সারই ছবির প্রধান আকর্ষণ। এ চিত্রের জন্য শিল্পী ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশ জাতীয় চিত্রকলা প্রদর্শনীতে পুরস্কার লাভ করেন।

শরৎকাল (১৯৯০)

আয়তাকার বিন্যাসের এ চিত্রটিও পুরোপুরি বিমূর্ত রীতির। চিত্রের ভিত্তিভূমিতে গাঢ় রঙের আস্তর, উপরিতলে হালকা রঙের পরশ ও হেজি লাইন, চিত্রের জমিনে বুনটের কারিকুরি সবকিছু মিলে মনে এক সংবেদনা তৈরি করে। কাঠখোদাই চিত্রের শৈল্পিক গুণে অনন্য এ চিত্রটি।

মাছরাঙা (১৯৯৩)

আনুভূমিক বিন্যাসের সমবিমূর্তরীতির এ চিত্রটির প্রধান বিষয় একটি মাছরাঙা যে কিনা মাছ ধরায় আশায় নিশ্চুপ বসে রয়েছে। রঙের পরিশীলতা চোখে পড়ার মতো, বেশ কিছু গাঢ় রেখা ও বুনটের সুরেলা উপস্থাপনে নির্মিত এ ছাপচিত্রটি। মনোমুগ্ধকর রঙ যেন এ ছবির প্রধান বৈশিষ্ট্য। সবুজ রঙের পরশে মনে প্রশান্তি ছড়ায়, এখানেই ছাপচিত্রটির সার্থকতা।

জেলে (২০০২)

উলম্ব বিন্যাসের এ চিত্রটিতে জেলেদের জীবন-জীবিকার বিষয়টি উঠে এসেছে। এ চিত্রে দেখা যায় কিছু মাছ, জেলে-জেলেনী। জেলেদের অর্থনৈতিক অবস্থা যে ভালো নয়, অভাব অনটন তাদের নিত্যসঙ্গী তা জেলেনীর চোখের করুণ চাহনিতে স্পষ্টভাবে ধরা দেয়। এ চিত্রটিতে সচেতনভাবে কাঠের বুনটের ব্যবহার আর রঙের সরলীকরণে চোখ আটকে যায়।

গোকুল (২০০২)

উলম্ব বিন্যাসের সমবিমূর্তরীতির এ চিত্রটি শিল্পী যেন এঁকেছেন তাঁর স্মৃতি-জাগানিয়া শৈশবের দিনগুলো থেকে। চিত্রের কেন্দ্রভূমিতে রয়েছে একটি বড় আমের গাছ, তার চারপাশে রয়েছে আরও বেশ কিছু। চারণভূমিতে অনেকগুলো গরু। আকাশে পাখির ডানা মেলে উড়ে চলা– এ সবকিছু মিলে গড়ে উঠেছে চিত্রের জমিন।

আমরা জানি, শিল্পীর মানসভুবন গঠিত হয়েছে বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের চাঁপাইনবাবগঞ্জের শ্যামল প্রকৃতির মাঝে। শিল্প যেন স্মৃতি হাতড়ে ফিরে চলেছেন তাঁর ফেলে আসা সেই ছত্রাজিৎপুর– বিলের ধারে গ্রামের শেষবাড়িটি। শিল্পী তাঁর শৈশব স্মৃতি নিয়ে বলেন, 'আসলে ছেলেবেলাটুকু গ্রামেই কেটেছে বেশি। তা সে নিজ গ্রাম হোক বা নানাবাড়ির গ্রাম অথবা বাবার চাকরির সুবাদে এ থানা থেকে ও থানায় বদলি হয়ে যাওয়া হোক, সবটাই গ্রামে গ্রামেই কেটেছে। তাঁর মনে শিশুতোষ সময়টিতে গ্রামেই বেড়ে ওঠা। এ কারণে গ্রামকে মনে পড়ে বেশি যেমন, তেমনি গ্রামকে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া অনেক ঘটনা। কে জানে, হয়তো এখনো যে আমার ছবিতে গ্রাম, গ্রামের জীবন ইত্যাদি বিষয় হয়ে আসে তা সেই কারণে কিনা।'[২১] এ কারণেই শিল্পীর চিত্রের জমিনে ফেলে আসা শৈশবের দিনগুলোর প্রবল উপস্থিতিতি। সেই বড় বড় আমবাগান, আমগাছের ডালে পাখির বাসা, পাখিদের ঘরে ফিরা, চারণভূমিতে গরুর পাল, মহানন্দার বুকে পাটি নৌকা, মাছ ধরা, পাড়ার খেলার সাথীদের সাথে হৈ-হুল্লোড় আরও কত-কী! এসবের অনেককিছুই এ চিত্রের চিত্রতলে উপস্থিত। চিত্রটির উপস্থাপন রীতি 'Childlike not Childish'। শিশুর মন নিজের মধ্যে আত্মস্থ করে এঁকেছেন যেন ছবিটি। রঙ- রেখার উপস্থাপনে মনোমুগ্ধকর এ চিত্রটি আমাদের নিয়ে যায় শৈশবের দিনগুলোতে, এখানেই শিল্পীর অসামান্য শিল্পকুশলতার পরিচয় মেলে।

ঝড়ো দুপুর (২০০৩)

আনুভূমিক বিন্যাসের সমবিমূর্তরীতির এ চিত্রটি মূলত একটি ভূ-দৃশ্য। ঝড়ের তাণ্ডবে বেঁকে গেছে গাছপালা, নদীতীরে বাঁধা নৌকা সবকিছু মিলে ঝড়ের জীবন্ত রূপ যেন ফুটে উঠেছে এ চিত্রে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ-প্রবণ বাংলাদেশের পরিচয় উঠে এসেছে এ চিত্রে। শিল্পী এ বার্তাটিও দিয়েছেন – এই ঝড়-ঝঞ্ঝার মাঝে বুক চিতিয়ে লড়াই করে টিকে থাকে বাংলার মানুষ, শুধু মানুষই নয়; বাংলার শ্যামল প্রকৃতিও। নরুনের আঁচড়ে কাঠের বুকেও যে গতি সঞ্চার করা সম্ভব তা প্রমাণ করেছেন শিল্পী এ চিত্রের মধ্য দিয়ে। এখানেই রফিকুন নবীর যেন বিশিষ্টতা।

খাঁচায় মৃত ময়না (২০০৩)
আনুভূমিক বিন্যাসের এ চিত্রটি যেন প্রতীকী উপস্থাপন, ২০০৩ সালে ছাপা হলেও শিল্পী ছবিটি এঁকেছেন তাঁর ষাটের দশকের উত্তালদিনগুলোতে অর্জিত জীবনাভিজ্ঞতা থেকেই। 'ষাটের দশকে বাংলাদেশের স্বরূপ-অন্বেষার আন্দোলনের সময় থেকে তাঁর সামাজিক অঙ্গীকারের চেতনা প্রখর হয়।'[২২] তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন পাকিস্তানি শাসকচক্রের দুঃশাসন। শোষণ-বঞ্চনায় ধ্বংস করে দিতে চেয়েছে বাঙালি জাতিকে। ধ্বংস করতে চেয়েছে হাজার বছরের বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার মানসসত্তা। শৃঙ্খলিত করতে চেয়েছে মুক্তবুদ্ধির প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনাকে। বদ্ধ খাঁচায় মৃত ময়নার মধ্য দিয়ে শিল্পী এ বিষয়টিই ইঙ্গিত দিয়েছেন বোধ হয়। শিল্পকুশলতায় অসাধারণ এ ছাপচিত্রটি আমাদের ভাবনার জগতে নিয়ে যায়।

সংগ্রাম (২০০৩)
আনুভূমিক বিন্যাসের এ চিত্রটিতে একটি ছাগলকে উপস্থাপন করা হয়েছে যে গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে দড়ি ছিড়ে ফেলার চেষ্টায় লিপ্ত। এখানে ছাগলকে মুক্তির প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। পরাধীনতার আবদ্ধতাকে ছিড়ে ফেলে মুক্তির স্বাদ গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে এ ছাপচিত্রটিতে।
এ চিত্রটি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের আঁকা 'বিদ্রোহ' (কালি-তুলি, ১৯৬৬) 'বিদ্রোহী' (জলরঙ, ১৯৫১) ছবির সাথে তুলনা করা যায়। জয়নুলের ছবিতে উপস্থাপন করা হয়েছে গাভীকে। রফিকুন নবী এ চিত্রটি ২০০৩ সালে আঁকলেও এর ভাবনার রূপায়ণ যেন বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের প্রেক্ষাপটে। যে সংগ্রামের সূচনা ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। বাঙালির ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা তথা সাংস্কৃতিক মুক্তির লড়াই এক সময় রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ নেয় এবং বাঙালিরা এগিয়ে যায় স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতার পথে। আন্দোলনের সর্বোচ্চ পর্যায় ১৯৭১ সালের নয় মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ– লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। বাঙালির সেই গৌরবময় লড়াইয়ের প্রতিটি ধাপে রয়েছে রফিকুন নবীর সক্রিয়তা। একটি যুগের সাক্ষী রফিকুন নবী এ চিত্রটিতে মূলত প্রতীকের আড়ালে বাঙালি জাতির সংগ্রামশীলতাকেই রূপ দিয়েছেন। সমবিমূর্ত রীতির এ চিত্রটিতে সবুজাভ রঙের আধিক্য লক্ষ করা যায়। রঙের সরলীকরণে চোখ আটকে যায় চিত্রের জমিনে। ছাগলের গায়ের রঙের ভারসাম্য রক্ষার্থে চিত্রের ভিত্তিভূমি রচনা করেছেন ধূসর ও কালো রঙের ছাপে। চিত্রের বলিষ্ঠ রেখায় শিল্পীর স্বকীয়তা ধরা দেয় স্পষ্টভাবে। রেখার মধ্য দিয়ে প্রচণ্ড গতি ও ক্ষিপ্রতা ফুটে উঠেছে প্রবলভাবে। কাঠের বুক চিরে নরুনের বলিষ্ঠ আঁচড়ে রূপ পেয়েছে গতিময়তা এবং চিত্রটিও অর্জন করেছে সার্থকতা।

রফিকুন নবীর লেখাপড়ার শুরুটা বর্ণমালা দিয়ে নয়, ছবি আঁকা দিয়ে। তাঁর বাবা 'অ' লেখার আগে একটি অজগর বা 'আ' লেখার আগে একটি আম এঁকেছিলেন। এতেই তাঁকে আঁকা-আঁকিতে পেয়ে বসে– যা চলছে আজ অবধি। বর্তমান সময়ে রফিকুন নবী বাংলাদেশের একজন অন্যতম প্রধান শিল্পী। রফিকুন নবীর বহুমুখী প্রতিভায় সমৃদ্ধ হয়ে চলেছে এদেশের শিল্পজগৎ। কাঠখোদাইচিত্রে নবীর রয়েছে অসামান্য প্রতিভা। তাঁর কাঠখোদাই চিত্র বাংলাদেশের ছাপচিত্র জগতে নতুনমাত্রা সংযোজন করে, দেশের ছাপচিত্রকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নতুনভাবে পরিচিত করে তোলে– এখানেই রফিকুন নবীর সার্থকতা। বলা যায়, রফিকুন নবীর বর্ণিল শিল্পযাত্রায় রঙিন কাঠখোদাই চিত্র নির্মাণকৌশলের দিক থেকে একটি অনন্য সংযোজন। এ মাধ্যমে তাঁর স্বকীয়তা, আঙ্গিক নির্মাণের দক্ষতা তাঁকে দিয়েছে অগ্রপথিকের সম্মান।

রফিকুন নবীর কাঠখোদাই ছাপচিত্রসমূহ

চিত্র : ০১. বাউল, ১৯৭৫

চিত্র :০২. দুই রমণী , ১৯৭৫

চিত্র : ০৩. একা, ১৯৭৫

চিত্র : ০৪. ভেজা কাক, ১৯৭৫

চিত্র : ০৫.গ্রীষ্মের কপোত , ১৯৭৮

চিত্র : ০৬. আত্ম-প্রতিকৃতি, ১৯৭৯

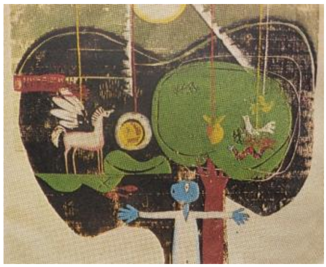

চিত্র : ০৭. কবি, ১৯৮০

চিত্র : ০৮. শিকার, ১৯৮০

চিত্র : ০৯. ভিখারী, ১৯৮১

চিত্র : ১০. খোলা জানালা, ১৯৮৯

চিত্র : ১১. শরৎকাল, ১৯৯০

চিত্র : ১২. মাছরাঙা, ১৯৯৩

চিত্র : ১৩. জেলে, ২০০২

চিত্র : ১৪. গোকুল, ২০০২

চিত্র : ১৫. ঝড়ের দুপুর, ২০০৩

চিত্র : ১৬. খাঁচায় মৃত ময়না, ২০০৩

চিত্র : ১৭. সংগ্রাম, ২০০৩

তথ্যসূত্র

১ রশীদ আমিন, "রফিকুন নবীর সাক্ষাৎকার", আবুল হাসনাত (সম্পা.), *শিল্প ও শিল্পী*, ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা (জুলাই, ২০১৩), পৃ. ২৩
২ রফিকুন নবী, "একটি প্রদর্শনী ও আমি", আবুল হাসনাত (সম্পা.), *কালি ও কলম*, ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা (বৈশাখ, ১৪১৫), পৃ. ৭১
৩ ——————, *আমার স্কুল*, (ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৫), পৃ. ৮৪
৪ ——————, "রফিকুন নবী + আমি = রনবী", মতিউর রহমান (সম্পা.), *প্রথম আলো ঈদসংখ্যা* (জুন, ২০১৮), পৃ. ৩৭০
৫ ——————, "বৈরী সময়ের আমি" Subir Choudhury (Edt.), *Rafiqun Nabi :Reality*, (Dhaka : Bengal Publications, 2013), P. 07
৬ সৈয়দ আজিজুল হক, "রফিকুন নবী : তাঁর শিল্পের অন্বেষা", ইমদাদুল হক সূফী (সম্পা.), *দেশ প্রসঙ্গ* (শিল্পী রফিকুন নবী সংখ্যা) (২৮নভেম্বর, ২০১৯), পৃ. ২২
৭ রফিকুন নবী, *রনবীর বিশ্বদর্শন ও রম্যকথন*, (ঢাকা : বেঙ্গল পাবলিকেশন্‌স, ২০১২), পৃ. ১৮৩-১৮৪
৮ সৈয়দ আজিজুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৪
৯ রফিকুন নবী, *স্মৃতির পথরেখায়*, (ঢাকা : বেঙ্গল পাবলিকেশন্‌স, ২০১৯), পৃ. ৮৪
১০ সৈয়দ আজিজুল হক, "রফিকুন নবীর ৮০তম জন্মবার্ষিক প্রদর্শনী : তাঁর দৃষ্টিসীমায় সর্বদা জাগ্রত বাংলাদেশ", *প্রথম আলো*, ১০ নভেম্বর,২০২৩
১১ রফিকুন নবী, *স্মৃতির পথরেখায়*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫
১২ ——————, 'বৈরী সময়ের আমি',*Loc. cit*.
১৩ ——————, *স্মৃতির পথরেখায়*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩২
১৪ সৈয়দ আজিজুল হক, "রফিকুন নবীর ৮০তম জন্মবার্ষিক প্রদর্শনী : তাঁর দৃষ্টিসীমায় সর্বদা জাগ্রত বাংলাদেশ", *প্রাগুক্ত*
১৫ *তদেব*
১৬ রফিকুন নবী, *রনবীর বিশ্বদর্শন ও রম্যকথন,প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৩-১৮৪
১৭ নজরুল ইসলাম, "রফিকুন নবী : তাঁর স্মৃতি অনুভবে", *দেশপ্রসঙ্গ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯
১৮ নিসার হোসেন, "প্রাতিস্বিকতার শিখরে : রফিকুন নবীর উডকাট", জহিরুদ্দিন (সম্পা.), *ছাপাই ছবির চার পথিকৃৎ*, (ঢাকা : গ্যালারী চিত্রককর্তৃক প্রকাশিত ক্যাটালগ, ২০০৩), পৃ. নম্বর উল্লেখ নেই
১৯ ওয়াকিল আহমদ, *বাঙালির দর্শন চিন্তা*, (ঢাকা : বইপত্র, ২০০৬), পৃ. ১০৮
২০ সৈয়দ আজিজুল হক, "রফিকুন নবী : তাঁর শিল্পের অন্বেষা", *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪
২১ রফিকুন নবী, *আমার স্কুল*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬
২২ মাহমুদ আল জামান, "বাস্তবধারায় নবব্যঞ্জনা", আবুল হাসনাত (সম্পা.), *শিল্প ও শিল্পী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১

হেলাল হাফিজের কবিতা : বিষয় ও শিল্পরূপ

গৌতম দত্ত*

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের কবিতায় হেলাল হাফিজ অত্যন্ত পরিচিত একটি নাম। বাংলাদেশ তথা বাঙালি পাঠকের কাছে ষাটের দশক থেকে অদ্যাবধি তিনি সমান জনপ্রিয়। এ পর্যন্ত প্রকাশিত ‘যে জলে আগুন জ্বলে’ (১৯৮৬),‘ভালবেসো একশো বছর’ (১৯৯৪),‘অচল প্রেমের পদ্য’ (১৯৯৪), ‘কবিতা একাত্তর’ (২০১২), ও ‘বেদনাকে বলেছি কেঁদো না’ (২০১৯) এই পাঁচটি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে প্রথম কাব্য ‘যে জলে আগুন জ্বলে’র জনপ্রিয়তা সর্বাধিক। তাঁর কবিতা কয়েক প্রজন্মের বাঙালির আবেগকে ভাষা দিয়েছে–হয়েছে অনুভূতি প্রকাশের আশ্রয়। হেলাল হাফিজের কবিতার সেই বিষয় ও শিল্পরূপের বিশ্লেষণ বর্তমান প্রবন্ধের মৌল উদ্দেশ্য।

বিশ শতকের ষাটের দশকে অখণ্ড পাকিস্তানে চলে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন। পূর্ব পাকিস্তান তখন প্রায় পুরোপুরি অবরুদ্ধ। এই অবরুদ্ধতার মধ্যে ষাটের দশকের বাংলাদেশের কবিদের মধ্যে দুধরনের প্রবণতা দেখা যায়। প্রথমত ‘বায়ান্নর রক্তাক্ত উজ্জীবন এ-সকল কবির চেতনায় যে সংরক্ত আবেদন নিয়ে প্রকাশ পেয়েছিলো, হৃদয়াবেগের প্রাবল্যে ও ব্যক্তিক নিরাপত্তার প্রশ্নে ষাটের দশকে তা অনেকের মধ্যেই সৃষ্টি করলো আত্মমুখী প্রবাহ-স্রোত।’ (রফিকউল্লাহ, ২০০২ : ২২) অন্যদিকে ‘ষাটের দশকের কবিতার প্রধান প্রবণতা দ্রোহ, বিপ্লব, বিদ্রোহ। ষাটের দশকের বাংলাদেশের রাজনীতির উত্তাল ঘটনাতরঙ্গ এ দশকের সব কবিকেই ছুঁয়ে গেছে।’ (মামুন রশীদ, ২০১৫ : ১৪) ফলে এ দশকের কবিদের প্রধানত দুটো বিষয়ের মুখোমুখি হতে হয়–অবরুদ্ধতাসংক্রান্ত আত্মমুখিনতা ও সেই অবরুদ্ধতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠা। ব্যক্তি ও সমষ্টিগত এই দুই বাস্তবতার ভেতর হেলাল হাফিজ কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। এ কারণেই তাঁকে বলা হয় “নিভৃতচারী সোচ্চার কবি” (সৌমিত্র, ২০১৪ : ৪৭)। হেলাল হাফিজের কবিতার জগতে প্রধানত এ দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। ব্যক্তিগত প্রেম, সুখ, শোক, বিরহ ও নিঃসঙ্গতার পাশাপাশি দ্রোহ আর প্রতিবাদে তিনি এক প্রবাদপ্রতিম কিংবদন্তি কবিপুরুষে পরিণত হন।

১.

আত্মমুখী ভাবচেতনায় ব্যক্তিগত অনুষঙ্গের প্রাধান্য থাকে বেশি। সেই প্রাধান্যের কারণে কবি তাঁর ব্যক্তিগত জীবন, শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও যাপিতজীবনকে কবিতায়

---

*ড. গৌতম দত্ত : সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

উপজীব্য করে তোলেন। হেলাল হাফিজও সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নন। কবি মাত্র ৩ বছর বয়সে মাতৃহীন হন। ফলে শৈশব থেকেই তাঁকে এক সুতীব্র বেদনাবোধ তাড়িত করেছে আজীবন। এ প্রসঙ্গে কবি নিজেই বলেন :

> যখন ৩ বছর বয়স তখন মা মারা যান। এই মাতৃহীনতার বেদনা তখন আমি বুঝতে পারিনি।কিন্তু আস্তে আস্তে যখন বড় হয়ে উঠলাম তখন এই বেদনা আমাকে এমনভাবে গ্রাস করতে লাগলো যে, আমার পুরোটা জীবন এই একটি ঘটনায় পাল্টে গেল কিংবা এলোমেলো হয়ে গেলো...। আজকে আমি এই যে ঘরহীন ঘরে থাকি এই ঘরহীনতা কিন্তু আমার সেই শৈশব থেকে শুরু হয়েছে। তখন থেকেই আমি এলোমেলো। (হেলাল, ২০১৪ : ২২৯)

এ অবস্থায় কবির বাবা খুরশেদ আলী তালুকদার দ্বিতীয় বিয়ে করেন। ১৯৬৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও প্রথমবার কবির পড়া হলো না। বাবার সঙ্গে অভিমান করে বাড়ি ছাড়েন। এক বছর পর আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে ভর্তি হন। এখানেই স্নাতক পড়া অবস্থায় কবির বাবা মারা যান। ফলে আরো একা হয়ে যান কবি। এমন বাস্তবতায় কবি 'আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে' শুধু নিজেকেই দেখতে পান। মায়ের স্মৃতি তখন তাঁকে এভাবেই আঁকড়ে ধরে :

> জননীর জৈবসারে বর্ধিত বৃক্ষের নিচে
> কাঁদতাম যখন দাঁড়িয়ে
> সজল শৈশবে, বড়ো সাধ হতো
> আমিও কবর হয়ে যাই,
> বহুদিন হলো আমি সে রকম কবর দেখি না
> কবরে স্পর্ধিত সেই একই বৃক্ষ আমাকে দেখে না। (হেলাল, ২০০৩:১৪)

জননীর সঙ্গে সন্তানের যে অকৃত্রিম ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক, জননীর অনুপস্থিতি সে সম্পর্ককে আরো আকাঙ্ক্ষিত করে তোলে। সে আকাঙ্ক্ষা নিয়েই কবির কেটেছে মাতৃহীন এক নিঃসঙ্গ শৈশব। ফলে মাতৃস্নেহের জন্য আজীবন আকাঙ্ক্ষিত এই পুত্র প্রয়োজনে মায়ের সঙ্গে কবরে থাকতেও রাজি। তবে বাস্তবে তা সম্ভব না হলে কবি বেদনাকেই আপন করে নেন। অন্যদিকে এই বেদনাবোধ তাঁকে খালি হাতে ফেরায়নি। 'সংগোপনে যোগ্য' করে তুলেছে কবিকে। আর কবিও সেই বোধকে সংগোপনে সাজিয়ে রাখেন 'সেফ্‌টি-ম্যাচের মতো বুকে'। কবির দুঃখগুলো তখন হয়ে ওঠে একেকটি 'দেশলাই-কাঠি'। সেই কাঠিতে শুধু ব্যক্তিগত 'দুঃখবারুদ'ই জমা হয় না–অন্যের দুঃখ শুষে নেবারও ক্ষমতা অর্জন করে :

> আমার যতো শুভ্রতা সব দেবো
> আমি নিপুণ ব্লটিং পেপার
> সব কালিমা, সকল ব্যথা ক্ষত শুষেই নেবো। (হেলাল, ২০০৩: ২৯)

এভাবেই কবি তাঁর ব্যক্তিগত দুঃখবোধ থেকে বেরিয়ে এসে মানুষের দুঃখবোধে কাতর হওয়ার চেষ্টা করেছেন। অনুভব করার চেষ্টা করেছেন মানুষের সেই গভীর ক্ষতগুলো। কিন্তু মানুষের সঙ্গে মিশতে এসে কবি দেখতে পেলেন আরেক বাস্তবতা :

মানুষের কাছে এসে
নতুন মুদ্রায় আমি নির্জন হলাম,
মিলনের নামে যেন আলাদা হলাম,
একাই ছিলাম আমি পুনরায় একলা হলাম। (হেলাল, ২০০৩ : ৩০)

কবি ব্যক্তিজীবনে দুঃখের অভিঘাতে ক্ষত-বিক্ষত। সে কারণেই মানুষের জনারণ্যে মিশতে চাইলেন কিছুটা স্বস্তি পাওয়ার জন্য কিন্তু নতুন মুদ্রারূপী নতুন বাস্তবতায় সেই স্বস্তি পেলেন না। নিঃসঙ্গচেতনা তাঁকে পুনরায় গ্রাস করে নেয়। শামুকের উপমায় নিজের ভেতরেই গুটিয়ে থাকেন। তখন জীবনানন্দীয় বোধে 'জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা' বলার মতো বিচ্ছিন্নতাবোধ ভর করে কবিসত্তায়। কেননা, 'সভ্যতার অভিশাপজীর্ণ ও সমাজের অভ্যন্তরে স্বশাসিত আধুনিক মানুষের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা-অভিশঙ্কা- চিত্তবৈকল্য এবং বহিশ্চাপ-অন্তশ্চাপই ব্যষ্টিবেদনে সৃষ্টি করে বিচ্ছিন্নতাবোধ।' (বিশ্বজিৎ, ২০১৬ : ১৩) এই বোধ থেকেই কবি জেনে যান :

আমি তো গিয়েছি জেনে প্রণয়ের দারুণ আকালে
নীল নীল বনভূমি ভেতরে জন্মালে
কেউ কেউ চলে যায়, চলে যেতে হয়,
অবলীলাক্রমে কেউ বেছে নেয় পৃথক প্লাবন,
কেউ কেউ এইভাবে চলে যায় বুকে নিয়ে ব্যাকুল আগুন। (হেলাল, ২০০৩ : ৩১)

বনভূমি-তো সবুজ হওয়ার কথা কিন্তু কবিতাটিতে সে বনভূমির রং নীল। আর নীল বেদনার রং। ফলে বোঝা যায়, এ বনভূমি নয়—বনভূমির রূপকে কবির মনোভূমির কথাই এখানে বর্ণিত হয়েছে। ব্যক্তিগত ও বহির্জীবনে যখন বেদনার জন্ম নেয় তখনই বিচ্ছিন্নতা এসে ব্যক্তিমানুষকে গ্রাস করে। ফলে সৃষ্টি হয় পৃথক প্লাবনরূপী পৃথক জগতের। স্তবকটির শেষ চরণে বক্তব্যটি আরো বেশি দৃঢ় হয় যখন শুধু বিচ্ছিন্ন বা আলাদা হওয়া নয়, একেবারে চলে যাওয়ার কথা বলা হয়। কিন্তু হৃদয়ে জমা থাকে 'ব্যাকুল আগুন'। তবে এই 'আগুনের সোনালি সন্ত্রাস'-এর চেয়ে মানুষের পোড়ানো আরো বেশি বিপজ্জনক। কারণ 'মানুষে পোড়ালে আর কিছুই রাখে না/কিছু থাকে না।' আর মানুষের আগুনেই পুড়েছে কবির হৃদয়। ফলে হেলাল হাফিজকে এ অবস্থায় হতে হয় কষ্টের 'ফেরীঅলা'। কবিতার ভেতর তখন জন্ম নেয় এক 'কষ্টদোকান'। সেখানে লাল, নীল, হলুদ এমনই নানা ধরনের কষ্টের পসরা সাজানো। কষ্টগুলোর আগে রঙের নাম দিয়ে তিনি যে বিশেষায়িত করেছেন সেখানে প্রতিটি রং একেকটি বাস্তবতার প্রতীক হয়ে আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'পাথর চাপা সবুজ ঘাসের সাদা কষ্ট' এই চরণটিকে নেয়া যেতে পারে। সবুজ ঘাসের ওপর পাথর চাপা দিলে সেখানকার ঘাস মৃতপ্রায় সাদা বা ফ্যাকাসে আকার ধারণ করে। পাথর চাপা দিয়ে ঘাসগুলোর বেড়ে ওঠার পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ঠিক এমনইভাবে ব্যক্তিকে তার জীবনের শুরুতেই বিকশিত হবার পথ না দিয়ে সে পথ রুদ্ধ করে দিলে সেই ব্যক্তির অবস্থা সবুজ ঘাসের সাদা হওয়ার মতোই মৃতপ্রায় বিবর্ণ হয়ে ওঠে। এইভাবে ধীরে ধীরে চারদিক থেকে বিকশিত হওয়ার

পথগুলো বন্ধ হলে ব্যক্তিমানুষটি হয়ে ওঠেন প্রচণ্ড অভিমানী। এই আত্মাভিমান থেকেই তখন কবিকে বলতে হয়, 'একটি মানুষ খুব নীরবে নষ্ট হবার কষ্ট আছে।' অভিমানটিও কার্যকারণ সূত্রে গাঁথা। কারণ :

নষ্ট রাখীর কষ্ট নিয়ে অতোটা পথ একলা এলাম
পেছন থেকে কেউ বলেনি করুণ পথিক
দুপুর রোদে গাছের নিচে একটু বসে জিরিয়ে নিও,
কেউ বলেনি ভালো থেকো সুখেই থেকো
যুগল চোখে জলের ভাষায় আসার সময় কেউ বলেনি
মাথার কসম আবার এসো। (হেলাল, ২০০৩ : ৪৬)

এই অভিমানের আড়ালে জন্মস্থানের প্রতি কবি অনুভব করেন এক প্রগাঢ় মমতা। সেই মমতা থেকেই কবির জন্মস্থান নেত্রকোণাকে কবি সম্বোধন করেন 'বোন' বলে। ষাটের আরেক কবি রফিক আজাদ (১৯৪১-২০১৬) এই নেত্রকোণার বিরিশিরিতে বসে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন এই ভেবে যে, আসলে 'মানুষের নেই কোনো প্রকৃত ঠিকানা'। তবুও তিনি প্রশ্ন করেছিলেন 'আমার শিকড়ে আমি / ফিরতে পারবো না কেন?/ আমি চাই শিকড়ের খোঁজ, / নিরন্তর অন্বেষণ শিকড় সন্ধান–।' (রফিক, ২০১৬ : ৪২৪)সেই সন্ধানেই জন্মস্থানকে এমন পরম আত্মীয় ভাবা। কিন্তু সেই জন্মস্থানের সঙ্গেই হেলাল হাফিজের দীর্ঘকাল দেখা নেই। বর্তমানের যাপিত জীবনেও একা। রফিক আজাদ প্রশ্ন করেও যেতে পেরেছিলেন 'গারো পাহাড়ের পাদদেশে বিরিশিরি গ্রামে' কিন্তু হেলাল হাফিজের জন্মস্থান হওয়ার পরেও প্রায় যাওয়াই হয় না। অথচ:

হয় তো কেটেছে তার মায়া ও মমতাহীন সজল শৈশব
অথবা গিয়েছে দিন
এলোমেলো পরিচর্যাহীন এক রঙিন কৈশোর,
নাকি সে আমার মতো খুব ভালোবেসে
পুড়েছে কপাল তার আকালের এই বাংলাদেশে। (হেলাল, ২০০৩ : ৫৯)

কবির এই 'কপাল পুড়েছে' শৈশবেই। শৈশবে মায়ের মৃত্যু তাঁকে যেমন অসহায় করে তুলেছিল তেমনি পিতার দ্বিতীয় বিয়ে সেই অসহায়ত্বের সঙ্গে যোগ করে অভিমান। ফলে 'রেটিনার লোনাজলে সাঁতার'(হেলাল, ২০২০: ৪১) কাটতে কাটতে তিনি বড় হন এবং পিতার কাছ থেকে পাওয়া এটিই তাঁর 'মহান উত্তরাধিকার'। পরবর্তী জীবনে বৈষয়িক বা সাংসারিকভাবে তাঁর আর কিছু হলো না। এই 'না হওয়া' থেকে কবির অনুশোচনা নেই–তবে কিছু আক্ষেপ আছে। আর আছে সকলের জন্য শুভ প্রত্যাশা:

হলো না। না হোক,
আমি কী এমন লোক!
আমার হলো না তাতে কি হয়েছে?
তোমাদের হোক। (হেলাল, ২০১৩ : ১৩০)

স্তবকটির তৃতীয় চরণের 'কি' কবিতার ভাব অনুযায়ী হওয়ার কথা 'কী'। কারণ চরণটিতে 'কি' ব্যবহৃত হয়েছে 'মন্দ' বা 'ক্ষতি'জাতীয় বিশেষণ পদের যোজক

পদরূপে। যাই হোক, ব্যক্তিজীবনের বেদনা, বিচ্ছিন্নতা, নিঃসঙ্গতার নেতিবাচকতা থেকে তিনি ক্রমেই ইতিবাচক জীবনভাবনায় ফিরে আসেন। ভালোবাসা পাওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় বলতে পারেন, 'কেউ ডাকেনি তবু এলাম, বলতে এলাম ভালোবাসি।' ভালোবাসার প্রতি বিশ্বস্ত কবি শেষ পর্যন্ত মানুষের প্রতি আস্থা রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরযেমন আস্থা রেখেছিলেন 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ' (রবীন্দ্রনাথ, ২০০০: ১১০২) এই বলে। রবীন্দ্রনাথের এই আপ্তবাক্যকে স্মরণে রেখে তিনি আশাবাদী হয়ে ওঠেন এভাবে :

ভালোবাসাবাসিহীন এই দিন সব নয়–শেষ নয়
আরো দিন আছে,
ততো বেশি দূরে নয়
বারান্দার মতো ঠিক দরোজার কাছে। (হেলাল, ২০০৩ : ৪৮)

২.

প্রেম বিশ্ব-কাব্যসাহিত্যের একটি অন্যতম মৌলিক বিষয়। প্রচীন যুগ, মধ্যযুগ এমনকি বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রেমে আধ্যাত্মিক প্রাধান্য ছিল। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতায় বিশেষত ত্রিশের কবিতা (১৩৩০ ব.) থেকে প্রেম আধ্যাত্মিক থেকে মানসিক এমনকি শারীরিক পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় এই প্রেম বাংলাদেশের কবিতাকেও উজ্জ্বল করে তুলেছে। তবে পুরুষ-কবিচৈতন্যে নারীর শরীর ও মন সে প্রেমের আবাসভূমি। সেখানে প্রেমের লক্ষ্য নারী। সেই লক্ষ্য পূরণে কবিরা কখনো সরাসরি 'শরীরী উপভাষা' ব্যবহার করেছেন, কখনো নদী-নিসর্গকে ব্যবহার করেছেন উপমার আবরণে। বস্তুত :

> ভালোবাসার কবিতায় আমাদের কবিদের স্বাভাবিক স্ফূর্তি লক্ষণীয়। 'এদেশে শ্যামল রঙ রমণীর সুনাম শুনেছি–এমন দীর্ঘ নামের কাব্যগ্রন্থ লিখেছিলেন পঞ্চাশের কবি ওমর আলী। আল মাহমুদের 'সোনালি কাবিন'-ও শ্যামঙ্গিনী বঙ্গনারীর স্তুতিতে মুখর। নারীর প্রায় সর্বত্রই রক্ত মাংসে গড়া রূপ–বাংলাদেশের কবিতায় নারী প্রতীকী অর্থে আসেনি খুব বেশি, জীবনদায়িনী কিংবা প্রেরণাদাত্রী 'আবিসিনীয় কুমারী' রূপেও নয়। শামসুর রাহমানের নারী গার্হস্থ্য, কখনও রিরংসাতপ্ত প্রেমের আধার। আল মাহমুদের প্রথম পর্বে নারী হয়ে উঠেছিল প্রতীকী ব্যঞ্জনাময়, যে ত্রিকালের কলস-কাঁখে ঘাটের পৈঠায় দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে 'পার হয়ে অন্ধকার বিল না জানি কোথায় যাবে এই বৃদ্ধ পথিক পুরুষ।' আহসান হাবীবের প্রেমের কবিতায় নারী কোনো বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত নয়। আবদুল মান্নান সৈয়দ এবং ষাটের অন্যান্য কবিদের [কবির] লিবিডোগ্রস্ততা নারীকে মহিমান্বিত হতে দেয়নি। সে কেবলি কামসহচরী তথা শরীরী প্রেমের অনুষঙ্গ। নির্মলেন্দু গুণের নারীগ্রস্ততা প্রবাদপ্রতিম; তিনি 'চালের আড়তকেও নারীর নগ্নতা' বলে ভুল করেন; 'স্তনাগ্র চূড়ায় স্থির' তাঁর পৃথিবী। (আশরাফ, ১৯৯৪ : ১৩)

চল্লিশ-পঞ্চাশ-ষাটের দশকের এই ধারাবাহিকতায় হেলাল হাফিজের কবিতায় নারী ও প্রেমের উপস্থিতি। হেলাল হাফিজের এ পর্যন্ত (এপ্রিল, ২০২৪) প্রকাশিত কাব্যগুলোয় সেই নারী-প্রেমের কবিতাই বেশি। স্বয়ং কবি হেলাল হাফিজের কাছে 'অক্সিজেন,শস্যদানা, তারপরই প্রেম, তারপর কবিতা। প্রেম মানেই কিন্তু নারী।

পুরুষের প্রেম নয়।' (হেলাল, ২০১৪ : ২৪৫) ফলে কবির কাছে প্রেম ও নারী অভিন্ন। তবে সেই প্রেমে বিরহের শোকগাথাই বেশি।"নিরাশ্রয় পাঁচটি আঙুল" কবিতায় তিনি হাতের পাঁচটি আঙুলকে 'নিরাশ্রয়' বলেছেন। অর্থাৎ একধরনের অসহায়তা প্রকাশ পায়। কবি কাঙ্ক্ষিত নারীকে সেই আঙুলগুলোকে অলংকার করে নিতে আহবান করেন। তারপর বলেছেন একটি বেহালা নিজেকে বাজাতে এসে সেই আঙুলে নিজের চেয়েও বিষাদের বেশি বিস্তৃতি দেখে ফিরে যায়। অসহায় একটি অঙ্গুরীও এসেছিল। কিন্তু সেও চলে গেছে। কবি তখন বলেন : 'ওরা যাক, ওরা তো যাবেই/ ওদের আর দুঃখ কতোটুকু? ওরা কি মানুষ?' কিন্তু 'ওরা' প্রত্যেকেই 'মানুষ'। 'আঙুল' 'বেহালা' 'অঙ্গুরী' এগুলো একেকটি প্রতীক। 'আঙুল' কবির ব্যক্তিপুরুষের প্রতীক আর 'বেহালা', 'অঙ্গুরী' একেকজন নারীর প্রতীক–যাঁরা কবির জীবনে এসেছিলেন ক্ষণিকের জন্য। কবি তাঁদের কাউকেই চিরস্থায়ী পাননি। এইসব নারীর মধ্যে এ কবিতায় কবি একমাত্র 'হেলেন' নামটি উল্লেখ করেন। এক্ষেত্রে কবিতায় ব্যক্তিনাম ব্যবহারের ঐতিহ্য হেলাল হাফিজও অনুসরণ করেন। তবে পরিচয়টি উল্লেখের দাবি রাখে। কবি নিজেই হেলেনের পরিচয় দেন এভাবে, '...হেলেন ছিল আমার সমবয়সী। আমি তার প্রেমে পড়েছিলাম। হেলেন কিন্তু আহামরি কোন সুন্দরী ছিল না, সুন্দরী ছিলেন হেলেনের মা। তাকে [তাঁকে] দেখে আমার ভেতরে মনে হতো আহা উনি যেন আমারই মা! মানুষ আসলে বিচিত্র–আমি সেই বৈচিত্র্যময়দেরই একজন।' (হেলাল, ২০১৪: ২৩১) সেই হেলেন বোঝেননি কিন্তু কবির ইচ্ছেটিও অপ্রকাশিত থাকেনি :

ইচ্ছে ছিলো নদীর বক্ষ থেকে জলে জলে শব্দ তুলে
রাখবো তোমার দুই লাজুক চঞ্চুতে,
জন্মাবধি আমার শীতল চোখ
তাপ নেবে তোমার দু'চোখে। (হেলাল, ২০০৩ : ১৫)

এই 'নদীর বক্ষ' তো কবিহৃদয়। সেখানে জমে আছে 'দুঃখজল'। সেই দুঃখের জন্যই জন্মাবধি কবি শীতল। ফলে সেই শীতলতা থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় কবি আর কারো চোখ খুঁজছেন। তবে এ কবিতায় কবি যাঁর দুচোখে তাপ নেওয়ার কথা বলেছেন তিনি হেলেন নন, তিনি কবির ফুপাতো বোন মেহেরুন্নেছা রেণু–যাঁকে কবি রেণু আপা বলে ডাকতেন। (হেলাল, ২০১৪: ২৩২) যিনি কবির চেয়ে ১০-১২ বছরের বড় এবং যাঁর 'অমিত লাবণ্য' কবিকে 'কল্পনায় অনুপ্রাণিত' করত। কিন্তু সেই রেণু আপাও আজ 'অন্য ঘরে'। এই 'কিশোর কল্পনা'য় রেণু আপার স্মৃতি যেমন উজ্জ্বল হয়ে আছে তেমনি সদ্যযৌবনে শারীরিক উষ্ণতার বাঙ্ময় প্রতিচ্ছবিও প্রকাশ পেয়েছে তাঁর কবিতায়। সেই উষ্ণতার অনুভূতিটি এমন :

তোমার বুকে বুক রেখেছি বলেই আমি পবিত্র আজ
তোমার জলে স্নান করেছি বলেই আমি বিশুদ্ধ আজ
যৌবনে এই তৃষ্ণা কাতর লকলকে জিভ
এক নিশীথে কুসুম গরম তোমার মুখে

কিছু সময় ছিলো বলেই সভ্য হলো
মোহান্ধ মন এবং জীবন মুক্তি পেলো।(হেলাল, ২০০৩: ২০)

স্তবকটিতে এক নারী ও এক পুরুষের শারীরিকভাবে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চিত্র বর্ণিত হয়েছে। তবে এ ঘনিষ্ঠতা প্রাত্যহিক নয়–কোনো এক বিশেষ সময়ে ক্ষণিকের জন্য। তবে স্তবকটির উপস্থাপনার গুণে এ ঘনিষ্ঠতা শুধু জৈবিক তৃপ্তি নয়–জৈবিকতা থেকে মুক্তির আস্বাদ হয়ে উঠেছে। কেননা, সেই নারীর বুকে বুক রেখে সেই পুরুষ পবিত্র হয়েছেন আর তাঁর 'শরীরজলে' স্নান করে হয়েছেন বিশুদ্ধ। অর্থাৎ মিলনের চরম আকাঙ্ক্ষায় পুরুষহৃদয়টি এতদিন বিচলিত ছিল, আজ বিশুদ্ধ হয়েছে। ক্ষণিক-মিলনে শান্তি পেয়েছেন এক দীর্ঘ-ক্লান্ত পথিকপুরুষ। অন্যদিকে এ আকাঙ্ক্ষা শুধু সেই পুরুষের নয়–সেই নারীরও। কেননা, সেই নারীরও মুখ ছিল 'কুসুম গরম'। সেখানেই কিছু সময়ের জন্য ছিল সেই পুরুষের 'তৃষ্ণাকাতর লকলকে জিভ'। ঘনিষ্ঠতার এমন চরম মুহূর্তে 'মোহান্ধ মন এবং জীবন' মুক্তি পেয়েছে। উষ্ণতার এ অভিজ্ঞতা পুরুষটির কাছে প্রথম। কারণ, সেই নারীর কাছে পুরুষটি তেমনি ঋণী, তাঁর বাবা ও মায়ের কাছে যেমন ঋণী । প্রকৃতপক্ষে বাবা-মায়ের কাছে সন্তান প্রথম ঋণী হন। এ পর্যন্ত কবিতাটি আকাঙ্ক্ষিত অথচ অনভিজ্ঞ দুই যুবক-যুবতীর ঘনিষ্ঠতার চিরন্তন অনুভূতির বর্ণনাময় প্রকাশ ছিল। কিন্তু কবিতাটির শুরুতেই কবি সেই নারীর নাম হিরণবালা দিয়ে তাঁকে নৈর্ব্যক্তিক থেকে ব্যক্তিক করে তোলেন। নির্মলেন্দু গুণ (জ.১৯৪৫) যেমন কারো নাম দিলেন না, তবু বললেন :

তাড়া দিও না, নাড়া দিও না।
চুপ ক'রে থাকো মেয়ে।
...   .
মনে করো তুমি লতা,
উঠছো চীনের দীর্ঘ-প্রাচীর বেয়ে।
কাজের সময় কোনো কথা নয়।
চুপ ক'রে থাকো মেয়ে।(নির্মলেন্দু, ২০১১: ৩৯৩)

এখানে ঘনিষ্ঠতায় শারীরিক তৃপ্তির কথা আছে কিন্তু হেলাল হাফিজের 'হিরণবালা'র মতো মুক্তির আনন্দ নেই। তবে নির্মলেন্দু গুণ কারো নাম না নিয়ে এমন ঘনিষ্ঠতাকেও নৈর্ব্যক্তিক করে তোলেন। হেলাল হাফিজ বিশ্বাস করেন 'ভালোবাসা মিলনে মলিন হয়, বিরহে উজ্জ্বল' অথচ:

নারী তুমি শৈল্পিক তাবিজ,
এতোদিন নারী ও রমণীহীন ছিলাম বলেই ছিলো
দুঃখের আরেক নাম হেলাল হাফিজ।(হেলাল, ২০০৩: ২১)

ভালোবাসা বিরহে উজ্জ্বল হলে মিলনের জন্য এত উদগ্রীব কেন কবি? তাহলে কি প্রেম ও নারীকে কবি আলাদা করে দেখছেন। কিন্তু নারী ও প্রেম অভিন্ন বলে অনেক আগেই কবি আমাদের জানিয়ে দেন। প্রকৃতপক্ষে নারী ব্যক্তিপুরুষকে হয়তো স্বস্তি দেয় কিন্তু রমণীহীনতা থেকে যে দুঃখের উৎপত্তি তা থেকেই হেলাল হাফিজ সৃষ্টি করেন কবিতার

পরশ পাথর। যার স্পর্শে জেগে ওঠে মানব-মানবীর চিরন্তন প্রেমানুভূতি। হেলাল হাফিজের প্রেম শুধু নিজের ব্যক্তিগত বেদনা ভুলে থাকার জন্য নয়। প্রেম তিনি শুধু একপাক্ষিক নিতে চাননি, দিতেও চেয়েছিলেন। কিন্তু কবির বিশাল হৃদয় থেকে সেই প্রেম কতটুকুই বা নিতে পেরেছেন নারীরা। এজন্যই কবির অভিমত এমনই:

কতটুকু দিলে বলো মনে হবে দিয়েছি তোমায়,
আপাতত তাই নাও যতটুকু তোমাকে মানায়।(হেলাল, ২০০৩: ৩৩)

শুধু তাই নয়, ভাদ্রের এক বর্ধিত আষাঢ়ে এক নারীর সঙ্গে কবির দেখা হয়েছিল একবারের জন্যই। তারপর আর দেখা হয়নি। সেই এক দেখাতেই প্রেম। তারপর দিন-রাত, বছর-মাস, পথে প্রান্তরে সেই নারীকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। কবি সেই আষাঢ়কে বলেছেন 'চতুর আষাঢ়'। সেই নারীর নামে কবি সব কিছু করেছেন তারপরও তাঁর মন না ভরলে 'এই নে হারামজাদী' বলে পুরো জীবনটাই তাঁকে দিয়ে দিলেন। যদিও তা 'ভুল রমণীর ভালবাসা' তবুও সেই প্রেমের প্রতিই কবি নিজেকে সমর্পণ করেন। প্রতীক্ষা করেন সেই সব নারীর–যাঁদের কবি ভালোবেসেছিলেন:

একবার আমন্ত্রণ পেলে
সব কিছু ফেলে
তোমার উদ্দেশে দেবো উজাড় উড়াল,
অভয়ারণ্য হবে কথা দিলে
লোকালয়ে থাকবো না আর
আমরণ পাখি হয়ে যাবো,–খাবো মৌনতা তোমার।(হেলাল, ২০০৩: ৫৩)

পুরুষপ্রেম দিয়ে নারীর সমস্ত নীরবতাকে গ্রাস করার মতো এমন আত্মবিশ্বাস বিরল। লোকালয় ছেড়ে কবি তাঁর কাঙ্ক্ষিত নারীকে নিয়ে চলে যাবেন অভয়ারণ্যে। সেখানে তিনি পাখি হবেন। জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) উক্ত 'যে জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের' সেই জীবনের সঙ্গে দেখা করবেন। এতসব আয়োজনের পরও যদি সেই নারী 'কথা' না দেন, তাহলে:

আর না হলে যত্ন করে ভুলেই যেয়ো, আপত্তি নেই।
গিয়ে থাকলে আমার গেছে, কার কী তাতে?
আমি না হয় ভালোবেসেই ভুল করেছি ভুল করেছি,
নষ্ট ফুলের পরাগ মেখে
পাঁচ দুপুরে নির্জনতা খুন করেছি, কী আসে যায়? (হেলাল, ২০০৩: ৬২)

'কী আসে যায়' কবি বলছেন, তবে কবির অনেক কিছুই এসে যায়। এ কারণে 'কবিতা একাত্তর' কাব্যে তিনি বলে ওঠেন 'যদি যেতে চাও, যাও/ আমি পথ হবো চরণের তলে' আর 'না ছুঁয়ে তোমাকে ছোঁব' এমন আত্মাভিযান। হেলাল হাফিজের এই অভিযান আক্ষেপে ভরা। এই আক্ষেপ থেকেই 'বেদনাকে বলেছি কেঁদো না' কাব্যে তিনি 'ব্রহ্মপুত্রের মেয়ে'কে অভিশাপ দেন, 'তুমি সুখী হবে'। কবি শৈশব থেকেই তাঁর জীবনে নারীর এভাবেই চলে যাওয়া দেখেছেন। মাকে দিয়ে শুরু। এরপর হেলেন, হিরণবালা, সবিতা, রুণা আপা, নিউইয়র্কের নার্গিস এমনই কতজন! তাঁরা প্রত্যেকেই

কবির জীবনে এসেছিলেন নারীর কোনো না কোনো রূপ নিয়ে। কিন্তু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১২)র কবিতার 'ছেলেবেলার বোস্টুমি' 'মামাবাড়ির মাঝি নাদের আলি', 'কাঁধ ছুঁয়ে আশ্বস্ত করা 'বাবা' কিংবা 'বুকের মধ্যে সুগন্ধি রুমালরাখা বরুণা' তাঁরাও প্রত্যেকে কথা দিয়েছিলেন কিন্তু তাঁরা কথা রাখেননি কিংবা রাখতে পারেননি। ভালোবাসার জন্য সুনীল 'হাতের মুঠোয় প্রাণ' নিয়ে 'দুরন্ত ষাঁড়ের চোখে লাল কাপড়' বাঁধলেও বরুণার বুক থেকে শুধু 'মাংসের গন্ধ' পেয়েছিলেন। (সুনীল,২০০৬: ৩৫-৩৬) হেলাল হাফিজের কবিতায় উল্লিখিত নারীরাও কথা রাখেননি কিংবা রাখতে পারেননি। ফলে হেলাল হাফিজকে ভোগ করতে হয়েছে নির্জনতা আর নিঃসঙ্গতা। সেই নিঃসঙ্গতার ভেতর থেকেই তিনি সৃষ্টি করে যান প্রেমের অমর পঙ্‌ক্তিমালা।

৩.

ষাটের প্রায় সব কবির মধ্যেই একটা দ্রোহবোধ কাজ করেছিল। তবে এই দ্রোহ প্রকাশ পেয়েছে কখনো সরাসরি, কখনো পরোক্ষতার আবরণে। এর কারণটিও স্পষ্ট। সামরিক শাসনে স্বৈরাচারী নীতিতে শিল্পীর স্বাধীনতা থাকে না। এ জন্য:

> শিল্পীর স্বাধীনতার জন্য গণতন্ত্র একটি পূর্বশর্ত, ১৯৫৮-৬৮কালপর্বে সামরিক একনায়কতন্ত্রের প্রচণ্ডতা সেই স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে সর্বাংশে নিঃশেষ করার জন্য নির্মাণ করেছিল এক কালো অবরুদ্ধতার দেয়াল। ১৯৬৯-এ সেই আগ্রাসী একনায়কতন্ত্রের প্রাসাদই কেবল বিপর্যয়ের সম্মুখীন হল না, নব্য-উপনিবেশিকদের আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রজাল উন্মোচিত হল বাঙ্গালির জাতীয় চৈতন্যে। (রফিকউল্লাহ, ২০০৭: ৬৯)

এই চৈতন্যেই হেলাল হাফিজ তাঁর কবিসত্তার উন্মোচন করেন। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু 'ছয় দফা' উত্থাপন করলে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর টনক নড়ে। এই 'ছয় দফা'কে বানচাল করে বাঙালির স্বাধিকার-চেতনাকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য ১৯৬৭ সালে তৎকালীন পূর্ব বাংলার কয়েকজন সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তি এবং ১৯৬৮ সালে বঙ্গবন্ধুকে সাজানো মামলায় জড়ানো হয়। :

> প্রকৃতপক্ষে এই মামলা আইয়ুবের জন্য আত্মঘাতী হয় এবং এ তাঁর পতন ত্বরান্বিত করে। শেখ মুজিবকে এই মিথ্যা মামলায় জড়ানোর জন্য পূর্ব বাংলার জনগণের মনে দারুণ ক্ষোভ ও অসন্তোষের আগুন জ্বলে ওঠে। ছাত্ররা শেখ মুজিবের মুক্তির জন্য সর্বাত্মক আন্দোলন শুরু করে। সরকার এই আন্দোলন দমন করার জন্য পুলিশ ই.পি.আর. আর সামরিক বাহিনীকে মোতায়েন করে। ১৯৬৮ সনের শেষের দিকে এবং ১৯৬৯ সনের প্রথম ভাগে এই আন্দোলন ব্যাপক ও তীব্রতর হয় এবং শেষ পর্যন্ত গণ-অভ্যুত্থানের রূপ গ্রহণ করে।(আবদুর রহিম ও অন্যান্য, ২০০৬: ৪৭৭)

এরকম সময় হেলাল হাফিজ হাজির হলেন তাঁর "নিষিদ্ধ সম্পাদকীয়" নিয়ে:

> এখন যৌবন যার মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়
> এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়।(হেলাল, ২০০৩: ৯)

কবিতাটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই চরণদুটি বাতাসের মতো ছড়িয়ে পড়ে পুরো বাংলায়। আন্দোলনরত ছাত্র-যুবকদের রক্তে আগুন লাগানোর মতো চরণদুটি হয়ে উঠল তাঁদের অগ্নিস্বর। তারপর যখন কবি বললেন:

কোনো কোনো প্রেম আছে প্রেমিককে খুনী হতে হয়।
যদি কেউ ভালোবেসে খুনী হতে চান
তাই হয়ে যান
উৎকৃষ্ট সময় কিন্তু আজ বয়ে যায়।(হেলাল, ২০০৩: ৯)

তখন যাঁরা মধ্যবিত্তদ্বিধায় তাড়িত ছিলেন তাঁরাও অনুপ্রাণিত হলেন। কারণ দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য কিছু করার এই সুযোগ সবসময় পাওয়া যাবে না। আর কবিতায় উদ্ধৃত প্রেমতো দেশপ্রেম, প্রেমিকতো দেশপ্রেমিক আর দেশকে ও দেশের মানুষকে বাঁচানোর জন্য যদি আইয়ুব খানের সামরিক শক্তিকে হত্যা করতে হয় তবুও তা করতে হবে। এমন খুনের পরিবর্তে বাঁচবে কোটি কোটি বাঙালি। চল্লিশের দশকে সুকান্ত ভট্টাচার্য যেমন বলেছিলেন:

আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ
স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি,
আঠারো বছর বয়সেই অহরহ
বিরাট দুঃসাহসেরা দেয় যে উঁকি।(সুকান্ত, ২০১০: ৬২)

যৌবনের এই দুঃসাহসকে ষাটের দশকে এসে হেলাল হাফিজ আরেকবার 'অগ্নি-উৎসাহে' আমন্ত্রণ জানালেন। কবিতাটি লেখার প্রাক্-মুহূর্ত সম্পর্কে কবি বলেন:

> ৬৮-এর শেষ দিককার ঘটনা। একদিন নবাবপুর থেকে রিক্সায় ছড়ে [চড়ে] গুলিস্তান হয়ে হয়ে [হয়ে] ফিরছিলাম। রিক্সাঅলার সঙ্গে রাজনৈতিক বাধাবার্তার [কথাবার্তার] এক পর্যায়ে রিক্সাঅলা বললো, 'কোন কোন ভালোবাসা আছে খুন করাও জায়েজ।'–৬৯-এর অভ্যুত্থানের ঘটনাবলি এবং রিক্সাঅলার এই উক্তিটি মিলেমিশে আমাকে 'নিষিদ্ধ সম্পাদকীয়'-র মেসেজ কি [কী] হবে, তা স্থির করে দেয়। কবিতাটির চূড়ান্ত রূপ পায় ফেব্রুয়ারি '৬৯-এ। (হেলাল হাফিজ, ২০১৪: ১৬৭)

আর কবিতাটি প্রকাশ পাবার পর কবির অনুভূতিটা এমন:

> ঢাকার একটি লিটন [লিটল] ম্যাগাজিনে কবিতাটি ছাপা হয়। আহমদ ছফা ও কবি হুমায়ুন কবির দু'জনে মিলে তাদের [তাঁদের] সাগরেদদের দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়ালে দেয়ালে কবিতাটির দুটি লাইন শ্লোগান আকারে 'চিকা' মারান। সারা বিশ্ববিদ্যালয়ে, ঢাকা শহরের নানা জায়গায় একই শ্লোগান 'এখন যৌবন যার মিছিলে যাবার তা [তার] শ্রেষ্ঠ সময়, এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়।' তখনই বুঝলাম কবিতার কী শক্তি। (হেলাল হাফিজ, ২০১৪: ২২০-২২১)

কবিতাটির দুই ধরনের শক্তি রয়েছে। প্রথমত অন্তর্শক্তি। সে অন্তর্শক্তি বোঝা যায় কবির ভাব-চেতনায়। চেতনায় ছিল বাঙালির স্বাধিকারবোধ আর সেই বোধের ব্যাপ্তি ঘটল তাঁর ভাবনায়। সে ভাবনায় তিনি সংসারী, সংসার-বিরাগী, শাশ্বত শান্তিবাদী কাউকেই বাদ দেননি। জাতির এ দুর্যোগে তিনি কয়েকটিমাত্র চরণে সকলকে এক জায়গায় এনেছেন–উজ্জীবিত করেছেন। দ্বিতীয়ত বহির্শক্তি। এই শক্তিটি প্রকাশ পেয়েছে কবিতাটির শব্দসজ্জায়। শব্দকে তত্ত্বের প্রচারে তৎসম শব্দের প্রয়োগে ভারবাহী করে তুললেন না আবার একেবারে নৈমিত্তিক (Casual) শব্দ ব্যবহারে কবিতাকে

নিম্নস্বরগ্রামেও নিয়ে যাননি। একটি তরুণ, শিক্ষিত, সচেতন শ্রেণিকে জাগিয়ে তোলার জন্য তাদের উপযোগী শব্দই ব্যবহার করেছেন। ফলে ভাবচেতনার সঙ্গে শব্দের অপূর্ব মেলবন্ধনে কবিতাটি মুহূর্তের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এরই মধ্যে আবার যখন তিনি বলেন:

মানব জন্মের নামে হবে কলঙ্ক হবে
এ রকম দুঃসময়ে আমি যদি মিছিলে না যাই,
উত্তর পুরুষে ভীরু কাপুরুষের উপমা হবো
আমার যৌবন দিয়ে এমন দুর্দিনে আজ
শুধু যদি নারীকে সাজাই। (হেলাল, ২০০৩: ১১)

১৯৬৯ সালে বাঙালির গণঅভ্যুত্থান সফলভাবে শেষ হয়েছে। আইয়ুব খানের পতন হয়েছে। ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচনও শেষ হয়েছে। সেই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়লাভ করে। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকরা বাঙালির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে নানা টালবাহানার আশ্রয় নেয়। কবি বুঝতে পারছেন বাঙালির সামনে আরো দুর্দিন আসছে–আরো বড় একটি যুদ্ধ হয়তো অপেক্ষা করছে। সে কারণে এমন দুর্দিনে যারা বিপ্লবী নন, শুধুমাত্র প্রেমিক তাঁদের ব্যক্তিগত প্রেম ছেড়ে দেশপ্রেমে সামিল হতে উদ্বুদ্ধ করেন। "দুঃসময়ে আমার যৌবন" নামে এই কবিতাটি কবি লিখছেন ১৯৭১ সালে ১৪ই ফেব্রুয়ারি–ভ্যালেনটাইন ডে বা বিশ্ব ভালোবাসা দিবসে। এইদিন কবি নারীকে সাজানো ছেড়ে, ব্যক্তিগত ভালোবাসা-ভুলে বাঙালির স্বাধিকার আদায়ের মিছিলে শামিল হতে আহবান জানান। ১৯৪০ সালে প্রকাশিত 'পদাতিক' কাব্যে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯-২০০৩) এমনই আহবান জানিয়েছিলেন মে-ডে তে। ইংল্যান্ডে মে মাসের এক তারিখে বসন্তবরণে ফুলের উৎসব হয়। সেই ফুল-উৎসব পালন করতে সুভাষ মুখোপাধ্যায় নিষেধ করেছিলেন। কারণ:

প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা,
চোখে আর স্বপ্নের নেই নীল মদ্য
কাঠফাটা রোদ সেঁকে চামড়া।(সুভাষ, ২০১৪: ১/২২)

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও হেলাল হাফিজ দুজন কবির কবিতাদুটিতে বক্তব্য ও বাস্তবতা প্রায় একই তবে প্রেক্ষাপট আলাদা। সুভাষ মুখোপাধ্যায় 'ফুল খেলতে' নিষেধ করেছেন মার্কসবাদী চেতনা থেকে আর 'বিশ্ব ভালোবাসা দিবসে' হেলাল হাফিজ শুধু নারীকে সাজাতে নিষেধ করেছেন বাঙালির স্বাধিকার আদায়ের জাতীয়তাবাদী চেতনা থেকে। সেই চেতনা থেকেই হেলাল হাফিজ অনুভব করেছেন ১৯৭১ সালে সংঘটিত মহান মুক্তিযুদ্ধে বীর মুক্তিযোদ্ধারা কীভাবে তাঁদের যুদ্ধাস্ত্রকে প্রেমিকার মতোই বুকে আগলে রেখেছিলেন। প্রেমিকারূপী সেই অস্ত্রকে বীর মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ চলাকালীন 'তাঁবুর ভেতরে ঢুকে' বারবার দেখেছেন, তাঁদের বুকে সেই অস্ত্রের বুক লাগাতেই অস্ত্রটি গর্জে উঠতো আর 'মুহূর্তেই লুফে নিতো অত্যাচারী শত্রুর নিঃশ্বাস' :

অথচ তোমাকে আজ সেই আমি কারাগারে
সমর্পণ করে, ফিরে যাচ্ছি ঘরে
মানুষকে ভালোবাসা ভালোবাসি বলে। (হেলাল, ২০০৩: ১২)

দেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭২ সালে ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে দেশে ফেরেন। দেশে ফিরেই তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে গঠনের কাজে মনোযোগ দেন। এসময় তিনি বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্র জমা দেওয়ার আহবান জানান। এরই পরিপ্রেক্ষিতে "অস্ত্র সমর্পণ" কবিতাটি লেখা। কবিতাটি সম্পর্কে স্বয়ং কবি বলেন:

> আমার কিছু ঘনিষ্ঠ বন্ধু, যারা ফেব্রুয়ারিতে পল্টনে শেখ সাহেবের কাছে অস্ত্র সমর্পণ করেছিল। তারা অস্ত্র সমর্পণের পর বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে আমার হলের রুমে উঠল। অস্ত্র সমর্পণের পর রাতে হলে ফিরে তাদের বিরামহীন কান্না শুরু হয়ে গেল। এই অস্ত্রের সঙ্গে ওদের যে অন্তরঙ্গতা, নির্ভরতা, বিশ্বস্ততা ছিল তা হারিয়ে যেন অসহায় বোধ করতে লাগল। ...এই অনুভূতিটাকেই আমি তাদের হয়ে ওই কবিতায় আনতে চেয়েছি। (হেলাল হাফিজ, ২০১৪: ২০০)

তবে অস্ত্র সমর্পণের এমন 'অসহায়' অনুভূতিই কবি শুধু প্রকাশ করেননি, সেই সঙ্গে যদি প্রয়োজন পড়ে সেই অস্ত্র আবারো ব্যবহার করা হবে এমন সতর্কবার্তাও তিনি দেন। ১৯৭২ সালের ৩১শে জানুয়ারি অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠানে অস্ত্র সমর্পণের পর 'মুজিব বাহিনী'র অন্যতম অধিনায়ক সিরাজুল আলম খান বলেছিলেন 'যারা বিজয়ী, তারা কখনো অস্ত্র সমর্পণ করে না। প্রয়োজনে তারা অস্ত্র জমা রাখে। আমরা অস্ত্র জমা রাখলাম।'(মহিউদ্দিন, ২০১৪: ৬৭) এই 'জমা রাখা' আর 'সমর্পণ'করা শব্দ দুটোর অর্থ এক নয়। সমর্পণের অর্থ স্বত্ব ত্যাগ করে দেওয়া আর জমা রাখার অর্থ হলো প্রয়োজনে ফেরত নেওয়া যাবে। এই প্রয়োজনটি সম্পর্কে হেলাল হাফিজ বলেন:

যদি কোনোদিন আসে আবার দুর্দিন,
যেদিন ফুরাবে প্রেম অথবা হবে না প্রেম মানুষে মানুষে
ভেঙ্গে সেই কালো কারাগার
আবার প্রণয় হবে মারণাস্ত্র তোমার আমার। (হেলাল, ২০০৩: ১২)

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় হেলাল হাফিজ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সক্রিয় ছিলেন। কবি 'একাত্তুর [একাত্তর] এর পঁচিশে মার্চের পর বহু কষ্টে ঢাকা থেকে নেত্রকোণা পালিয়ে এসে যুদ্ধের জন্য যুব এবং ছাত্র সমাজকে একত্র করার প্রচেষ্টা চালান।' (মজিবুর, ২০১৪: ৮৯-৯০) এ সম্পর্কে কবি বলেন 'আমি সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা নই।...তবে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছি।'(হেলাল, ২০১৪: ২০০) এই সহযোগিতা করতে গিয়েই তাঁকে ভুলে থাকতে হয়েছে স্বজন কিংবা প্রিয়মানুষটিকে। এ কারণেই সেই প্রিয় মানুষকে উদ্দেশ্য তাঁকে বলতে হয় 'জন্মভূমি সেদিন তোমার সতীন ছিলো।' কিন্তু "অস্ত্র সমর্পণ"-এর মাত্র দুবছরের মধ্যে কবিকে বলতে হচ্ছে:

এইতো আবার যুদ্ধে যাবার সময় হলো
আবার আমার যুদ্ধ খেলার সময় হলো
এবার রানা তোমায় নিয়ে আবার আমি যুদ্ধে যাবো

এবার যুদ্ধে জয়ী হলে গোলাপ বাগান তৈরি হবে। (হেলাল, ২০০৩: ১৭)

এই কবিতাটি কবি লিখছেন ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরে। দেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র দুই বছরের মাথায় কবিকে আবার যুদ্ধে যেতে হবে! তাহলে কি "অস্ত্র সমর্পণ" কবিতায় মারণাস্ত্রের সঙ্গে পুনর্বার প্রণয়ের কথা বলেছিলেন '৭৩-এ এসে তার কি আবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে? 'এবার যুদ্ধে জয়ী হলে গোলাপ বাগান তৈরি হবে'। তাহলে কি '৭১-এর যুদ্ধে জয়ী হওয়ার পরেও কবির কাঙ্ক্ষিত 'গোলাপ বাগান' তৈরি হয়নি? এমন প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে সামনে এসে দাঁড়ায়। এমনকি দ্বিতীয়বারের এই যুদ্ধে কবি শহিদ হবেন এমন আশঙ্কাও পাওয়া যায়, যখন তিনি বলেন 'আমরা দু'জন হয় তো রানা মিশেই যাবো মাটির সাথে।' বিষয়টি ১৯৭৪-এ এসে কবি কিছুটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করছেন। কবি বুঝতে পারছেন 'পাল্টে গেলো কতো কিছু,–রাজনীতি,/ সিংহাসন, সড়কের নাম, কবিতার কারুকাজ,/ কিশোরী হেলেন'। এসময় কবি আবারো পতনের ডাক দিচ্ছেন, 'পতন দিয়েই আজ ফেরাবে পতন'। কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)ও একসময় এমনই শিকল পরেই শোষণের শিকল বিকল করার কথা বলেছিলেন। ১৯৮০ সালে এসে হেলাল হাফিজ তাঁর হতাশার কারণ স্পষ্ট করলেন। এসময় এসে তিনি অনুধাবন করছেন 'যুদ্ধোত্তর মানুষের মূল্যবোধ' তুমুলভাবে পাল্টাচ্ছে আর তাঁর মনে হয়েছে 'নেতা ভুল'। এসময় কবি দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বলছেন:

আমার কষ্টেরা বেশ ভালোই আছেন, মোটামুটি সুখেই আছেন।
প্রিয় দেশবাসী;
আপনারা কেমন আছেন? (হেলাল, ২০০৩: ৩২)

কষ্টেরা ভালোই আছে অর্থাৎ কবি ভালো নেই। প্রকৃতপক্ষে দেশবাসীও ভালো নেই এমনটা বুঝেই কবি এই প্রশ্ন করেছেন। আশির দশকে দেশবাসীর ভালো থাকার কথাও নয়। এসময় তো বাংলাদেশ ষাটের দশকের মতো পুনরায় সামরিক শাসকের হাতে বন্দী। তার উপরে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টে সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। বঙ্গবন্ধু তাঁর অসীম সাহস, অসাধারণ দক্ষতা ও দূরদর্শিতা দিয়ে এদেশের স্বাধীনতা-যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর সেই নেতৃত্বে সাত কোটি বাঙালি মুক্তি পেয়েছিল পাকিস্তানি শোষণ আর বৈষম্য থেকে। তাঁর বিচক্ষণ নেতৃত্বেই স্বাধীন বাংলাদেশ কেবল পথচলা শুরু করে। এমন সময়ে তাঁকে এদেশেরই কিছু পথভ্রষ্ট ঘাতক রাতের আঁধারে নির্মমভাবে হত্যা করে। যারা বঙ্গবন্ধুকে চিনতে পারেনি তারা আসলে 'মাটি আর মানুষের প্রেমের উপমা সেই/অনুপম যুদ্ধকে...' চেনে না। কেননা:

গাভিন ক্ষেতের ঘ্রাণ, জলের কলস, কাক
পলিমাটি চেনা মানে আমাকেই চেনা।
আমাকে চেনো না?
আমি তোমাদের ডাকনাম, উজাড় যমুনা।(হেলাল, ২০০৩: ৩৬)

কবিতাটিতে এই ‘আমি’ আসলে বঙ্গবন্ধু। এ সম্পর্কে কবি বলেন, ‘আমি এই কবিতাটি লিখেছি বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধুকে মনে করে। ...যিনি এবং তার [তাঁর] দেশ পরস্পর অবিচ্ছিন্ন এক সত্তা!’(হেলাল, ২০১৪: ২৩৫) অথচ এই ‘সত্তা’কেই হত্যা করা হলো বাংলার মাটিতেই। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ও তাদের এদেশীয় সহযোগীরা বাংলাদেশকে বধ্যভূমিতে পরিণত করেছিল। রাস্তাঘাট, বিদ্যালয়, উপসনালয়, কারখানা, ব্যাংক, মানুষের ঘরবাড়ি সবকিছু তারা ধ্বংস করে দিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষকে জীবন দিতে হলো, স্বাধীন দেশে সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে পর্যন্ত হত্যা করল। হেলাল হাফিজ এজন্য দুঃখ করে বলেন, ‘স্বাধীনতা সব খেলো, মানুষের দুঃখ খেলো না।’ এ কারণে আশির দশকে সামরিক শাসনে চরম দুঃসময়ে কবিকে বলতে শোনা যায়, ‘দুঃসময়ে আপনি কিছু বলুন/ একটা কিছু করুন।’ স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা, সামরিক শাসনের সূত্রপাত ও তার দীর্ঘ ধারাবাহিকতা, রাজনৈতিক মূল্যবোধহীনতা এসবের মধ্যে কবির প্রাণ ওষ্ঠাগত। এ অবস্থাতে কবির ব্যঞ্জনাময় আর্তচীৎকার:

> কে আছেন?
> দয়া করে আকাশকে একটু বলেন–
> সে সামান্য উপরে উঠুক,
> আমি দাঁড়াতে পারছি না।(হেলাল, ২০১৩: ১৩২)

৩.১

দেশীয় বাস্তবতার পাশাপাশি বিশ্বসংকটও হেলাল হাফিজের কবিসত্তাকে নাড়া দিয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন রূপ বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সে রূপ আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদী সে আগ্রাসন বন্ধ হয়নি বরং তা ছড়িয়ে পড়েছে আরো বেশি। পুঁজিবাদী মানসিকতা থেকেই প্রভাব বিস্তারের ধারণাটি আসে। আর প্রভাব বিস্তারের প্রথম শর্তই হচ্ছে সাম্রাজ্য বিস্তার। ফলে স্নায়ুযুদ্ধকবলিত বিশ্বে :

> ৮০’র দশকের গোড়ায় অগ্রণী পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে প্রতিক্রিয়াশীল, নয়া রক্ষণশীল, নয়া ফ্যাসিস্ট প্রবণতার বৃদ্ধি লক্ষ করা গেছে। মেহনতিদের প্রতি মারমুখিতার পথ নিয়েছে সাম্রাজ্যবাদ, নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় দমনের, স্বৈরাচারী, সর্বগ্রাসী পদ্ধতির আশ্রয় নিচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদের প্রতিক্রিয়াশীলতা সবচেয়ে বিপজ্জনক রূপ নিচ্ছে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা বাড়িয়ে তোলায়, অস্ত্র প্রতিযোগিতায়, সামরিক হঠকারিতায়, রকেট-পারমাণবিক যুদ্ধের খোলাখুলি আয়োজনে। (সেলেজনেভ ও অন্যান্য, ১৯৮৮: ১৫৫)

এই ‘বিপজ্জনক রূপ’ আর তার ‘আয়োজন’টি হেলাল হাফিজ খেয়াল করেছেন তাঁর কবিজীবনের শুরু থেকেই। ‘মোহরের প্রিয় প্রলোভনে’ কেউ কেউ যুদ্ধবাজ হয়ে যায় কবি তা জানেন। আর বর্তমান বিশ্বে যুদ্ধবাজদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র পারমাণবিক বোমা। হেলাল হাফিজ দুটি চরণে মাত্র ছয়টি শব্দের সহযোগে সেই পারমাণবিক বোমার অমানবিক রূপটি প্রকাশ করেন:

নিউট্রন বোমা বোঝ
মানুষ বোঝ না! (হেলাল, ২০০৩: ২৫)

বিজ্ঞানী জেমস চ্যাডউইক ১৯৩২ সালে নিউট্রন আবিষ্কার করেন। এই নিউট্রন পারমাণবিক নিউক্লিয়াসের গুরুত্বপূর্ণ কণা। নিউট্রনের মাধ্যমেই নিউক্লীয় অস্ত্র তৈরি সহজ হয়ে যায়। যার ফলে অত্যন্ত শক্তিশালী ও মানব সভ্যতার ধ্বংসকারী পারমাণবিক বোমা বানানো সম্ভব হয়। ১৯৪৫ সালে যার প্রয়োগের ক্ষত আজও জাপানকে বহন করতে হয়। পৃথিবীব্যাপী এমন সাম্রাজ্যবাদী অসুস্থ প্রতিযোগিতায় হয়তো কোনো কোনো রাষ্ট্রের ভৌগোলিক, বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য বাড়ে কিন্তু ক্ষতি হয় মানুষের-মানবিকতার। কবিতাটিতে যুদ্ধাহত প্রতিটি মানুষের অজস্র বেদনা ও যুদ্ধের অমানবিকতাকে হেলাল হাফিজ মাত্র দুটি চরণের মাধ্যমে প্রকাশ করলেন। তবে বিশ্বব্যাপী এই পুঁজিবাদী আগ্রাসন ও সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের রোধকল্পে হেলাল হাফিজ রাজনৈতিক চেতনায় বামপন্থি। 'যে সমাজ ব্যবস্থার [ব্যবস্থায়] মানুষ তার মৌলিক মানবিক প্রয়োজন ও অধিকার পেতে পারে-আমি তেমন সমাজ ব্যবস্থায় বিশ্বাসী।' (হেলাল, ২০১৪: ১৬৭) শুধু তাই নয়, এক্ষেত্রে তিনি সরাসরি বলেন, 'আমি সমাজতান্ত্রিক সমাজের স্বপ্ন দেখি।' (হেলাল, ২০১৪: ১৬৭) হেলাল হাফিজের এই স্বপ্ন তাঁর কবিতায় বিশ্বাস হয়ে প্রকাশ লাভ করেছে:

এই নাও বাম হাত তোমাকে দিলাম।
একটু আদর করে রেখো, চৈত্রে বোশেখে
খরা আর ঝড়ের রাত্রিতে মমতায় সেবা ও শুশ্রুষা দিয়ে
বুকে রেখো, ঢেকে রেখো, দুর্দিনে যত্ন নিও
সুখী হবে তোমার সন্তান। (হেলাল, ২০০৩: ২৮)

প্রতিটি রাজনৈতিক দলকেই নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে এগিয়ে যেতে হয়। তবে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে লালিত বামপন্থি দলগুলোকে সেই ঘাত-প্রতিঘাতের একটু বেশি সহ্য করতে হয়। কারণ এ দলগুলোকে বুর্জোয়া শাসনব্যবস্থার প্রায় প্রতিটি স্তরের সঙ্গে লড়তে হয়। একদিকে বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলের গ্রাস, অন্যদিকে পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন এমন ত্রিমুখী আক্রমণের মধ্যে এ দলগুলোকে টিকে থাকতে হয়। আর এ কারণেই কবি দলের দুর্দিনে দলটির যত্ন নেবার কথা বলেছেন। দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ করে ত্রিশ লক্ষ বাঙালির জীবন আর দুই লক্ষ নারীর নির্যাতনের বিনিময়ে পাওয়া এই স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা-যুদ্ধে যেসব বাঙালি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তাঁদের আশা ছিল স্বাধীনতা পেলে 'ভজন গায়িকা সেই সন্ন্যাসিনী' সবিতা মিস্ট্রেস ব্যর্থ চল্লিশে বসে বলবেন, 'পেয়েছি, পেয়েছি', 'পাতা কুড়োনির মেয়ে শীতের সকালে ওম নেবে জাতীয় সঙ্গীত শুনে পাতার মর্মরে','ভূমিহীন মনুমিয়া গাইবে তৃপ্তির গান','যুদ্ধের শিশু সসম্মানে বাঁচবে দুধে-ভাতে'। হেলাল হাফিজ এভাবে স্বাধীনতার স্বপ্নগুলোকে প্রতীকবদ্ধ করেছেন। সেই সঙ্গে একটি রাজনৈতিক আদর্শের কথাও বলেন:

কথা ছিলো একটি পতাকা পেলে
আমাদের সব দুঃখ জমা দেবো যৌথ-খামারে,
সম্মিলিত বৈজ্ঞানিক চাষাবাদে সমান সুখের ভাগ
সকলেই নিয়ে যাবো নিজের সংসারে।(হেলাল, ২০০৩: ৩৮)

'সম্মিলিত বৈজ্ঞানিক চাষাবাদ' বলতে কবি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কথা বলেছেন। যৌথ খামারের ধারণাটিও সমাজতান্ত্রিক। চীনে ১৯৫৫ সালে গ্রামাঞ্চলে সমাজতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক যৌথ-কৃষি-খামার গড়ার আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং এই খামারের মূল নীতি হলো 'শ্রমের পরিমাণ অনুসারে উৎপাদনের বণ্টন'(সুপ্রকাশ, ২০০০: ৯৪)। 'কথা' অনুযায়ী বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর রাষ্ট্রীয় চার নীতি যথা বাঙালি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর থেকে সামরিক শাসনের বলয়ে দেশকে ক্রমেই সেইসব মূলনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করা হতে থাকে। ফলে কবিকে বলতে হয়:

কলিমুদ্দিনের পোলা চিডি দিয়া জানাইছে,–'ভাই
আইতাছি টাউন দেখতে একসাথে আমরা সবাই,
নগরের ধাপ্পাবাজ মানুষেরে কইও রেডি অইতে
বেদম মাইরের মুখে কতোক্ষণ পারবো দাঁড়াইতে।' (হেলাল, ২০০৩: ৪০)

কবিতাটি মাও সেতুং এর 'গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাও'[১]-এর বিপ্লব তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ১৯৬৭ সালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নকশালবাড়ি আন্দোলনেও এ তত্ত্বের প্রয়োগ করা হয়েছিল। মূলত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রীরা ইউটোপিয়া থেকে সমাজতন্ত্রকে পরিণত করেন বিজ্ঞানে এবং তাতে করে সশস্ত্র করেন প্রলেতারিয়েতকে। (সেলেজনেভ ও অন্যান্য, ১৯৮৮: ৩১) সেই চিন্তা থেকেই কবিতায় এমন উক্তি। মূলত আশির দশকে সামরিক শাসনে ঢাকা ও সেনানিবাসকেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে কবির ক্ষোভ ও প্রতিবাদ প্রকাশ পেয়েছে এই কবিতায়। এ কারণেই তিনি সেই শহুরে-শাসককে বলেন এমন কথা, 'সামান্য তক্‌লিফ করে মাঝে মধ্যে গ্রামে যেতে হবে।' কারণ ভদ্রবেশে যারা হিজলতলীর সুখ জবর-দখল করে রেখেছে তাদের পরিচয় হিজলতলীর মানুষেরা জেনেছে। একারণে কবি অনুভব করেন 'একটা কিছু তো আজ যথার্থই সমীচীন।' আর হিজলতলীর সুখ ফিরিয়ে দেবার জন্য কবির প্রয়োজন দুই ইঞ্চি জায়গা–যেখানে কবি করবেন 'বৈজ্ঞানিক চাষাবাদ' :

ক্ষোভ নেই লাবণ্যের পুষ্টিহীনতায়,
যাবতীয় সার ও সোহাগ দিয়ে
একনিষ্ঠ পরিচর্যা দিয়ে
যোগ্য করে নেবো তাকে কর্মিষ্ঠ কৃষকের মতো। (হেলাল, ২০০৩: ৫০)

এই 'কৃষক'তো সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী কবি হেলাল হাফিজ। ১৯৭২ সালের ৩১শে অক্টোবর 'সদ্যস্বাধীন মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে শ্রেণি সংগ্রামের মধ্যদিয়ে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্টার [প্রতিষ্ঠার] লক্ষ্য নিয়ে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের

আত্মপ্রকাশ ঘটে...'। (আলীম, ২০১৮: ৯৪)হেলাল হাফিজ সেই লক্ষ্যেই 'দুই ইঞ্চি' জায়গা চান। আর সে জায়গাতেই মেহনতি মানুষকে করবেন শ্রেণিসচেতন–যেন তাঁরা বলতে পারেন :

হেলায় খেলায় অনেক বেলা ফুরিয়েছে দিন
অবহেলা প্রপীড়িত মানুষেরা শোধ চায় ঋণ, (হেলাল, ২০০৩: ৫৪)

এ-তো স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের সত্তর দশকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদী জাসদের সেই 'শ্রেণি-সংগ্রাম'র ডাক। যেখানে কবি তাঁর ভালোবাসার মানুষটিকেও বলতে পারেন 'লাল শাড়িটা তোমার পরে এসো'। আসলে শোষিত-ব্যথিত-মেহনতি মানুষের প্রতি এক প্রবল সহানুভূতি থেকেই কবির এ বোধ। ব্যক্তিজীবনেও যেমন তিনি বিষয়াদির প্রতি নিরাসক্ত, তেমনি কবিজীবনেও তাঁর সেই নিরাসক্তি কাজ করেছে। ফলে সত্তর-আশির রাজনৈতিক উত্তালে তিনি সমাজতান্ত্রিক বীক্ষাটিকেই আঁকড়ে ধরেছেন। চেয়েছেন গণমানুষের মুক্তি। আর সে কারণেই তিনি বলেন:

সবাই জমায় টাকা,
আমি চাই মানুষ জমাতে! (হেলাল, ২০২০: ৭৩)

৪.

কবিতা সম্পর্কে একটা নিজস্ব বোধ, চিন্তা ও দর্শন প্রত্যেক কবিরই থাকে। এই বোধ, চিন্তা ও দর্শনের মেলবন্ধনেই তাঁরা বক্তব্যকে কবিতায় রূপ দেন। কবিরা কখনো কখনো সেই বোধকেই কবিতা করে তোলেন কিংবা কবিতার মাধ্যমে কবি ও কবিতার সম্পর্ককে তুলে ধরবার চেষ্টা করেন। যেমনটা করেছেন হেলাল হাফিজ। তিনি মনে করেন:

কবির জীবন খেয়ে জীবন ধারণ করে
কবিতা এমন এক পিতৃঘাতী শব্দের শরীর,
কবি তবু সযত্নে কবিতাকে লালন করেন,
যেমন যত্নে রাখে তীর
জেনে-শুনে সব জল ভয়াল নদীর ।(হেলাল, ২০০৩: ৪১)

হেলাল হাফিজ এখানে কবির সঙ্গে জনক আর কবিতার সঙ্গে জন্মের তুলনা করেছেন। কিন্তু কবিজনক কবিতারূপ এমন সন্তানের জন্ম দেন যে জন্মের পর হয়ে ওঠে পিতৃঘাতী। প্রকৃত অর্থে তাই। শব্দের শরীর নিয়ে জন্মগ্রহণ করা এই 'সন্তান' জনক থেকে বিচ্ছিন্ন হলেই মুক্তি পায়। পাবলো নেরুদাও তেমনটি বলেছিলেন, 'শব্দকে তুলে নিয়ে আমি নেড়েচেড়ে দেখি/ যেন সেটি মানুষের শরীর ছাড়া অন্য কিছু নয়'(সফিউদ্দিন, ২০১০: ৩২৬)। অর্থাৎ শব্দের শরীরে থাকে মানুষেরই ব্যথা, বেদনা, সুখ, শোক এমনই বিচিত্র অনুভূতি। এইসব অনুভূতি কবিকে আগে নিজের সত্তায় ধারণ করতে হয়। সেই সুখ বা শোককে নিজের সমস্ত অনুভূতি দিয়ে অনুভব করতে হয়–তারপর সেই অনুভূতিতে শব্দেরা ভ্রুণ হয়ে স্পন্দিত হতে থাকে–তারপর তার জন্ম হয় কবিতারূপে। আবুল হাসান (১৯৪৭-১৯৭৫) যেমন বলেছিলেন, 'ঝিনুক নীরবে

সহো/ ঝিনুক নীরবে সহে যাও/ ভিতরে বিষের বালি, মুখ বুঁজে মুক্তা ফলাও!' (হাসান, ২০০৭: ১২৪) এভাবেই কবিকে মুক্তোরূপ কবিতার জন্ম দিতে হয়। আর সেই কবিতার জন্ম দিয়ে কবিকে বিমোক্ষণ (Catharsis) লাভ করতে হয়–অর্থাৎ একধরনের বিশোধন ঘটে কবির। তারপর আবার নতুন কোনো অনুভূতি নিয়ে এগিয়ে যেতে হয়। সে জন্যই হেলাল হাফিজ বলেন:

কবিতা তো কেঁদে ওঠে মানুষের যে কোনো অ-সুখে,
নষ্ট সময় এলে উঠানে দাঁড়িয়ে বলে–
পথিক এ পথে নয়
'ভালোবাসা এই পথে গেছে'। (হেলাল, ২০০৩: ৪৩)

এই অ-সুখ অসুস্থতা নয়। মানুষের ক্লান্তি, হতাশা আর নৈরাশ্যের অনুভূতি। এইসব অনুভূতি কবিকে উপলব্ধি করতে হয় ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয় চেতনা দিয়ে। সে চেতনা থেকেই নষ্ট সময়েও পথিককে দেখাতে হয় ভালোবাসার পথ। বোদলেয়ার আর র‍্যাঁবো কাব্যজগৎ সম্পর্কে এমনটি ভেবেছিলেন:

> অদৃশ্যকে দেখতে হবে, অশ্রুতকে শুনতে হবে, ইন্দ্রিয়সমূহের বিপুল ও সচেতন বিপর্যয় সাধনের দ্বারা পৌঁছাতে হবে অজানায়। জানতে হবে প্রেমের, দুঃখের, উন্মাদনার সবগুলি প্রকরণ, খুঁজতে হবে নিজকে, সব গরল আত্মসাৎ করে নিতে হবে। পেতে হবে অকথ্য যন্ত্রণা, অলৌকিক শক্তি, হতে হবে মহারোগী, মহাদুর্জন, পরম নারকীয়, জ্ঞানীর শিরোমণি। আর এমনি করে অজানায় পৌঁছানো। (সফিউদ্দিন, ২০১০: ২২)

এই অজানায় পৌঁছাতে হলে কবিকে শেষ পর্যন্ত মানুষের কাছেই যেতে হবে–জানতে হবে মানুষের সেই 'অ-সুখ'কে। আর নিজের কাব্যাত্মায় সেই 'অ-সুখ'কে ধারণ করে লিখতে হবে মানুষেরই জন্য। হেলাল হাফিজ এই দর্শন থেকে তাই বলেন:

আজন্ম মানুষ আমাকে পোড়াতে পোড়াতে কবি করে তুলেছে,
মানুষের কাছে এও তো আমার এক ধরনের ঋণ। (হেলাল, ২০২০: ৬৩)

৫.

বিষয় হলো কবিতার আত্মা আর শিল্পরূপ হলো তার শরীর। মানবজীবনে যেমন আত্মা ও শরীর অবিচ্ছেদ্য, কবিতার ক্ষেত্রেও তাই। বিষয় ছাড়া কবিতা ভাবহীন আর আঙ্গিক ছাড়া প্রকাশহীন। শিল্পের মূল বিষয় হলো ভাব আর সেই ভাবের প্রকাশকৌশলই তাকে কবিতার মর্যাদায় অভিষিক্ত করে তোলে। হেলাল হাফিজের কবিতার পাঠকপ্রিয়তার অন্যতম কারণ তাঁর প্রকাশকৌশল। সেই প্রকাশকৌশলের মধ্যে ছন্দ অন্যতম। কেননা, 'ছন্দ হচ্ছে শ্রুতিগ্রাহ্য ধ্বনি-সৌন্দর্য।' (লতিফ, ১৯৯৬: ১)এই ছন্দ ব্যবহারে হেলাল হাফিজের বৈচিত্র্য রয়েছে। তিনি স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত ও গদ্যছন্দ এ চার প্রকার ছন্দের ব্যবহার করেছেন তাঁর এ পর্যন্ত প্রকাশিত কবিতাগুলোয়। এর মধ্যে অক্ষরবৃত্ত ছন্দে কবিতা লেখার প্রবণতা তাঁর সবচেয়ে বেশি। অক্ষরবৃত্তের নিম্ন স্বরগ্রাম তাঁর কবিতার মেজাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কবিতায় তিনি কখনো পাঠককে আদেশ করেন না, অনুরোধ করেন–মেজাজে বিদ্রোহী হলেও তিনি 'বিনীত বিদ্রোহী'।

এ কারণে অক্ষরবৃত্তের প্রয়োগ বেশি। এরপরেই তাঁর কবিতায় আহবানের সুরে স্বরবৃত্ত ছন্দ গতি সৃষ্টি করে। কিছু কবিতা গদ্যছন্দেও লেখা। তবে মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত কবিতা সবচেয়ে কম–মাত্র ৪টি। তবে ছন্দ ব্যবহারে কিছু কিছু কবিতায় মাত্রার অসম বিন্যাস লক্ষ করা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ:

এখন যৌবন যার/ মিছিলে যাবার তার/ শ্রেষ্ঠ সময় ২১ মাত্রা
এখন যৌবন যার/ যুদ্ধে যাবার তার / শ্রেষ্ঠ সময় ২০ মাত্রা

'নিষিদ্ধ সম্পাদকীয়' কবিতার বিখ্যাত এই চরণদুটিতে দেখা যায় যে, তিন পর্বের প্রথম চরণের পর্বের মাত্রাবিন্যাস ৮+৮+৫ এবং দ্বিতীয় চরণে ৮+৭+৫। প্রথম চরণে ২১ মাত্রা এবং দ্বিতীয় চরণে ২০ মাত্রা। দুই চরণে মাত্রার অসাম্য রয়েছে। অক্ষরবৃত্ত অনুযায়ী প্রথম চরণে হওয়ার কথা ৮+৮+৬। এমন মাত্রাবিন্যাস ধরলে প্রথম চরণে ১ মাত্রার ঘাটতি রয়েছে আর পরের চরণে ঘাটতি রয়েছে ২ মাত্রার। একইভাবে:

কেউ আসে রাজপথে সাজাতে সংসার
কেউ আসে জ্বালিয়ে বা জ্বালাতে সংসার।

এখন চরণটিতে প্রথম পর্বে ১ মাত্রা কম। কিন্তু দ্বিতীয় চরণে 'বা' লাগিয়ে সে শূন্যতা পূরণ করা হয়েছে। ফলে তার মাত্রাবিন্যাস হয়েছে ৮+৬=১৪ মাত্রা। তবে এ ব্যাপারে কবির অভিমতটি এমন: 'আমি ছন্দ মেনে ছন্দের নিয়ম ভেঙেছি। আমার অনেক কবিতার ক্ষেত্রে দেখবে কবিতাটা অক্ষরবৃত্তে রচিত মনে হলেও আসলে কিন্তু গদ্যকবিতা। ...আমি প্রতিটি কবিতার চরণ ভাগ করেছি সমমাত্রিক পর্বে, হয় ৮ মাত্রা, নয়তো ৬ মাত্রা।'(হেলাল, ২০১৪: ২০২) কিন্তু এমন বক্তব্য অনুসারে অনেক কবিতার মধ্যেই এই মাত্রার সমমাত্রিকতা পাওয়া যায় না–ফলে কবির কথামতো সেগুলো অক্ষরবৃত্তের আদলে অনেক সময় গদ্যকবিতা হয়ে ওঠে। তবে মাত্রার এ অসাম্য উচ্চারণের সময় তালের গুণেই পূর্ণ হয়ে ওঠে। পাঠক নিজেই সেই শূন্যতাটুকু অবচেতনে পূরণ করে নেন। কবিও তেমনি বলেন, 'আমার কবিতার রিদম আছে বলেই লোকে সহজে মনে রাখতে পারে।'(হেলাল, ২০১৪: ২০২) এই 'রিদম' সৃষ্টির জন্যই তাঁর কবিতায় অক্ষরবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রভাব বেশি। অন্যদিকে গদ্য ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার কম।[২]

৫.১

ছন্দের সঙ্গে কাব্যভাষার রয়েছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, 'প্রত্যেক ভাষারই একটা স্বাভাবিক চলিবার ভঙ্গি আছে। সেই ভঙ্গিটারই অনুসরণ করিয়া সেই ভাষার নৃত্য অর্থাৎ তাহার ছন্দ রচনা করিতে হয়।' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৪: ৩১) ফলে ছন্দের গতিটা প্রকাশ পায় কবিতার শব্দব্যবহারের মাধ্যমে। কবিতাকে গভীর ভারবাহী করার জন্য হেলাল হাফিজ অকারণে তৎসম শব্দ ব্যবহার করেন না। শব্দকে কবিতার চরণে তিনি বসতে দেন স্বাভাবিকভাবে। ফলে ভাবের সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটে তাঁর প্রায় প্রতিটি কবিতায়। তবে জোড়শব্দ ব্যবহারে তিনি যে

শব্দবন্ধ তৈরি করেন তা নিঃসন্দেহে ব্যঞ্জনাবহ। যেমন 'সংসার বিরাগী', 'দুর্বিনীত যৌবন', 'অংকুরিত অগ্নুৎসব', 'লাজুক চঞ্চু', 'নিটোল স্ট্রাটেজি', 'শৈল্পিক তাবিজ', 'চৈত্রের চিতা', 'অদ্ভুত বন্ধ্যা', 'উর্বরা ফাগুন', 'জ্যেষ্ঠ শামুক', 'ধ্রুপদী আকাশ', 'পুষ্পিত বিজ্ঞান', 'উজাড় যমুনা', 'চতুর আষাঢ়', 'বুকের গেরস্থালি', 'পরিপুষ্ট প্রেমিক', 'বিনীত বিদ্রোহী' এমন শব্দবন্ধ বাংলা কবিতায় মৌলিক। বিশেষ্য পদের পূর্বে কবির স্বনির্বাচিত বিশেষণ ব্যবহারে শব্দবন্ধটি ব্যঞ্জনাবহ হয়ে ওঠে। তবে, এমন পরিশীলিত শব্দ ছাড়াও হেলাল হাফিজ ব্যবহার করেছেন 'হারামজাদী', 'চুত্‌মারানি' এমন সম্বোধনবাচক শব্দ। পাশাপাশি 'ভোলাইয়া', 'ঠগাইবেন','অহনো', 'দেখতাছি', 'অইবোই', 'পোলা', 'চিডি', 'মাইর', 'রাইত' এমন আঞ্চলিক শব্দও ব্যবহার করেন কবি। তবে কবিতার মেজাজ অনুযায়ী শব্দগুলো ব্যবহারের ফলে আরোপিত না হয়ে সর্বজনবোধ্য হয়ে ওঠে। তবে কিছু শব্দের প্রতি রয়েছে কবির নিজস্ব পক্ষপাত। যেমন, বুক, অশ্লীল, ভুল, মৌলিক, চারু, সতীন, আশ্রম এই শব্দগুলো কবি একাধিকবার ব্যবহার করেন ভিন্ন ভিন্ন কবিতায়। তবে একই শব্দ একই কবিতায় বারবার ব্যবহারের প্রবণতাও দেখা যায় হেলালের কবিতায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, *যে জলে আগুন জ্বলে* কাব্যের ''ইচ্ছে ছিলো" কবিতার কথা। কবিতাটিতে 'ইচ্ছে ছিলো' শব্দটি বারবার কোরাসের মতো ব্যবহার করা হয়েছে। শহীদ কাদরী (১৯৪২-২০১৬)র "রাষ্ট্র মানেই লেফট রাইট" "তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা", শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬)-এর "স্বাধীনতা তুমি", "ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯", "তোমাকে পাবার জন্য হে স্বাধীনতা" এইসব কালোত্তীর্ণ কবিতাতে এমন পুনরুক্তির কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে। 'প্রকৃতপক্ষে পুনরুক্তি ও তালিকার এই বিশেষ আঙ্গিকটি আহৃত হয়েছে ইংরেজ কবি Adrian Henri-এর কবিতা থেকে।... একটি ধ্রুবপদকে বারবার ফিরিয়ে আনা এবং বিবিধ প্রেক্ষিত থেকে একটি ঘটনাকে বর্ণনার এই কৌশল হেনরির মজ্জাগত।' (আশরাফ, ১৯৯৪: ৩৯-৪০) হেনরির এ কৌশলটি ষাটের দশকের কবিদের বেশ প্রভাবিত করেছিল। হেলাল হাফিজ 'ইচ্ছে ছিলো' এই একটি শব্দকে কবিতায় বারবার ব্যবহার করে ইচ্ছেটাকেই বড় করে বিচিত্র চিত্রকল্পে (Image) প্রকাশ করেছেন। তবে কবিতার শেষে 'শুধু তুমি অন্য ঘরে' এমন সমাপ্তিচরণের প্রয়োগ করে কবিতায় নাটকীয়তা সৃষ্টি করেন। কারণ এই চরণটি শোনার জন্য পাঠক মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না। শুধু নাটকীয়তা নয়, হেলাল হাফিজ গল্পের আবহে কিছু কবিতা নির্মাণের চেষ্টা করেছেন। *যে জলে আগুন জ্বলে* কাব্যের "শামুক" এমনই একটি কবিতা। আবার একই কাব্যের "হিজলতলীয় সুখ" কবিতাটি 'বলাই বাহুল্য আমি রাজনীতিবিদ নই, সুবক্তাও নই' বলে বক্তৃতার ঢঙে শুরু হচ্ছে এবং পুরো কবিতাটি বক্তৃতার ঢঙেই লেখা হয়েছে। কিন্তু "ব্যবধান" কবিতাটিতে কবিতার চেয়ে বক্তব্যই বড় হয়ে উঠেছে। 'নদীর মৌনতা নিয়ে মুগ্ধ মানুষ' এমন দুএকটি চরণ কবিতাটির 'পতন' রোধ করে। "তৃষ্ণা" কবিতাটিকে

সেই পতন থেকে বাঁচানো যায়নি। কবিতাটি পুরোপুরি ব্যক্তির নিজস্ব বক্তব্য হয়ে উঠেছে। চিত্রকল্প-সৃষ্টিতে হেলাল হাফিজ কবিতায় অতিবর্ণনার আশ্রয় নেন না। কবিসত্তায় আগে কোনো চিত্রকে কল্পনা করেন এরপর সেই কল্পনাকে সংক্ষিপ্ত শব্দায়োজনে একটি পূর্ণ ইমেজ তৈরি করেন। যেমন 'যে জলে আগুন জ্বলে' কাব্যের "অমীমাংসিত সন্ধি" কবিতায়:

অপূর্ণতায় নষ্ট-কষ্টে গেলো
এতোটা কাল, আজকে যদি মাতাল জোয়ার এলো
এসো দু'জন প্লাবিত হই প্রেমে
নিরাভরণ সখ্য হবে যুগল-স্নানে নেমে।

স্তবকটিতে 'মাতাল' অর্থাৎ উচ্ছল জোয়ারের চিত্র ভেসে ওঠে। সেই জোয়ারে প্রেয়সীকে প্রেমিকের সঙ্গে 'প্লাবিত' হওয়ার আহবান জানানো হয়েছে। সেই প্লাবনে ভাসতে ভাসতে 'যুগল-স্নানে' তাদের 'সখ্য' হবে। আর সেই 'সখ্য'টি হবে 'নিরাভরণ'। শব্দটি হওয়ার কথা 'নিরাবরণ'। চিত্রকল্পে জোয়ার-প্লাবনে যুগল-স্নানের যে রসাবহ সৃষ্টি হয়েছে তাতে আবরণহীন হওয়ারই কথা। কবি 'নিরাভরণ' শব্দটি ব্যবহার করে হয়তো তাদের দুজনকে 'প্রাকৃত' থেকে রক্ষা করেছেন। কারণ সেই স্নানে তিনি শুধু সেই যুগলের আভরণ খুলে নিয়েছেন, আবরণ নয়।

৫.২

হেলাল হাফিজের কবিতার অন্যতম বড় শক্তি তার অলংকার। বিশেষ করে অনুপ্রাস ব্যবহারে তিনি সিদ্ধহস্ত। আদি, মধ্য ও অন্ত্যমিলের ব্যবহারের কারণে তাঁর কবিতা সহজে পাঠকচিত্তে স্থান করে নেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'বেদনাকে বলেছি কেঁদো না' কাব্যের "ব্রহ্মপুত্রের মেয়ে" কবিতার একটি স্তবক দেখা যায়:

বেদনা আমাকে নিয়ে আশৈশব খেলেছে তুমুল, আর
তিলে তিলে শিখিয়েছে সহনশীলতা,
নিলাজ নখের মতো দুঃখ কেটে কেটে আমি
আজকাল অর্জন করেছি মৌন উদ্ভিদের মুখর স্তব্ধতা,

স্তবকটির দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণের শেষে 'তা' এর অন্ত্যমিল দেওয়া হয়েছে। এছাড়া প্রথম চরণে ব, আ ধ্বনি, দ্বিতীয় চরণে ত, শ ধ্বনি তৃতীয় চরণে ন, ক, ম ধ্বনি, চতুর্থ চরণে আ, জ, ক, ম ধ্বনির বারবার ব্যবহারে ধ্বনিসাম্যের ভিত্তিতে ঘটেছে অনুপ্রাস। অনুপ্রাসের পাশাপাশি উপমা ব্যবহারে দারুণ দক্ষ হেলাল হাফিজ। 'কী দারুণ বেদনা আমাকে তড়িতাহতের মতো কাঁপালো তুমুল', আমার একেকটি দুঃখ একেকটি দেশলাই কাঠির মতন', 'পাঁজরের নাম করে ওসব সংগোপনে সাজিয়ে রেখেছি আমি সেফ্‌টি-ম্যাচের মতো বুকে', 'নারী তুমি আমার ভিতর হও প্রবাহিত দুর্বিনীত নদীর মতন', 'কিশোরীর বুকের মতন সাদা ভোরবেলা' এমন উপমা ব্যবহারে উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে গভীর সাদৃশ্য নির্মাণ করেন। আবার আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বা বিসদৃশ

কিন্তু ভাবের গভীরতায় তা সম্ভব এমন বিরোধাভাস অলংকারের ব্যবহারও দেখতে পাওয়া যায় হেলাল হাফিজের কবিতায়। যেমন, 'কোনো কোনো প্রেম আছে প্রেমিককে খুনী হতে হয়', 'শাশ্বত শান্তির যারা তারাও যুদ্ধে আসে', 'একদিন একটি বেহালা নিজেকে বাজাবে বলে', 'পৃথিবীর তিন ভাগ সমান দু'চোখ যার', 'সর্বভূক [সর্বভুক] এ কবিতা কবির প্রভাত খায়' এইসব বিরোধাভাস মূলত কবিতায় বিপরীতার্থক ভাবানুভূতি প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। হেলাল হাফিজ কবিতায় ব্যক্তিগত রোমান্টিক ভাবানুভূতি প্রকাশে অতিশয়োক্তি অলংকারের ব্যবহার অনেক করেছেন। 'অসহায় একটি অঙ্গুরী / কনিষ্ঠা আঙুলে এসেই বলেছিলো ঘর', 'নিউট্রন বোমা বোঝ / মানুষ বোঝ না', 'বৃক্ষ হারালে তার সবুজ পিরান, মৃত্তিকার ফুরালে সুঘ্রাণ' 'এই নাও বাম হাত তোমাকে দিলাম' এমন বাকবন্ধে উপমান উপমেয়কে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করে। উপমানই সেখানে প্রাধান্য বিস্তার করে অথচ পুরো কবিতা পড়ার পরই বোঝা যায় উপমানটির আড়ালে উপমেয় অর্থাৎ কবির প্রকৃত বক্তব্যের গভীর মর্মার্থ।

৫.৩

ভাব, ভাষা, ছন্দ-অলংকার আর চিত্রকল্পের এমন মেলবন্ধনে হেলাল হাফিজ তাঁর কবিতায় সৃষ্টি করেন কিছু কালোত্তীর্ণ চরণ–বাঙালি পাঠকের কাছে যেসব পরিণত হয়েছে প্রবাদে। যেমনঃ

i) এখন যৌবন যার, মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়
এখন যৌবন যার, যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়। (হেলাল, ২০০৩: ৯)

ii) কোনো কোনো প্রেম আছে প্রেমিককে খুনী হতে হয়। (হেলাল, ২০০৩: ৯)

iii) এরকম দুঃসময়ে আমি যদি মিছিলে না যাই,
উত্তর পুরুষে ভীরু কাপুরুষের উপমা হবো
আমার যৌবন দিয়ে এমন দুর্দিনে আজ
শুধু যদি নারীকে সাজাই (হেলাল, ২০০৩: ১১)

iv) প্রেমের প্রতিমা তুমি, প্রণয়ের তীর্থ আমার। (হেলাল, ২০০৩: ১৬)

v) জন্মাবধি আমার শীতল চোখ
তাপ নেবে তোমার দু'চোখে। (হেলাল, ২০০৩: ১৫)

vi) দুঃখ তো আমার হাত–হাতের আঙুল–আঙুলের নখ
দুঃখের নিখুঁত চিত্র এ কবির আপাদমস্তক। (হেলাল, ২০০৩: ১৯)

vii) নারী তুমি শৈল্পিক তাবিজ
এতোদিন নারী ও রমণীহীন ছিলাম বলেই ছিলো
দুঃখের আরেক নাম হেলাল হাফিজ। (হেলাল, ২০০৩: ২১)

viii) ভালোবাসা যাকে খায় এইভাবে সবটুকু খায়। (হেলাল, ২০০৩: ২২)

ix) কতোটুকু দিলে বলো মনে হবে দিয়েছি তোমায়,
আপাতত তাই নাও যতোটুকু তোমাকে মানায়। (হেলাল, ২০০৩: ৩৩)

x) একটি মানুষ খুব নীরবে নষ্ট হবার কষ্ট আছে। (হেলাল, ২০০৩: ৪২)

xi) স্বাধীনতা সব খেলো, মানুষের দুঃখ খেলো না। (হেলাল, ২০০৩: ৪৪)

xii) কেউ ডাকেনি তবু এলাম, বলতে এলাম ভালোবাসি। (হেলাল, ২০০৩: ৪৬)

৬.

বিশ শতকের মধ্যষাটে কবিতা লেখা শুরু করেন হেলাল হাফিজ। এ পর্যন্ত কবিতাই লিখেছেন। তবে কবিতার সংখ্যা খুব কম।[৩] প্রথম কাব্য *যে জলে আগুন জ্বলে*তে তিনি যে রাজনৈতিক ও রোমান্টিক উন্মাদনা ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন, পরের কাব্যগুলোতে সেই উন্মাদনা ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসে। প্রথম কাব্যেই তিনি জাতীয়তাবাদী চেতনা থেকে মার্কসবাদী সমাজতান্ত্রিক চেতনার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন কিন্তু সে চেতনারও বিকাশ দেখা গেল না পরবর্তী কাব্যে। এমনকি রোমান্টিক কবিতাগুলোও অনুভূতির পুনরাবৃত্তিতে জড়িয়ে গেল। হেলাল হাফিজের কবিতা এমনিতেই স্বল্পবাকসম্পন্ন। সেই স্বল্পবাকসম্পন্নতা এতটাই সংক্ষিপ্ত হয়ে উঠল যে, প্রথম কাব্যের পরে বেশিরভাগ কবিতা ১-২-৩ চরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল। আবার বক্তব্যের এই সংক্ষিপ্ত প্রকাশই হেলাল হাফিজের কবিতার অন্যতম শক্তি ও বৈশিষ্ট্য। হেলাল হাফিজ মূলত ষাট-সত্তর-আশির দশকের তরুণমেজাজটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। আর সেই উপলব্ধির প্রকাশ ঘটালেন একেবারে স্বতন্ত্র স্বরে। নিয়ন্ত্রিত আবেগের ব্যঞ্জনাবহ উপস্থাপন, সময়ের সঙ্গে শব্দের মেলবন্ধন, অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত অথচ সংক্ষিপ্ত প্রকাশে সমসাময়িক কবিদের মধ্যে তিনি সহজেই স্বতন্ত্র হয়ে ওঠেন। বক্তব্যকে ব্যঞ্জনাবহ করে সরাসরি প্রকাশ করার অপূর্ব দক্ষতা নিয়েই তিনি বাংলাদেশের কাব্যজগতে প্রবেশ করেছেন। তবে হেলাল হাফিজ কবিতাকে ভাবের গভীরতায় কোনো বৌদ্ধিক দর্শনে স্থাপন করেন না কিংবা আধুনিক মানবানুভূতির বিচিত্র অনুষঙ্গে বিচরণ করে না তাঁর কবিতা। বিপ্লব আর প্রেম এ দুয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছে তাঁর কাব্যজগৎ। তবুও ষাটের দশকের বিদ্রোহ আর প্রতিবাদের মধ্যে তিনি 'দুর্বিনীত ধ্রুপদী টংকার তুলে' 'শিল্প আর স্লোগানের শৈল্পিক মিলন' ঘটাতে পেরেছিলেন তাঁর কবিতায়।

মূল গ্রন্থ

হেলাল হাফিজ । *যে জলে আগুন জ্বলে*। (২০০৩)। দিব্যপ্রকাশ, সপ্তদশ সংস্করণ, ঢাকা।

———————। *ভালবেসো একশো বছর*। (১৯৯৪)। ত্রয়ী প্রকাশন, ঢাকা।

———————। *অচল প্রেমের পদ্য*। (১৯৯৪ ক)। ত্রয়ী প্রকাশন, ঢাকা।

———————। *কবিতা একাত্তর*। (২০১৩)। বিভাস, তৃতীয় মুদ্রণ, ঢাকা।

———————। *বেদনাকে বলেছি কেঁদো না*। (২০২০)। দিব্য প্রকাশ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ঢাকা।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. বিশ শতকের ত্রিশের দশকে চীনকে দুধরনের অবরোধের সম্মুখীন হতে হয়। প্রথমত, দেশের অভ্যন্তরে চিয়াং কাই-শেক এবং দেশের বাইরে থেকে অবরোধ সৃষ্টি করে জাপান। মাও সে তুং তাঁর ঐতিহাসিক লং-মার্চের মধ্য দিয়ে এই দুই অবরোধ মোকাবেলা করেন এবং সফল হন। এই লং-মার্চে তিনি গ্রামের কৃষকদের সঙ্গী করেছিলেন। কাই-শেকের সৈন্যরা কোনো

শহর আক্রমণ করলে মাও -এর লাল ফৌজ কাই- শেকের আক্রমণের আগেই শহর থেকে দূরে গ্রামে অবস্থান নিত। কাই-শেকের সৈন্যরা সেই শহর দখল করার পর পুরো আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে অবস্থান করত। এরকম সময় মাও-এর লাল ফৌজ গ্রাম থেকে বেরিয়ে এসে সেই শহর ঘেরাও করতো এবং কাই-শেকের সৈন্যদের অতর্কিত পরাজিত করত। দ্রষ্টব্য: সুপ্রকাশ রায় (২০০০), *মাও সেতুঙ*, র‍্যাডিক্যাল, পঞ্চম মুদ্রণ, কলকাতা, পৃ. ৭১-৭৬

২. **হেলাল হাফিজের কবিতার ছন্দ নির্মাণ অনুযায়ী শ্রেণিকরণ**
স্বরবৃত্তঃঅন্যরকম সংসার, হিরণবালা, ফেরিওয়ালা, যাতায়াত, তোমাকেই চাই, অমীমাংসিত সন্ধি, প্রস্থান, অচল প্রেমের পদ্য-৩, ৪, ৫, ১২, ১৩, আপনি, ওড়না, স্রোতস্বিনী ভালোবাসা।
মাত্রাবৃত্তঃ তৃষ্ণা, হৃদয়ের ঋণ, অচল প্রেমের পদ্য-৮, ১০।
অক্ষরবৃত্তঃ নিষিদ্ধ সম্পাদকীয়,নিরাশ্রয় পাঁচটি আঙুল,অস্ত্র সমর্পণ,বেদনা বোনের মতো,ইচ্ছে ছিলো, প্রতিমা, নিখুঁত স্ট্র্যাটেজি,আমার সকল আয়োজন, দুঃখের আরেক নাম, প্রত্যাবর্তন,তীর্থ,কবিতার কসম খেলাম,পরানের পাখি,বাম হাত তোমাকে দিলাম,শামুক,আমার কী এসে যাবে,ইদানীং জীবন যাপন,পৃথক পাহাড়,অহংকার,কোমল কংক্রিট (পয়ার),নাম ভূমিকায়,সম্প্রদান,একটি পতাকা পেলে,মানবানল,যার যেখানে জায়গা,কবি ও কবিতা,উৎসর্গ,যেভাবে সে এলো,যুগল জীবনী,লাবণ্যের লতা, ভূমিহীন কৃষকের গান, কবুতর, নেত্রকোণা, তুমি ডাক দিলে, হিজলতলীর সুখ, রাখাল,ব্যবধান,কে,ক্যাকটাস,ঘরোয়া রাজনীতি,ডাকাত,সুন্দরের গান, অচল প্রেমেরপদ্য-২,৬,ব্রহ্মপুত্রের মেয়ে,দেয়াল, ধ্রুবতারা,অবেলার খেলা, থুতু,লজ্জা,তাবিজ, ঢেউ,লীলা, বুকের দোকান,অনির্ণীত নারী, পিতার পত্র (পয়ার),সঞ্চয়,কৃষ্ণপক্ষ,জয়,বাসনা।
গদ্যছন্দঃ দুঃসময়ে আমার যৌবন,অগ্ন্যুৎসব,উপসংহার, রাডার,রাখালের বাঁশি,অচল প্রেমের পদ্য-১ (সমিল),৭ (সমিল),৯,১১,ঘুড়ি (চাল অক্ষরবৃত্তের),নীল খাম (লোকছন্দ),অশ্লীল সভ্যতা।

৩. *যে জলে আগুন জ্বলে* কাব্যের কবিতা ৫৬টি। *ভালবেসো একশো বছর* কাব্যে পূর্বের কাব্যেরই কিছু কবিতা সংকলিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে এটি কবির মৌলিক কাব্য নয়। বরং *অচল প্রেমের পদ্য*তে কিছু নতুন কবিতা যুক্ত হয়েছে। *কবিতা একাত্তর*-এ *যে জলে আগুন জ্বলে*র ৫৬টি কবিতা ও *অচল প্রেমের পদ্য*র ১৩টি কবিতার সঙ্গে নতুন মাত্র দুটি কবিতা যুক্ত হয়েছে। আবার *বেদনাকে বলেছি কেঁদো না* কাব্যে ২০টি নতুন কবিতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে *কবিতা একাত্তর*-এর ১৫টি কবিতা। সব মিলিয়ে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত কবিতার সংখ্যা ৯১টি।

সহায়ক গ্রন্থ

আবুল হাসান (২০০৭)। ‘পৃথক পালঙ্ক’। *আবুল হাসান রচনা সমগ্র*। বিদ্যা প্রকাশ, চতুর্থ সংস্করণ, ঢাকা।
এস.এম. আবদুল লতিফ (১৯৯৬)। *ছন্দ পরিচিতি*। ইউরেকা বুক এজেন্সী, ষষ্ঠ সংস্করণ, রাজশাহী।
খোন্দকার আশরাফ হোসেন (১৯৯৪)। *বাংলাদেশের কবিতা অন্তরঙ্গ অবলোকন*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
নির্মলেন্দু গুণ (২০১১)। ‘মুঠোফোনের কাব্য’। *নির্বাচিতা*। কাকলী প্রকাশনী, সপ্তম সংস্করণ, ঢাকা।
বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০১৬)। *নৈঃসঙ্গ্যচেতনা*। এ্যাডর্ন পাবলিকেশন্স, ঢাকা।
মজিবুর রহমান জজ (২০১৪)। ‘স্মৃতির ভীড়ে হেলাল হাফিজ’। *কষ্টের ফেরিওয়ালা* [গ্রন্থনা রামশংকর দেবনাথ]। বিভাস, বর্ধিত সংস্করণ, ঢাকা।
মহিউদ্দিন আহমদ (২০১৪)। *জাসদের উত্থান-পতন: অস্থির সময়ের রাজনীতি*। প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।
মামুন রশীদ (২০১৫)। *ষাটের কবি স্বাতন্ত্র্য ও বৈভবে*, ত্রয়ী প্রকাশন, ঢাকা।
মুহম্মদ আবদুর রহিম, আবদুল মমিন চৌধুরী, এ.বি.এম.মাহমুদ ও সিরাজুল ইসলাম (২০০৬)। *বাংলাদেশের ইতিহাস*। নওরোজ কিতাবিস্তান, দ্বাদশ সংস্করণ, ঢাকা।
মো. আব্দুল আলীম (২০১৮)। *বাংলাদেশের বাম রাজনীতি বিভ্রান্তি ও বিভক্তি*। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।
রফিক আজাদ (২০১৬)। ‘বিরিশিরি পর্ব’। *কবিতাসমগ্র*। অনন্যা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ঢাকা।

রফিকউল্লাহ খান (২০০২)। *বাংলাদেশের কবিতা সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর*। একুশে পাবলিকেশন্স, ঢাকা।
(২০০৭)। *কবিতা ও সমাজ*। মাওলা ব্রাদার্স-প্রথম সংস্করণ, ঢাকা।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৪০৪ব.)। *ছন্দ* (সম্পা. প্রবোধচন্দ্র সেন)। বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০০০)। 'সভ্যতার সংকট'। *প্রবন্ধসংগ্রহ* [সংক. রবিশঙ্কর মৈত্র],সময়, ঢাকা।
রামশংকর দেবনাথ [গ্রন্থনা] (২০১৪)। *কষ্টের ফেরিওয়ালা*। বিভাস, বর্ধিত সংস্করণ, ঢাকা।
ল সেলেজনেভ, ভ ফেতিসভ (১৯৮৮)। *বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম* [অনু. ননী ভৌমিক]। প্রগতি প্রকাশন, মস্কো।
সফিউদ্দিন আহমদ (২০১০)। *কবিতার বিস্ময়: বোদলেয়ার-র‍্যাঁবো-পাবলো নেরুদা*। জিনিয়াস পাবলিকেশন্স, ঢাকা।
সুকান্ত ভট্টাচার্য (২০১০)। 'ছাড়পত্র'। *সুকান্তসমগ্র*। পুনর্মুদ্রণ, চারুলিপি, ঢাকা।
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (২০০৬)। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা।
সুপ্রকাশ রায় (২০০০)। *মাও সেতুঙ*। র‍্যাডিক্যাল, পঞ্চম মুদ্রণ, কলকাতা।
সুভাষ মুখোপাধ্যায় (২০১৪)। 'পদাতিক'। *কবিতাসংগ্রহ১* (সম্পা. সুবীর রায়চৌধুরী)। দে'জ পাবলিশিং, পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা।
সৌমিত্র শেখর (২০১৪)। 'নিভৃতচারী সোচ্চার কবি হেলাল হাফিজ'। *কষ্টের ফেরিওয়ালা* (গ্রন্থনা রামশংকর দেবনাথ)। বিভাস, বর্ধিত সংস্করণ, ঢাকা।
হেলাল হাফিজ (২০১৪)। 'সাক্ষাৎকার'। *কষ্টের ফেরিওয়ালা* [গ্রন্থনা রামশংকর দেবনাথ]। বিভাস, বর্ধিত সংস্করণ, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *ঘরে-বাইরে* : জাতীয়তাবাদী রাজনীতি

মো. মাসুদ পারভেজ*

সারসংক্ষেপ

স্বদেশি আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে নির্মিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *ঘরে-বাইরে* একটি রাজনৈতিক উপন্যাস। ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের বাংলা অঞ্চলে স্বদেশি আন্দোলন একটি রাজনৈতিক আন্দোলনের চরিত্র নিয়ে হাজির হয়। স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ নিজেদের স্বদেশি হিসেবে পরিচয় গড়ে তোলে এবং তাদের কর্মপরিকল্পনায় স্বদেশকেন্দ্রিক বিষয়বস্তু অর্ন্তভুক্ত হয়–যা তাদের মধ্যে জাতীয় চেতনার ভাব জাগ্রত করে। আবার একই সঙ্গে লক্ষ করা যায় যে, স্বদেশি আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের রূপ পায়। *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসে এ সকল প্রেক্ষাপটের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির রূপ অন্বেষণ করা হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধে।

উপনিবেশিত ভারতবর্ষের বাংলা অঞ্চলের স্বদেশি আন্দোলন একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অধ্যায়। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে স্বদেশি আন্দোলনের যে-প্রেক্ষাপট তৈরি হয় তা ধীরে ধীরে সাম্প্রদায়িকতায় রূপ নেয়। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিভেদের রাজনীতি সৃষ্টি করে। স্বদেশি আন্দোলনকেন্দ্রিক ধর্মভিত্তিক-রাজনীতির এই বিভাজন বাংলা অঞ্চলের রাজনৈতিক বলয়ে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদকে আলোচনায় আনে–যা সাহিত্যক্ষেত্রেও স্থান পায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *ঘরে-বাইরে* (১৯১৬) উপন্যাসটি স্বদেশি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের একটি দৃষ্টান্ত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেও এই জাতীয়তাবাদী ভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ফলে তিনি স্বদেশি আন্দোলনের সময়ে জনচেতনা সৃষ্টির জন্য বক্তৃতা, গান ও প্রবন্ধ রচনা করেন। (সৌরেন্দ্রমোহন, ২০১৪ : ৩২৪) আবার ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের বিপক্ষেও তিনি অবস্থান নিয়েছেন। (অমর, ২০০৭ : ৫২) সমকালীন প্রেক্ষাপটে স্বদেশি আন্দোলনকে ঘিরে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির পাটাতন তৈরি হয়। বলা যায়, 'ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের প্রতিরোধে সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদ যেমন তৈরি হয়েছিল, তেমনি গড়ে উঠেছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদ। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে এটি দানা বাঁধে...।' (সুমন সাজ্জাদ, ২০১৬ : ৬০) এই জাতীয়তাবাদের পক্ষে ও বিপক্ষে মতাদর্শও সৃষ্টি হয়। যা *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসে রাজনৈতিক ও সমাজনীতিমূলক দুইটি স্তরে উঠে এসেছে। (শ্রীকুমার, ১৯৬৫ : ১৬৩) এই উপন্যাসের রাজনৈতিক স্তরটির সঙ্গে অবিভক্ত ভারতবর্ষের বাংলা অঞ্চলের

---

* **ড. মো. মাসুদ পারভেজ, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট**

ইতিহাসের স্বদেশি আন্দোলনের সম্পৃক্ততা পাওয়া যায় এভাবে : 'বাংলা দেশে একদিন স্বদেশীর যুগ এসেছিল...।' (রবীন্দ্রনাথ, ২০১৬ : ৪০৬/১০) উপন্যাসে বর্ণিত এই স্বদেশি বিষয়টা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বা স্তর। ইতিহাসের স্বদেশি আন্দোলন আর *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসে স্বদেশি আন্দোলনের যে-রূপ পরিলক্ষিত হয় তা বিশ্লেষণের জন্য তৎকালীন ইতিহাসকে আশ্রয় করা হয়েছে। কারণ সাহিত্যে যখন কোনো রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট কিংবা চরিত্রকে ঘিরে কাহিনি বা প্লট নির্মাণ করা হয় তা ইতিহাসের নিরিখে বিশ্লেষণ না করলে ঐতিহাসিক তথ্য বা উপাত্তের কতোটা প্রত্যয়ন হয়েছে তা অনুধাবন করা যায় না। তবে *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসের কাহিনিতে ইতিহাস থেকে উপাদান গৃহীত হলেও তা ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। কারণ উপন্যাসে ঐতিহাসিক কোনো চরিত্র নেই এবং উপন্যাসে বর্ণিত রাজনৈতিক ঘটনাবলি স্থান ও কাল ধরে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। ইতিহাসের এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে কিছু কাল্পনিক চরিত্রের মধ্য দিয়ে উপন্যাসে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ঘরে-বাইরে উপন্যাসে বর্ণিত স্বদেশি আন্দোলন অবিভক্ত বাংলা অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। বিশেষ করে ১৯০৩-১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ঘটনাবলি এই অঞ্চলের জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে মেরুকরণ করে। স্বদেশি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে স্বদেশিদের মধ্যে চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের আবির্ভাব ঘটে। (সৌরেন্দ্রমোহন, ২০১৪ : ৩২৪) এ প্রসঙ্গে সুমিত সরকার তাঁর *The Swadeshi Movement in Bengal 1903-1908* গ্রন্থে বলেন :

> The politics of Bengal's swadeshi age at first sight appears to present a fairly simple picture of a united movement against the partition gradually splitting up into 'moderate' and extremist' (or 'nationalist') currents, with the second trend eventually developing into 'terrorism'(or what Dr R.C. Majumdar likes to call 'militant nationalism).(Sarkar, 1994 : 31)

অর্থাৎ স্বদেশি আন্দোলনের যুগে 'moderate' ও 'extremist'ভাগে বিভক্ত স্বদেশিরা তাদের কার্যকলাপে একধরনের জাতীয়তাবাদী প্রেক্ষাপট তৈরি করে। যার মধ্যে 'extremist' বা চরমপন্থীরা সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বেছে নেয়।

উপন্যাসের প্রধান তিন চরিত্র সন্দীপ, নিখিলেশ আর বিমলার বয়ানে কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশে যে-দেশাত্মবোধ মুক্তিলাভ করেছিল এবং স্বদেশি আন্দোলনের প্রভাবে উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণির ব্যক্তি-জীবন ও সামাজিক জীবনে যে-রাজনৈতিক ভাবনা সঞ্চারিত হয়েছিল তার জাতীয়তাবাদী রূপ এই উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে। (নীহাররঞ্জন, ১৩৬৯ : ৪৩০) সন্দীপের মধ্যে এই জাতীয়তাবাদ যে-ধরনের বৈশিষ্ট্য নিয়ে হাজির হয়েছে, নিখিলেশের মধ্যে তেমনটি হয়নি। আবার বিমলা চরিত্রের মধ্যে সন্দীপের জাতীয়তাবাদী ভাবনা দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হওয়ার চিত্র যেমন আছে, তেমনি মোহমোচন চিত্রও আছে। ফলে উপন্যাসের কাহিনিতে বিশ শতকের একটি রাজনৈতিক

আন্দোলনকে কেন্দ্র করে নরনারীর 'ব্যক্তি-স্বাধীনতা' ও আবেগসর্বস্ব ভাবনাপ্রসূত দেশাত্মবোধের চিত্র লক্ষ করা যায়। এ প্রসঙ্গে নীহাররঞ্জন রায় বলেন :

> ... উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই আদর্শ ও সংকীর্ণ দেশাত্মবোধের সংকীর্ণতর প্রকাশের মধ্যে যে-বিরোধ বাংলা দেশের নগর-জীবনে একদিন দেখা দিয়াছিল এবং সেই বিরোধ উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর নরনারীর দৈনন্দিন ব্যক্তি-জীবনে যে আবর্ত ঘনাইয়া তুলিয়াছিল, তাহাই "ঘরে-বাইরে" উপন্যাসের উপজীব্য।(নীহাররঞ্জন, ১৩৬৯ : ৪৩১)

অর্থাৎ স্বদেশি আন্দোলনকেন্দ্রিক মতাদর্শের রাজনীতি নাগরিক ও ব্যক্তিজীবনকেও প্রভাবিত করেছিল। উপন্যাসের শুরুতে দেখা যায়, নিখিলেশ আর বিমলার দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়র ছেলে গির্জায় যাবার পথে মিস্ গিলবিকে ঢিল ছুঁড়ে অপমান করে। তার ঢিল ছুঁড়ে মারার কারণ হিসেবে বিমলা বলে : 'আর, অমন ছেলে! স্বদেশীর উৎসাহে তার নাওয়া-খাওয়া ছিল না।' (রবীন্দ্রনাথ, ২০১৬ : ৪০৯/১০) ছেলেটির এমন আচরণে সাধারণের মধ্যে স্বদেশি আন্দোলনের প্রভাব উপলব্ধি করা যায়। অর্থাৎ মিস্ গিলবি অভারতীয় হওয়ায় তাকে ঢিল ছুঁড়ে মেরে স্বদেশি আন্দোলনকারী হিসেবে ছেলেটি নিজের পরিচয় নির্মাণ করেছে। এটা উগ্র-স্বাদেশিকতার পরিচায়ক হিসেবে উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। আর স্বদেশি আন্দোলনের নেতৃত্ব-পর্যায়ের অবস্থা সন্দীপ চরিত্রটির দ্বারা তুলে ধরা হয়েছে। উপন্যাসের প্রারম্ভে এক খ্রিষ্টান নারীকে ঢিল ছুঁড়ে স্বদেশি আন্দোলনের উগ্র স্বাদেশিকতার যে-সূত্রপাত ঘটেছিল তা শেষ হয় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার ইঙ্গিত দিয়ে।

উপন্যাসে স্বদেশি আন্দোলনের চিত্র 'এন্টি-ন্যাশনালিস্ট' নিখিলেশ আর 'উগ্র জাতীয়তাবাদী' (extremist) (Sarkar, 1994 : 62) সন্দীপের মাধ্যমে দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। উপন্যাসে এ প্রসঙ্গে নিখিলেশ সম্পর্কে বিমলা বলে :

> অথচ স্বদেশী কাণ্ডর সঙ্গে যে আমার স্বামীর যোগ ছিল না বা তিনি এর বিরুদ্ধ ছিলেন তা কিন্তু নয়। কিন্তু 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রটি তিনি চূড়ান্ত করে গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি বলতেন, দেশকে আমি সেবা করতে রাজি আছি, কিন্তু বন্দনা করব যাঁকে তিনি ওর চেয়ে অনেক উপরে। দেশকে যদি বন্দনা করি তবে দেশের সর্বনাশ করা হবে।(রবীন্দ্রনাথ, ২০১৬ : ৪০৯/১০)

উপন্যাসে বর্ণিত এই উক্তির দ্বারা নিখিলেশের রাজনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। অর্থাৎ নিখিলেশ স্বদেশি আন্দোলন বিরোধী ছিল না। সে বন্দে মাতরম্-কেন্দ্রিক স্বদেশি আন্দোলনের বিরোধী ছিল। উপন্যাসে সন্দীপের পরিচয় দিয়ে বিমলা বলে :

> এমন সময়ে সন্দীপবাবু স্বদেশী প্রচার করবার জন্যে তাঁর দলবল নিয়ে আমাদের ওখানে এসে উপস্থিত হলেন।...হঠাৎ পাগড়ি-বাঁধা গেরুয়া-পরা যুবক ও বালকের দল খালি পায়ে আমাদের প্রকাণ্ড আঙিনার মধ্যে, মরা নদীতে প্রথম বর্ষার গেরুয়া বন্যার ধারার মতো, হুড় হুড় করে ঢুকে পড়ল। লোকে লোকে ভরে গেল। সেই ভিড়ের মধ্যে দিয়ে একটা বড়ো চৌকির উপর বসিয়ে দশ-বারো জন ছেলে সন্দীপবাবুকে কাঁধে করে নিয়ে এল। বন্দে মাতরম্! বন্দে মাতরম্! (রবীন্দ্রনাথ, ২০১৬ : ৪১০/১০)

উপন্যাসে সন্দীপের আবির্ভাবের এই দৃশ্যে তার নেতৃত্ব-প্রভাব উপলব্ধি করা যায়। তাকে ঘিরে উচ্চারিত বন্দে মাতরম্ স্লোগান থেকে বোঝা যায় যে, সে বন্দে মাতরম্-কেন্দ্রিক স্বদেশি আন্দোলনের নেতা। উপন্যাসে বর্ণিত বিমলার উক্তি থেকে নিখিলেশ আর সন্দীপের মধ্যে রাজনৈতিক মতাদর্শিক বৈপরীত্য লক্ষ করা যায়। একজন বন্দে মাতরম্ বিরোধী আর অন্যজন বন্দে মাতরমে্র পক্ষে। বন্দে মাতরমে্র পক্ষে সন্দীপ তার রাজনৈতিক অবস্থান থেকে নিখিলেশের কাছে জানতে চায়, দেশের কাজে মানুষের কল্পনাবৃত্তির যে একটা জায়গা আছে সেটা সে মানে কি না?(রবীন্দ্রনাথ, ২০১৬ : ৪১৫/১০) দেশের কাজে মানুষের কল্পনাবৃত্তির যে-প্রেক্ষাপটকে সন্দীপ উল্লেখ করেছে সেটা হলো− 'imagined political community'(Anderson, 2006 : 6)। সন্দীপের এই জিজ্ঞাসার উত্তরে নিখিলেশ বলে : 'দেশ-জিনিসকে আমি সত্যরূপে নিজের মনে জানতে চাই এবং সকল লোককে জানাতে চাই...।'(রবীন্দ্রনাথ, ২০১৬ : ৪১৫/১০) সন্দীপের মনে দেশ সম্পর্কে কল্পনা আর নিখিলেশের দেশকে সত্যিরূপে দেখার যে-আকাঙ্ক্ষা এ দুটোই বিপরীত ধারণা। কারণ জাতিগত ধারণায় কখনোই সকলকে জানা সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে এন্ডারসন তাঁর*Imagined Communities* গ্রন্থে বলেন :

> It is *imagined* because the members of even the smallest nation will never know most of their fellow-members, meet them, or even hear of them, yet in the minds of each lives the image of their communion. (Anderson, 2006 : 6)

অর্থাৎ সমসাময়িক অবস্থান করার পরও একটি জাতি, জনগোষ্ঠী বা দেশের সকলকে চেনাজানা সম্ভব নয়। এখানেই নিখিলেশ আর সন্দীপের ভাবনার জগতে পার্থক্য তৈরি হয়েছে। কারণ সন্দীপ একটা কল্পনা দিয়ে দেশকে গ্রহণ করতে চায় আর নিখিলেশ তা সত্যিকারভাবে দেখতে চায়। সেক্ষেত্রে সন্দীপের জাতীয়তাবাদী দেশভাবনা হলো− দেশের পূজার দ্বারা দেশনারায়ণের পূজা করা। (রবীন্দ্রনাথ, ২০১৬ : ৪১৫/১০) এখানে 'দেশনারায়ণ' শব্দটি দ্বারা দেশকে দেবতার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যা ধর্মকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদী রাজনীতির একটি রূপ। আর নিখিলেশ দেশ বলতে বোঝে, এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের ভেদ নেই। (রবীন্দ্রনাথ, ২০১৬ : ৪১৫/১০) অর্থাৎ দেশ হলো উন্মুক্ত। সে দেশকে একটি ভূখণ্ড, ধর্ম ও জাতির পরিচয়ে নির্দিষ্ট করে দেওয়ার বিরোধী। এখানে নিখিলেশের মধ্যে দেশকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদের বিরোধী চেতনা লক্ষ করা যায়। কারণ জাতীয়তাবাদ একটি জাতির অবস্থানকে নির্দিষ্ট করে দেয়। আর নিখিলেশ এই নির্দিষ্টতার বিরোধী। যা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যেও লক্ষ করা যায়। (সৌরেন্দ্রমোহন, ২০১৪ : ৩৫১)

সন্দীপ আর নিখিলেশের রাজনৈতিক অবস্থান বিশ্লেষণের জন্য সমকালীন রাজনীতি ও ইতিহাস খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যে-স্বদেশি আন্দোলনকে ঘিরে সন্দীপের রাজনীতি নিখিলেশ তা অন্যভাবে দেখে। দেশকে দেবতা বানিয়ে, অন্যায়কে কর্তব্য, অধর্মকে পুণ্য হিসেবে ধরে যে-রাজনীতি সন্দীপ করে তা নিখিলেশ সহ্য করতে পারে না। (রবীন্দ্রনাথ, ২০১৬ : ৪১৫/১০) দেশকে দেবতার সঙ্গে তুলনা করার যে-প্রসঙ্গ

নিখিলেশ তুলেছে তা ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদকে নির্দেশ করে। বন্দে মাতরম্ স্লোগানের মাধ্যমে যার উপস্থিতি ঘটেছে। বন্দে মাতরম্ গানটি 'কার্যত হিন্দুত্ববাদী আন্দোলনের স্তোত্র।' এর অর্থ হলো– হে মাতা (দেশ), আপনাকে বন্দনা করি। (এ. জি. নুরানি,২০১৯ : ১১০) সন্দীপের এই দেশ বন্দনা যে উগ্র-স্বাদেশিকতার জন্ম দিয়েছে তার প্রমাণ বিমলার কথায় পাওয়া যায়। বিমলা বলে :

> আমি মানুষ, আমার লোভ আছে, আমি দেশের জন্যে লোভ করব; আমি কিছু চাই যা আমি কাড়ব-কুড়ব। আমার রাগ আছে, আমি দেশের জন্যে রাগ করব; আমি কাউকে চাই যাকে কাটব-কুটব, যার উপরে আমি আমার এতদিনের অপমানের শোধ তুলব। আমার মোহ আছে, আমি দেশকে নিয়ে মুগ্ধ হব; আমি দেশের এমন একটি প্রত্যক্ষ রূপ চাই যাকে আমি মা বলব, দেবী বলব, দুর্গা বলব–যার কাছে আমি বলিদানের পশুকে বলি দিয়ে রক্তে ভাসিয়ে দেব। (রবীন্দ্রনাথ, ২০১৬ : ৪১৬/১০)

উপন্যাসে বর্ণিত বিমলার এই উক্তি তার মধ্যে জন্মানো উগ্র-স্বাদেশিকতার একটি চিত্র। যার পরিণত রূপ হলো উগ্র-জাতীয়তাবাদ। স্বদেশি আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে এই উগ্র-জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে সুমিত সরকার বলেন :

> …the participants in the movement would no doubt have preferred descriptions like 'revolutionary' or 'militant nationalist' as more in keeping in their subjective inclinations. (Sarkar, 1994:62)

অর্থাৎ স্বদেশি আন্দোলনকারীরা বিপ্লবী অথবা উগ্র-জাতীয়তাবাদী হিসেবে নিজের পরিচিতি গড়ে তোলে। আর এক্ষেত্রে তারা ধর্মের আশ্রয় নেয়। এ প্রসঙ্গে উপন্যাসে সন্দীপের একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য। সন্দীপ বলে : 'ধর্মের ধুয়ো দেশের ধুয়ো দুটিকেই পুরোদমে একসঙ্গে চালাচ্ছি–ভগবদ্‌গীতা এবং বন্দেমাতরং আমাদের দুইই চাই…' (রবীন্দ্রনাথ, ২০১৬ : ৪৫৫/১০)। সন্দীপের এই উক্তির দ্বারা নির্দিষ্ট একটি ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে দেশকে উপস্থাপন করা হয়েছে। সন্দীপ ধর্ম ও দেশপ্রেম পরিপূরক হিসেবে ধরে জাতীয় চেতনা নির্মাণ করতে চেয়েছে। এ বিষয়ে *প্রসঙ্গ জাতীয়তাবাদ* গ্রন্থে ডি.ডি. বলেন :

> জাতীয়তাবাদকে দেশপ্রেমের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়। সাধারণত এই শব্দ দুটিকে নিতান্তই আলগাভাবে প্রয়োগ করা হয়, ফলে শব্দ দুটির যেকোনো সংজ্ঞারই বিরোধিতা করা যায়। কিন্তু এ'দুটির মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য করা দরকার কারণ শব্দ দুটির সঙ্গে দুটি পৃথক ও পরস্পরবিরোধী ধারণা জড়িয়ে আছে। 'দেশপ্রেম বলতে আমি বোঝাতে চাইছি কোনো বিশেষ জায়গা ও বিশেষ ধরনের জীবনযাপন পদ্ধতির প্রতি একনিষ্ঠতা, যে-জায়গা ও জীবনযাপন পদ্ধতিকে কেউ পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে কিন্তু অন্য কারও ওপরে তা চাপিয়ে দিতে চায় না। …
>
> অন্যদিকে, জাতীয়তাবাদ আর ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা অবিচ্ছেদ্য। প্রত্যেক জাতীয়তাবাদীর উদ্দেশ্য হল আরও বেশি শক্তি ও আরও বেশি সম্মান নিশ্চিত করা–না, নিজের জন্য নয়, যে-জাতি বা অন্য কোনো কাঠামোর মধ্যে নিজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে ডুবিয়ে দিতে চেয়েছে সে, তার জন্য।(ডি. ডি. ২০১৯ : ৪-৫)

অর্থাৎ ধর্ম, দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ পৃথকভাবে ক্রিয়া করে। দেশপ্রেম মোহমুক্ত একটি বিষয় কিন্তু জাতীয়তাবাদী ভাবনায় ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা ও বলপ্রয়োগের ব্যাপার

থাকে। ফলে ধর্ম আর দেশপ্রেম একত্রিত করে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক অবস্থা তৈরি করা হলে তা সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী প্রেক্ষাপট হাজির করে। যা সাম্প্রদায়িকতাকেও নির্দেশ করে। এ প্রসঙ্গে বিপান চন্দ্র তাঁর *আধুনিক ভারত ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ* গ্রন্থে বলেন, 'সাম্প্রদায়িকতাবাদ হল এমন এক বিশ্বাস, যে একদল মানুষ একটি বিশেষ ধর্মে বিশ্বাস করলে তাঁদের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ সব একই হয়।' (বিপান, ২০১১ : ১) ফলে উপন্যাসে সন্দীপ 'ভগবদ্‌গীতা' ও 'বন্দে মাতরং' দিয়ে যখন দেশপ্রেম আর জাতীয়তাবাদী পরিচয় নির্ধারণ করতে চেয়েছে তখন অন্য ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে বিষয়টা সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। এ প্রসঙ্গে আশীষ লাহিড়ী বলেন :

> উচ্চবর্ণের বাঙালি হিন্দুরা মনে করত তারাই 'দেশ', আর তাদের প্রধান শত্রু দেশদখলকারী ব্রিটিশরা নয়, মুসলমানরাই। এই আবহের মধ্যে বন্দে মাতরম্‌ বাঙালি হিন্দু জাতীয়তাবাদের, হয়তো হিন্দুদের উপনিবেশবাদ-বিরোধিতারও, স্লোগান হয়ে উঠল।(আশীষ, ২০১৯ : ১৮)

বাঙালি হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের এই মনোভঙ্গি অন্য ধর্মাবলম্বী বিশেষত মুসলমানদের প্রতিপক্ষ হিসেবে চিহ্নিত করে। এক্ষেত্রে সন্দীপের ভাষ্য ও কর্ম-অনুযায়ী প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, জাতীয়তাবাদ যদি হিন্দু ধর্মভিত্তিক হয়ে থাকে তাহলে অন্য ধর্মাবলম্বী বিশেষত মুসলমানদের অবস্থান সেখানে কোথায়? (Sarkar, 1994 : 74) এই প্রশ্নের ফলস্বরূপ স্বদেশি আন্দোলনের সময়ে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা সৃষ্টি হয়। (Sarkar, 1994 : 444) হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ক্ষেত্রে এর বিরূপ প্রভাব *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসে লক্ষ করা যায়। এমন পরিস্থিতিতে স্বদেশিখ্যাত সন্দীপ বলে :

> ভাই-বেরাদর বলে অনেক গলা ভেঙে শেষকালে এটা বুঝেছি গায়ে হাত বুলিয়ে কিছুতেই মুসলমানগুলোকে আমাদের দলে আনতে পারব না। ওদের একেবারে নীচে দাবিয়ে দিতে হবে, ওদের জানা চাই জোর আমাদেরই হাতে। (রবীন্দ্রনাথ, ২০১৬ : ৪৮৭/১০)

সন্দীপের এই কথা মুসলমান-বিরোধী সাম্প্রদায়িক মনোভাব এবং একই সঙ্গে তার জাতীয়তাবাদী রাজনীতির বলপ্রয়োগকারী চূড়ান্ত রূপ। সমকালীন রাজনীতিতেও এর প্রভাব লক্ষ করা যায় এভাবে :

> বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ প্রমুখদের রচনা ও ভাষণ হিন্দু-অহিন্দু নির্বিশেষে সকলকে সমানভাবে প্রভাবিত করেনি, বরং অনেক ক্ষেত্রে মুসলিম বিরোধী মনোভাবের জন্ম দিয়েছে। বিপিনচন্দ্র পালের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে তিনি ও তাঁর সমকালীন যুবকবৃন্দ বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার প্রভাবে মুসলিম বিরোধী হয়েছিলেন...। (অমর, ২০০৭ : ৫০)

উপর্যুক্ত উক্তি থেকে অনুধাবন করা যায় যে, সন্দীপের মুসলমান বিরোধী মনোভাবের একধরনের ঐতিহাসিক উৎস ছিল। তবে উপন্যাসে নিখিল ঠিক বিপরীত বক্তব্য নিয়ে হাজির হয়। 'নিখিল বলে, ভারতবর্ষ যদি সত্যকার জিনিস হয় তাহলে ওর মধ্যে মুসলমান আছে।' (রবীন্দ্রনাথ, ২০১৬ : ৪৮৭/১০) কিন্তু নিখিলের এই ভাবনা ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্ব প্রশমন করেনি। কারণ স্বদেশিদের রাজনৈতিক ভাবনাদর্শের বৈশিষ্ট্যানুযায়ী চারটি ধরন উল্লেখ করেন সুমিত সরকার। তাঁর মতে :

> (i) the 'Moderate' tradition, which piecemeal reform culminating at best in colonial self-government as its aim, 'agitation' to win over British public opinion through logically faultless exposures of the 'un-British' ways of the Anglo-Indian bureaucracy as its method, and demanding little in the way of sustained mass work; (ii) 'Constructive Swadeshi', urging the necessity of autonomous self-help efforts (swadeshi enterprise, national schools, village organization) to end the alienation of the English-educated elite, often somewhat indifferent to active politics but aiming at slow but real national self-regenaration−the classic epitome of all this being Rabindranath's 'Atmashakti' concept; (iii) 'Political Extremism' with complete Swaraj or political independence as its theoretical ideal (though in practice Extremist leaders would often be satisfied with 'half a loaf' as Tilak once put it) 'extended boycott' or 'passive resistence' anticipating much of Gandhism as its basic technique, necessarily demanding for its success a high level of mass participation; and (iv) 'Terrorism', seeking immediate independence through methods of individual violence and military conspiracy ardently revolutionary in subjective intent, highly elitist and hence not very effective in practice. (Sarkar, 1985 : 39-41)

এখানে লক্ষণীয় যে, প্রথম ধরনে 'Moderate'পন্থী স্বদেশিরা শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোর বাইরে নিজস্ব শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় ছিল। দ্বিতীয় ধরনে 'Constructive Swadeshi' ঘরানার স্বদেশিরা জাতীয় স্কুল প্রতিষ্ঠা করা, দেশীয় পণ্যের ব্যবহার করা, গ্রামীণ সংগঠন তৈরি করা এসবের মধ্য দিয়ে প্রকৃত অর্থে নিজস্বতা তৈরি করতে চেয়েছিল। তৃতীয় ধরনে 'Ploitical Extremism' ঘরানার স্বদেশিরা উগ্র জাতীয়তাবাদী কর্মকান্ড, বয়কট এসবের মধ্য দিয়ে পূর্ণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। আর চতুর্থ ঘরানার স্বদেশিদের মধ্যে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ও অরাজকতা সৃষ্টি করে দ্রুত স্বাধীনতার উচ্চাভিলাষী আকাঙ্ক্ষা ছিল।

ঘরে-বাইরে উপন্যাসে নিখিলেশের মধ্যে 'Moderate' ও 'Constructive' স্বদেশিদের বৈশিষ্ট্য আর সন্দীপের মধ্যে 'Ploitical Extremism' ও 'Terrorism'-এর প্রভাব লক্ষ করা যায়। যা স্বদেশি আন্দোলনকেন্দ্রিক তাদের রাজনৈতিক দর্শনকে নির্দেশ করেছে। উপন্যাসে স্বদেশি আন্দোলনের প্রভাবে সন্দীপ ও তার শিষ্যরা শুকসায়রের হাট থেকে বিলাতি সুতা, র‍্যাপার প্রভৃতি একেবারে উঠিয়ে দিয়ে দেশি নুন, দেশি চিনি, দেশি কাপড়ধরার ঘোষণা দেয়। তাদের এই নির্দেশনা অমান্য করে বিলাতি কাপড় বিক্রির অপরাধে পঞ্চুকে একশত টাকা জরিমানা করা ও জুতা মারা হয়। (রবীন্দ্রনাথ, ২০১৬ : ৪৭২-৪৭৪/১০) তাদের এমন কর্মকান্ডে স্বদেশি আন্দোলনের একধরনের চিত্র উঠে এসেছে। পঞ্চুর বিলাতি কাপড় পুড়িয়ে দেওয়ার পর একমুঠো ছাই তুলে নিয়ে সন্দীপ বলে :

> ভাই-সব, বিলিতি ব্যাবসার, অন্ত্যেষ্টিসৎকারে তোমাদের গ্রামে এই প্রথম চিতার আগুন জ্বলল। এই ছাই পবিত্র, এই ছাই গায়ে মেখে ম্যান্‌চেস্টারের জাল কেটে ফেলে নাগা সন্ন্যাসী হয়ে তোমাদের সাধনা করতে বেরোতে হবে। (রবীন্দ্রনাথ, ২০১৬ : ৪৭৫/১০)

বলা যায়, স্বদেশি আন্দোলনের প্রভাবে উপনিবেশ-বিরোধী জাতীয়তাবাদ থেকে বিলাতি পণ্য বর্জনের ডাক দেওয়া হয়। (বরুণ, ২০১৫ : ৩৪) কিন্তু এদেশীয় বাজার তখন বিলাতি পণ্যের নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং অনেক নিম্নজীবী এসব পণ্য হাটবাজারে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। ফলে সন্দীপের বিলাতি কাপড় পুড়িয়ে দেয়াটা নিম্নজীবী শ্রেণির কাছে বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। বিলাতি পণ্যের তুলনায় দেশীয় পণ্যের মূল্য বেশি হওয়ায় নিম্নজীবীরা দেশি পণ্যের ভোক্তা হতে পারে না। আর যারা বিলাতি পণ্যের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী তারা ব্যবসা বন্ধ করে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। সন্দীপ নিম্নজীবীদের এই বিষয়টি আমলে নেয়নি। বিলাতি কাপড় পোড়ানোর বিষয়টিতে তার মধ্যে উগ্র-স্বদেশি ও সন্ত্রাসী মনোভাব লক্ষ করা যায়। এ প্রসঙ্গে সুমিত সরকার উল্লেখ করেন : 'Some extremist leaders and many of their followers later turned to terrorism…'(Sarkar, 1994 : 63)। এসব অত্যাচার বৈধ করতে সন্দীপ নিখিলেশকে উদ্দেশ্যে করে বলে : 'অত্যাচার তো তোমার নিজের জন্য নয়, দেশের জন্যে... ।'(রবীন্দ্রনাথ, ২০১৬ : ৪৭৮/১০) এখানে সন্দীপ তার ব্যক্তি মতকে দেশের নামে চালিয়ে দিয়ে একটা জাতীয়তাবাদী 'সেন্টিমেন্ট' তৈরি করতে চেয়েছে। যখন তা স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি তখন বলপ্রয়োগ করে উগ্র-জাতীয়তাবাদী রূপ ধারণ করেছে। সন্দীপের এই দেশভাবনার সঙ্গে নিখিলেশ সম্পূর্ণ বিরোধী মনোভাব পোষণ করে। নিখিলেশ বলে : 'দেশের জন্যে অত্যাচার করা দেশের উপরেই অত্যাচার করা... ।'(রবীন্দ্রনাথ, ২০১৬ : ৪৭৮/১০)এখানে সন্দীপ ও নিখিলেশের মধ্যে দেশ-বিষয়ক ভিন্ন বয়ান তৈরি হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, 'Patriotism is the loyalty of individuals toward the state to which they belong' (Salzbach, 1943:70-71)অর্থাৎ স্বদেশপ্রেম বিষয়টা স্বতন্ত্র অনুভূতি নিয়ে ব্যক্তির মধ্যে ক্রিয়া করে। ফলে সন্দীপ যখন দেশ উদ্ধারের কারণ উল্লেখ করে বিদেশি কাপড়, পণ্য বর্জনের ডাক দেয় তখন নিখিলেশ তার হাটের প্রজাদের দেশি কাপড় কেনার অসামর্থতা নিয়ে চিন্তা করে। এখানে ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে দুজনের ভাবনাতেই দেশ প্রাধান্য পেয়েছে। যা সন্দীপের মধ্যে দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণ ভাবনা নিয়ে হাজির হয়েছে।(সৌরেন্দ্রমোহন, ২০১৪ : ২০৩) আর নিখিলেশের মধ্যে প্রজাদের ভাবনা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। আবার বিমলার ভাবনায় দেশ আরেকরূপে উঠে এসেছে। বিমলা সন্দীপকে দেশ হিসেবে গ্রহণ করে তার উদ্দেশ্যে বলে : 'তুমি আমার ধর্ম, তুমি আমার স্বর্গ...বন্দেমাতরং।'(রবীন্দ্রনাথ, ২০১৬ : ৫০৩/১০) বিমলার আবেগসর্বস্ব কথাগুলোকে তার ব্যক্তিগত মত বলে মনে হতে পারে। কিন্তু শেষে যখন সে 'বন্দেমাতরং' উচ্চারণ করে তখন তা রাজনৈতিক রূপ পায়। ফলে এটা ব্যক্তিগত আবেগের মধ্যে না থেকে 'National sentiment'-এর রূপ লাভ করে।এ প্রসঙ্গে স্টারজুর মত হলো 'National sentiment is akin to patriotic exaltation and is likely to manifest itself at happy or unhappy moments in the life of the fatherland.' (Sturzo, 1946 : 4) অর্থাৎ জাতীয় আবেগ তখনই দেশপ্রেমের উচ্ছ্বাস তৈরি করে যখন জন্মভূমি আনন্দ বা

সংকটের মুখোমুখি হয়। আর এই 'National sentiment' ব্যবহার করে বঙ্গভঙ্গ থেকে সৃষ্ট স্বদেশি আন্দোলনকে ঘিরে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তৈরি হয়। এক্ষেত্রে যারা নবীন তাদের মধ্যে জঙ্গি জাতীয়তাবাদী মনোভাব গড়ে উঠেছিল। এতে স্বামী বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণের আদর্শ এবং মহারাষ্ট্রে গঙ্গাধর টিলকের নেতৃত্বে মুক্তি-আন্দোলনের অনুরূপ আদর্শ ও কর্মপন্থা প্রভাবক হিসেবে ক্রিয়া করে। (সৌরেন্দ্রমোহন, ২০১৪ : ১৮৭) উপন্যাসে অমূল্য কিংবা কলকাতার স্কুল কলেজে পড়ু য়া ছেলেরা এই নবীনপন্থী দলে ছিল। (রবীন্দ্রনাথ, ২০১৬ : ৪৭২/১০) ফলে অমূল্যের কোটের পকেটে পকেট-এডিশন গীতার পাশাপাশি ছোটো পিস্তলও থাকে। (রবীন্দ্রনাথ, ২০১৬ : ৫০১/১০) সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে একই সঙ্গে গীতা ও অস্ত্র রাখার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়। '১৯০২ খৃ. অরবিন্দ মেদিনীপুরে হেমচন্দ্র কানুনগোকে এক হাতে তরবারি ও অন্য হাতে গীতা দিয়ে দীক্ষা দিয়েছিলেন।' (অমর, ২০০৭ : ৫৩) এই অরবিন্দ ঘোষ চরমপন্থী দলের নেতা ছিলেন। যিনি হিংসাত্মক বিপ্লবে বিশ্বাস করতেন। (সৌরেন্দ্রমোহন, ২০১৪ : ২৬০) ফলে সন্দীপ ও তার দলের বন্দেমাতরং স্লোগান, বিদেশি পণ্য বর্জন, বিদেশি কাপড়ে আগুন দেওয়া, মহিষমর্দিনী পুজো, গোরক্ষা আন্দোলন, মুসলমান বিদ্বেষ এসব 'মূলতঃ হিন্দুধর্মের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে'। (সৌরেন্দ্রমোহন, ২০১৪ : ২৬৩) এখানে ধর্মকে 'Sentiment' তৈরির জন্য জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একটি অনুষঙ্গ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সময় সাধারণ মানুষকে আন্দোলনে শরিক করার জন্য অনেক সময় জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ ধর্মচেতনায় উস্কানি দিতেন। যা কখনো সাফল্য এনে দিলেও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করেছে। (গৌতম, ২০১৫ : ৭২) লক্ষণীয় যে, তৎকালীন রাজনীতিতে স্বাজাত্যবোধ সঞ্চারের জন্য হিন্দুপ্রধান নেতারা হিন্দু অতীতকে আদর্শ করেছিলেন। হিন্দুধর্মকে প্রাধান্য দিয়ে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের অবস্থা সৃষ্টি করা হয়। এ প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষ বলেন, '...জাতীয়তার ধারা হিন্দুত্বের পুনরুভ্যুত্থান-ধারার সঙ্গে বরাবরই মিশ্রিত ছিল, যেমন হিন্দুত্ব ছিল জাতীয়তার সঙ্গে।' (বিনয়, ২০০০ : ২৫০) হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদের উত্থানের পাশাপাশি চরমপন্থীদের ক্রমবর্ধমান আধিপত্য বিস্তারের ফলস্বরূপ দেশের মুসলমান সমাজকে স্বার্থান্বেষীমহল সহজে বিপথে নিয়ে যাবার সুযোগ পায়।(সৌরেন্দ্রমোহন, ২০১৪ : ২৬৩) এক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গীয় মুসলমান কৃষক সমাজে স্বদেশি নিয়ে এক ধরনের অবিশ্বাস জন্মে। ফলে 'স্বদেশী' প্রচারকের বক্তব্য পূর্ববঙ্গের মুসলমান চাষার আস্থা অর্জন করতে পারেনি।(রবীন্দ্রনাথ, ২০১৬ : ৫৬৪/১১) এমন প্রেক্ষাপটে লক্ষ করা যায় যে, পূর্ববঙ্গীয় মুসলমানেরাও নিজেদের মধ্যে সংঘটিত হতে থাকে। ফলস্বরূপ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা সংঘটিত হয়। যা *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসে উঠে এসেছে এভাবে :

> ঢাকা থেকে মৌলবি প্রচারকের আনাগোনা চলছে। আমাদের এলাকার মুসলমানেরা গোহত্যাকে প্রায় হিন্দুর মতোই ঘৃণা করত। কিন্তু দুই-এক জায়গায় গোরু জবাই দেখা দিল। ...ব্যাপারটার মূলে একটা কৃত্রিম জেদ আছে।'(রবীন্দ্রনাথ, ২০১৬ : ৫১৮/১০)

মুসলমানদের এই কৃত্রিম জেদের কারণ অনুসন্ধান করলে সমকালীন প্রেক্ষাপটে কয়েকটি বিষয় লক্ষ করা যায় :

ক. বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় সখারাম গণেশ দেউস্কর ‘শিবাজীর দীক্ষা’ নামে যে-পুস্তিকা রচনা করেন তাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘শিবাজী উৎসব’ (১৯০৪) কবিতাটি ভূমিকা হিসেবে লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিতার মূল বিষয় হিসেবে অখণ্ড ভারতের আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। কিন্তু ‘শিবাজী উৎসব’ কবিতাটি হিন্দুত্ববাদী ভারতের পরিচয় নির্মাণের নিমিত্তে ব্যবহৃত হতে থাকে। পরবর্তীকালে শিবাজী উৎসবের সঙ্গে ভবানী মূর্তি নির্মাণ করে পূজার আয়োজন করা হয়। জাতীয়তাবাদকে পৌরাণিক হিন্দুত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত করার বিষয়টিকে সমর্থন না করে অনুষ্ঠান বর্জন করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। (অমর, ২০০৭ : ৫১-৫২)

খ. হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা পৌরাণিক দেব-দেবী নির্ভর যে-হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদ প্রচার করেছিল তা মুসলমানদের মনে বিরূপ প্রভাব ফেলেছিল। (Ghosh, 1969 : 246) এ সময়ে সন্ত্রাসবাদী দলগুলোতে কালীমূর্তির সামনে শপথ নেওয়ার একটি নিয়ম ছিল। যেখানে মুসলমানদের প্রবেশাধিকার ছিল না। ফলে ইহা মুসলমানদের মনে সন্দেহ তৈরি করে। (বদরুদ্দীন, ২০১৮ : ৭৪)

গ. হিন্দু জমিদারগণ বলপ্রয়োগপূর্বক মুসলমান ব্যবসায়ী ও দোকানদারদের বয়কটে বাধ্য করেছিল, যা তাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। (Sarkar, 1994 : 449)

উল্লিখিত ঘটনাগুলোর কারণে স্বদেশি আন্দোলনের সময় হিন্দুত্ববাদী প্রেক্ষাপটের ফলে মুসলমান কৃষক সমাজের মধ্যে হিন্দুবিরোধী মনোভাব লক্ষ করা যায়। মুসলমান বর্গাদার ও চাষীরা হিন্দুদের জমি চাষ ও ফসল কর্তনে অস্বীকৃতি জানায়। সেসময়ে পাবনা, দিনাজপুর, বরিশাল, কুমিল্লা, যশোরে আরও কিছু ঘটনা ঘটে যা হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। (Sarkar, 1994 : 4; 445-447) তাছাড়া মুসলমানরা স্বদেশি আন্দোলনকারীদের রাখীবন্ধন, কালিঘাটে পূজা, বঙ্গভঙ্গের দিন গঙ্গাস্নান ইত্যাদিকে মেনে নিতে পারেনি। (মৃণালকান্তি, ২০০১ : ১৪) লক্ষ করা যায় যে, ১৯০৬-০৭ খ্রিস্টাব্দের দিকে নওয়াব সলিমুল্লার মোল্লা এজেন্টরা পূর্ববঙ্গের মফস্বলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে দিতে ভূমিকা পালন করে। (Sarkar, 1994 : 446) এমন পরিস্থিতি হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরস্পর বিদ্বেষী মনোভাব তৈরি করে। *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসেও মুসলমানের ক্ষেপে ওঠা, হরিশ কুণ্ডুর কাচারি লুঠ করা, মেয়েদের ওপর অত্যাচার করা প্রভৃতি ঘটনার মধ্য দিয়ে এমন পরিস্থিতি লক্ষ করা যায়। (রবীন্দ্রনাথ, ২০১৬ : ৫৪৮/১০) মুসলমানদের দ্বারা সংঘটিত এমন ঘটনার ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে দেখা যায়, ঢাকার নবাব সলিমুল্লার নেতৃত্বে মুসলমানদের মধ্যে একধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনৈতিক কর্মসূচি চলে।(Sarkar, 1994 : 399) যা মুসলমানদের মধ্যে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদী পরিচয় নির্মাণে কাজ করে। আর এই ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদী ভাবনা থেকেই মুসলমানরা নিখিলেশের ভাষায় ‘কৃত্রিম জেদ’ নিয়ে গরু জবাই করে। এমন জেদ, বিদ্বেষ, উস্কানি থেকে হিন্দু-মুসলমান ধর্মকেন্দ্রিক পরিচয় নির্মাণের যে-জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে নামে তা দাঙ্গার দিকে মোড় নেয়। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, স্বদেশি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে নতুন সংস্কৃতি চালু হয় তা হিন্দু জাতীয়তার দিকে ঝুঁকে পড়ে। (পার্থ, ২০১৩ : ৬৩)

ঘরে-বাইরে উপন্যাসে স্বদেশি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এই জাতীয়তাবাদী রাজনীতি নির্মাণের চিত্রকেই গুরুত্ববহ করে তুলেছেন ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। উপন্যাসে সাম্প্রদায়িকতা আর দাঙ্গাসৃষ্ট পরিস্থিতি যেমন উঠে এসেছে তেমনি এর বিপরীত অবস্থাও দেখানো হয়েছে। প্রজাদের প্রতি সন্দীপের উগ্র আচরণের কারণে নিখিলেশ তাকে এলাকা ছেড়ে যাবার নির্দেশ দিয়েছে। (রবীন্দ্রনাথ, ২০১৬ : ৫১৫/১০) এখানে নিখিলেশ 'আমার প্রজা' হিসেবে প্রজাদের পরিচয় নির্মাণ করেছে। হিন্দু প্রজা কিংবা মুসলমান প্রজা হিসেবে বিভাজন করে কোনো ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী পরিচয় নির্মাণ করেনি। স্বদেশি সন্দীপের উদ্দেশ্যে নিখিলেশের এই উক্তি প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। তিনি স্বদেশি আন্দোলন থেকে সরে আসেন। কারণ হিসেবে তিনি মনে করেন, বয়কট কর্মসূচি নিয়ে মুসলমানদের ওপর জোরাজুরি স্বদেশি আন্দোলনের পরিপন্থী। (পার্থ, ২০১৩ : ৬৫) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই মনোভাব থেকে নিখিলেশের স্বদেশি বিরোধী হয়ে ওঠার কারণ অনুধাবন করা যায়।

এখানে এটা স্পষ্ট যে, স্বদেশি আন্দোলনকে ঘিরে মুসলমান-বিরোধী ও উগ্র-জাতীয়তাবাদী যে-প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাতে সায় দেননি। তিনি মনে করতেন, জাতীয়তাবাদ মানুষকে মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন ও তার মনুষ্যত্বকে অবরুদ্ধ করে। তাঁর এই ভাবনার রূপটি রাজনৈতিক বয়ানের মধ্য দিয়ে *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসে উঠে এসেছে। ফলে বলা যায়, সন্দীপের 'পলিটিক্যাল এক্সট্রিমিস্ট' হওয়া আর নিখিলেশের 'এন্টি ন্যাশনালিস্ট' হওয়ার মধ্য দিয়ে স্বদেশি আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে।

সহায়কপঞ্জি

অমর দত্ত (২০০৭)। *উনিশ শতকের শেষার্ধে বাংলাদেশে হিন্দু জাতীয়তাবাদ*। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা।

আশীষ লাহিড়ী (২০১৯)। 'বন্দে মাতরম্ : দ্বন্দ্বদীর্ণ এক রণধ্বনি'। *দেশ* [সম্পাদক : সুমন সেনগুপ্ত], ১৭ জুন ২০১৯, কলকাতা।

এ. জি.নুরানি (২০১৯)। 'জাতীয়তাবাদ এবং তাকে কেন্দ্র করে ভারতে সাম্প্রতিক অসন্তোষ'। *প্রসঙ্গ জাতীয়তাবাদ*, [অনুবাদ : অসীম চট্টোপাধ্যায়], সেতু প্রকাশনী, কলকাতা। পৃ, ৬৮-১১৪

গৌতম নিয়োগী (২০১৫)। 'প্রসঙ্গ : সাম্প্রদায়িকতা ও ভারতের ইতিহাস'। *ইতিহাস চর্চা : জাতীয়তা ও সাম্প্রদায়িকতা* [সম্পা. গৌতম চট্টোপাধ্যায়], সেতু, কলকাতা। পৃ, ৫৬-৭৮

মৃণালকান্তি চট্টোপাধ্যায় (২০০১)। *জাতীয়তাবাদী জিন্না : চিন্তার ক্রমবিবর্তন*। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা।

ডি. ডি. (২০১৯)। 'ভূমিকা'। *প্রসঙ্গ জাতীয়তাবাদ*, [অনুবাদ : অসীম চট্টোপাধ্যায়], সেতু প্রকাশনী, কলকাতা।

নীহাররঞ্জন রায় (১৩৬৯ ব.)। *রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা*। নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা।

পার্থ চট্টোপাধ্যায় (২০১৩)। *জনপ্রতিনিধি*। অনুষ্টুপ, কলকাতা।

বদরুদ্দীন উমর (২০১৮)। *ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন*। কথাপ্রকাশ, ঢাকা।
বরুণ দে (২০১৫)। 'জাতীয়তাবাদ, ধনতন্ত্র, ঔপনিবেশিকতা'। *ইতিহাস চর্চা : জাতীয়তা ও সাম্প্রদায়িকতা*, (সম্পা. গৌতম চট্টোপাধ্যায়], সেতু, কলকাতা। পৃ, ১৪-৪৩
বিনয় ঘোষ (২০০০)। *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা (১৮০০-১৯০০)*। বুক ক্লাব, ঢাকা।
বিপান চন্দ্র (২০১১)। *আধুনিক ভারত ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ*। [অনুবাদ : কুনাল চট্টোপাধ্যায়], কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকতা।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০১৬ ক)। 'ঘরে-বাইরে'। *রবীন্দ্র-রচনাবলি* খণ্ড ১০ [সম্পা. সৈয়দ আকরম হোসেন], ঐতিহ্য,ঢাকা।
(২০১৬ খ)। 'ব্যাধি ও প্রতিকার'। *রবীন্দ্র-রচনাবলি* খণ্ড ১১ (সম্পা. সৈয়দ আকরম হোসেন), ঐতিহ্য, ঢাকা।
শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৬৫)। *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*। মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা।
সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় (২০১৪)। *বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা*। সুবর্ণরেখা, কলিকাতা।
সুমন সাজ্জাদ (২০১৬)। *আধুনিকতা ও আত্মপরিচয়*। চৈতন্য, সিলেট।
Benedict Anderson (2006), *Imagined Communities*, Verso, London.
Don Luigi Sturzo (1946), *Nationalism and Internationalism*, Roy Publishers, New York.
Ernest Gellner (1983), *Nations and Nationalism*, Cornell University Press, New York.
Sankar Ghosh (1969), *The Renaissance to Militant Nationalism in India*, Allied Publishers, Bombay.
Sumit Sarkar (1985), *A Critique of Colonial India*, Papyrus, India.
(1994), *The Swadeshi Movement in Bengal 1903-1908*, People's Publishing House, New Delhi.
Walter Salzbach (1943), *National Consciousness*, American Council on Public Affairs, Washington D.C.।

বিভাগ-পূর্ব বাংলা প্রবন্ধে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক

মোহাঃ তানভীর হায়দার*

সারসংক্ষেপ

শতাব্দী ধরে বাংলার দুই প্রধান ধর্ম সম্প্রদায় হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বসবাস করে আসছে। ধর্মীয় রীতি-নীতি, আচার-বিশ্বাসে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সুদীর্ঘকালের সহাবস্থান সংঘাতপূর্ণ ছিল না। কালের পরিক্রমায় মত-পার্থক্য বিরোধে রূপ নেয়, বিশেষ করে ইংরেজ আমলে তা চরম আকার ধারণ করে এবং বিচ্ছেদকে অনিবার্য করে তোলে। এর পিছনে ধর্মীয় চিন্তা-চেতনা ছাড়াও সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কারণকে শনাক্ত করা যায়। উভয় সম্প্রদায়ের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন লেখক-বুদ্ধিজীবী বিরোধ-নিরসনের আন্তরিক চেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হন। সাম্প্রদায়িক সংঘাত সংঘর্ষের জন্ম দেয়; যার ফলে ভারত বিভাগ অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়। যদিও এ দুইয়ের মিলন ব্যতীত ভারতের উন্নতির সম্ভাবনা নেই বলেও অনেকেই সোচ্চার হয়েছিলেন এবং মিলন-কামনা করেছিলেন; কিন্তু তাদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবেশিত হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রাবন্ধিকদের দৃষ্টিকোণ থেকে দুই সম্প্রদায়ের সম্পর্কের স্বরূপ অন্বেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

হিন্দু অধ্যুষিত ভারতে মুসলমানের আগমন ও ক্ষমতা-গ্রহণ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের বীজ উপ্ত করে। কারণ বহিরাগত মুসলমানের শাসনে বাস করাকে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা সহজভাবে গ্রহণ করেনি; তাছাড়া বিপুল সংখ্যক হিন্দুর ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়াও নিজেদের জন্য বেদনার ছিল। তাই ধারণা করা অযৌক্তিক নয় যে, শুরু থেকেই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে অনৈক্যের সূচনা হয়েছিল। তবে এই অনৈক্য দুই সম্প্রদায়ের সহাবস্থানকে শুরু থেকেই বিড়ম্বিত করে তোলেনি। ধর্মীয় রীতি-নীতি ও কিছু সামাজিকতার মধ্যে তাদের মত-পার্থক্য সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তী সময়ে এই মত-পার্থক্য বিরোধের আকার ধারণ করে এবং ইংরেজ ক্ষমতা অধিকার করে এই বিরোধকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করে চূড়ান্ত রূপ দান করে। যার অনিবার্য পরিণতি হিসেবে ভারত বিভক্ত হয়ে দুটি ধর্মীয় রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

শক্তির দ্বন্দ্বে পরাভূত হয়ে হিন্দুগণ মুসলমানের নিকট বশ্যতা স্বীকার করেছিল, কিন্তু উভয়ের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত জাগরুক ছিল। তাছাড়া রাজনৈতিক ক্ষমতার এই দ্বন্দ্বে সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনও কলুষিত হয়েছে। মুসলমান শাসকের দ্বারা হিন্দুর মন্দির লুণ্ঠন ও ধ্বংস ছাড়াও কোথাও কোথাও মন্দির ভেঙে মসজিদ নির্মাণ; আলাউদ্দীনের পদ্মিনীকে লাভের চেষ্টায় হিন্দুর পারিবারিক জীবনে হস্তক্ষেপ, হিন্দুর মনে ক্ষোভ ও প্রতিহিংসার জন্ম দিয়েছিল।[১] ফলে মুসলমান সম্পর্কে হিন্দুর মনে বিরূপতার জন্ম হয়েছিল।

---

* ড. মোহাঃ তানভীর হায়দার : সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনা

মধ্যযুগেও হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ ছিল। ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা, আচার–অনুষ্ঠান, খাবার-দাবারের যে পার্থক্য বা মতভেদ তা থেকে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। আর এই মনোমালিন্য বিশেষ করে ধর্মীয় সংঘাতের সূচনা করে। যে কারণে এই সংঘাত প্রশমনের জন্য মধ্যযুগে উভয় সম্প্রদায়ের অনেকেই ধর্ম সমন্বয়ের প্রচেষ্টা করেছেন। বাদশাহ আকবর, কবীর, নানক, দাদু, রজব, চৈতন্যদেব, লালন প্রমুখ এই ধর্ম সমন্বয়ের সাধক। এই পটভূমিতে বাংলার হিন্দু-মুসলমান ব্রিটিশ আমলে পদার্পণ করে।[২]

ব্রিটিশ শাসনাধীন নানা কারণে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিরাট ব্যবধান সূচিত হয়; এর সঙ্গে স্বার্থবোধ যুক্ত হয়ে দুই সম্প্রদায় পরস্পরের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। বিভিন্ন দিক দিয়ে অগ্রসর হিন্দু সমাজের দ্বারা অনগ্রসর মুসলমান সমাজ আক্রান্ত হতে থাকে। এসময় হিন্দু লেখক রচিত সাহিত্যে মুসলমান চরিত্রে কালিমা লেপনের প্রয়াস লক্ষ করা যায়; যা বিরোধকে উস্কে দিতে ভূমিকা রাখে। হিন্দুর এই মনোভাবের প্রতিবাদ মুসলমানদের পক্ষ হতে করা হয়েছিল; এমনকি বিপরীত ভাবের কাব্য, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি রচনার মাধ্যমে প্রতি-আক্রমণের ঘটনাও ঘটেছিল। কেনচিৎ মর্ম্মাহতেন হিতকামিনা ছদ্মনামে *নবনূর* পত্রিকায় প্রকাশিত "মুসলমানের প্রতি হিন্দু লেখকের অত্যাচার" প্রবন্ধে লেখক এ বিষয়টি তুলে ধরেছেন :

> সাহিত্য-রথী সুধীপ্রবর বঙ্কিম বাবু হইতে আরম্ভ করিয়া অতি নগন্য পুঁটিরাম পর্য্যন্ত মুসলমান-সমাজের অযথা নিন্দাবাদ করিয়া জগতের চক্ষে তৎসমাজকে চিরকলঙ্কিত করিয়া রাখিবার প্রয়াসী হইয়াছেন এবং হইতেছেন, ইহা কি ভাল কথা? বিলাতী সভ্যতার ফলে ইতিহাসচর্চ্চার বিবৃদ্ধিতে ভারতের মোসলেম-ললাটে কত অপরিমেয় কলঙ্ককালিমা বিলেপিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করিবার ক্ষমতা ত মাদৃশ ক্ষুদ্র লোকের নাই।[৩]

হিন্দু লেখকরা সাহিত্যে মুসলমান চরিত্রকে যে হীনভাবে চিত্রিত করেছেন, মুসলমান লেখকদের এ অভিযোগ অনেক হিন্দু লেখকও স্বীকার করেছেন এবং এ বিরোধ নিষ্পত্তির প্রচেষ্টাও গ্রহণ করেছেন। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, রামপ্রাণ গুপ্ত, নির্মলচন্দ্র ঘোষ, জীবেন্দ্রকুমার দত্ত প্রমুখের লেখায় এ প্রয়াস লক্ষ করা যায়।[৪]

যে কয়টি বিষয় নিয়ে হিন্দু-মুসলমানে সংঘর্ষ প্রকট আকার ধারণ করে তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো গো-হত্যা ও বাজনা বাজানো। হিন্দু সম্প্রদায় গরুকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে আর মুসলমান ধর্মীয় আদেশ অনুযায়ী গরু কোরবানি দেয়; জবাই করে মাংস খায়। পরস্পরবিরোধী এই ধর্মাচার দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক রক্তক্ষরণের জন্ম দেয়। দাঙ্গা-হাঙ্গামা, খুন-যখম, মামলা-মোকদ্দমা কোনো কিছুই বাদ যায় না। সমগ্র ভারতে এই সমস্যা ছড়িয়ে পড়ে। এর পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দুদের পক্ষ থেকে গো-হত্যা নিবারণী সভা-সমিতি স্থাপিত হয়ে গো-রক্ষা আন্দোলনের সূচনা করে এবং বিভিন্নভাবে গো-হত্যা বন্ধের উদ্যোগ নেওয়া হয়। অন্যদিকে মুসলমানদের পক্ষ থেকে এর প্রতিবাদ জানানো হয়। শুরু হয় বাক-বিতণ্ডা, সংঘাত-সংঘর্ষ। সামাজিক এই সমস্যা নিরসনের জন্য শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মুসলমানও গো-হত্যা বন্ধে উদ্যোগ নেন; যদিও বেশিরভাগ মুসলমান এর বিপক্ষেই অবস্থান নিয়েছিলেন ফলে কোনো সুফল

ফলেনি। এই শুভবুদ্ধির ফসল মীর মশাররফ হোসেনের (১৮৪৭-১৯১১) "গোকুল নির্মূল আশঙ্কা" প্রবন্ধটি (*আহমদী*, ১ শ্রাবণ ১২৯৫)। হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রবন্ধটিতে লেখক গো-হত্যা বন্ধে মুসলমানদের অনুরোধ জানান। ১২৯৫ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যার *আখবারে এসলামীয়া* পত্রিকায় মুসলমানদের পক্ষ থেকে এর প্রতিবাদ জানানো হয়। একে একে মশাররফের আরো তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশ পায় "গো ধন কি সামান্য ধন" (শ্রাবণ ১২৯৫), "গো-মাংস" ও "গো-দুগ্ধ"। এই প্রবন্ধগুলো নিয়ে মুসলমান সমাজে প্রবল বিক্ষোভ উপস্থিত হয়। সভা ডেকে লেখককে কাফের, স্ত্রী হারাম ফতোয়া দেওয়া হয়।

মসজিদের সামনে বাজনা বাজানো নিয়ে সিরাজউল ইসলাম তাঁর "মিলনের একদিক" প্রবন্ধে আলোকপাত করেছেন। এ বিষয়টি নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়ার কিছু আছে বলে তিনি মনে করেননি। তাঁর ভাষায়, 'মসজিদের সামনে বাজনা বাজালে মুসলমান ধর্মের যে কী ক্ষতি হয় কিংবা মসজিদের সামনে বাজনা বন্ধ করলে হিন্দু ধর্মের যে কী ক্ষতি হয়, তা আমার ক্ষুদ্র মাথায় কেন, বর্তমান জগতের বড়ো বড়ো মনীষীদিগের মাথায়ও খেলে না।'[৫] বোঝা যায় মিলনভাব বজায় রাখতেই তিনি সহনশীলতার কথা বলেছেন। মানুষের সঙ্গে মানুষের সদ্ভাব বজায় রাখাকেই তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করেন ধর্মগ্রন্থও মানুষকে সম্প্রীতির আহ্বান জানিয়েছে, বিভেদের নয়। তাই তিনি বলেছেন, 'এই সমস্ত হিন্দু মুসলমান শুধু ধর্মেরই কীট–"মানুষ" নয়। আমি হিন্দু মুসলমান কলহের পাণ্ডাদের জিজ্ঞাসা করতে চাই, মানুষ মারা ধর্মটা তারা কোন কেতাব থেকে শিখেছে–হিন্দুর পুরাণ থেকে, না মুসলমানের কোরান থেকে।'[৬]

শ্রী মন্মথনাথ সরকার "মিলন-সমস্যা" প্রবন্ধে হিন্দু-মুসলমানের রেষারেষির কারণ খুঁজতে গিয়ে গো-কোরবানি ও মন্দিরের সামনে গান-বাজনা এই দুটি জিনিসের উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি অনেক পুরনো এবং 'ইংরেজ আমলে এই গো-কোরবানী নিয়ে অনেকবার ভারতভূমি নর-রক্তে রঞ্জিত হয়েছে।' আর গান বাজনার হট্টোগোলের মধ্যে ঈশ্বর কীভাবে ধরা দেন তা প্রাবন্ধিকের বোধগম্য নয়। বরং নির্জনে ধ্যান করে অনেকের ঈশ্বর দর্শন হয়েছে বলে তিনি শুনেছেন। হিন্দুরা যে কেন গরুকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে তার যৌক্তিকতাও প্রাবন্ধিকের চোখে পড়েনি। পূজাকারীদের পক্ষ থেকে গরুকে উপকারী জন্তু হিসেবে আখ্যা দিয়ে বলা হয়, গরু কৃষি কাজের প্রধান বাহন এবং গরু থেকে প্রাপ্ত দুধ মানুষের জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করে বলে একে হত্যা করা মহাপাপ। লেখক যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছেন, কলকারখানা আর ইঞ্জিনশক্তির দাপটে গরুর প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে, অর্থাৎ গরুর কাজ যন্ত্রই করে দেবে; আর জীবনীশক্তি বৃদ্ধি অন্য খাবার দিয়েও পূরণ করা সম্ভব। প্রাবন্ধিক প্রশ্ন তুলেছেন, হিন্দুরা গরুকে পূজা করে অথচ উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে বঙ্গদেশে যে গো-কুল নির্মূল হতে চলেছে, হিন্দু জমিদারগণের জমিদারীতে গোচারণভূমি নেই, এসব বিষয়ে তো তাদের সরব হতে দেখা যায় না। মুসলমানদের গরু কোরবানিতে তাদের এত আপত্তি, যদিও

মুসলমানরা কর্মক্ষম নয় বরং দুর্বল গরুই কোরবানি করে থাকে, অথচ কলকাতার Slaughter house-এ যে সতেজ ও সুপুষ্ট গরু কাটা হয় হিন্দু কখনো তো তা বন্ধের চেষ্টা করে না। এ সব দেখে মুসলমানের সঙ্গে হিন্দুর যে দ্বন্দ্ব তা ইচ্ছাকৃত বলে প্রাবন্ধিকের মনে হয়েছে, নিতান্ত বিরোধ করতে হবে বলে করা।[৭]

'১৯০০ সালের পূর্বে বাংলায় প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্প্রদায়িক মানসিকতা তুলনামূলকভাবে জনগোষ্ঠীর ক্ষুদ্র অংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।'[৮] বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিরূপতা বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর হয় ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে। হিন্দুদের পক্ষ থেকে বঙ্গভঙ্গের তীব্র বিরোধিতা করা হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান এতে আপত্তি করেনি বরং খুশিই হয়েছিল এ কারণে যে, এটাকে তারা নিজেদের প্রতি ইংরেজ সরকারের সুনজরের পরিচয় বলেই মনে করেছিল। কারণ ১৮৬০ সালের পর থেকে শাসক শ্রেণির সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করে আসছিলেন বাংলাদেশে নবাব আবদুল লতিফ আর সারা ভারতে স্যার সৈয়দ আহমদ। এ কারণে অনেকের মনেই এ ধারণা জন্ম নিয়েছিল যে ১৮৭০ সালের পর থেকে ইংরেজ সরকার মুসলমানদের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন শুরু করে; যদিও তার যথেষ্ট প্রমাণাভাব।[৯]

বঙ্গভঙ্গকে মুসলমানদের প্রতি ইংরেজদের সুনজর বিবেচনা করে হিন্দুরা মুসলমানদের প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে। আবার ১৮৭০ সালের পর থেকে হিন্দু পুনর্জাগরণের ভাবধারাটা প্রবল হয়ে উঠলে মুসলমানরা ধীরে ধীরে স্বাতন্ত্র্যবাদী হয়ে উঠতে বাধ্য হয়। কারণ এ সময় বাঙলার মুসলমান সমাজ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আত্মসচেতন হয়ে উঠছিল, তাই তার সামনে যে পথটি খোলা ছিল সেটি মুসলিম জাগরণের। কেননা শিক্ষিত মুসলমান নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য স্বতন্ত্রভাবে চিন্তাভাবনা করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে।[১০] এই সময়ের হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক নিয়ে আনিসুজ্জামান (১৯৩৭-২০২০) লিখেছেন :

> হিন্দু-মুসলমানের অর্থনৈতিক বৈষম্যের ভূমিকা এক্ষেত্রে অনেক বড়। বঙ্গভঙ্গের ফলে অনগ্রসর মুসলমানদের অনেক সুবিধে হবে, একথাও সরকারি মহল থেকে ঘোষিত হয়েছিল। অতএব, এটা খুব স্বাভাবিক যে, বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে যে-আবর্তের সৃষ্টি হল, তাতে অধিকাংশ মুসলমান আর অধিকাংশ হিন্দু পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারার পরিচয় দিলেন। ফলে, বঙ্গভঙ্গের সংকটময় মুহূর্তে বাঙালি হিন্দু-মানস কেবল-যে ইংরেজবিদ্বেষী হল, তা নয়, মুসলমানের প্রতিও তার বিরূপতা জাগল। মুসলমানও হিন্দুকে আরো বেশি সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলেন।[১১]

চিন্তাশীল প্রবন্ধকাররা হিন্দু-মুসলমান বিরোধের মূল কারণ নির্ণয়ের মাধ্যমে উভয় সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্প্রীতি-সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছেন। তবে সকলের অনুসন্ধান এক সূত্রে গ্রথিত হয়নি। বিভিন্ন জন বিভিন্ন দিক থেকে এই বিরোধের কারণ নির্ণয়ের প্রয়াস পেয়েছেন। তবে সকলের বক্তব্য একই বিন্দুতে স্থান না নিলেও প্রাবন্ধিকদের আলোচনা থেকে হিন্দু-মুসলমান বিরোধের স্বরূপ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। সৈয়দ আবদুল নবী "হিন্দু-মোসলেম গোড়ার কথা" প্রবন্ধে (*মোহাম্মদী*, ১৩শ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৪৭) দুই সম্প্রদায়ের বিরোধের উৎস অনুসন্ধান করেছেন। তিনি মুসলমানদের

আগমন ও ভারতে বসতিলাভের সময়ে হিন্দু-মানসের সংকীর্ণতার কথা তুলে ধরে বলেছেন :

> যে যুগে মুসলমানগণ ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখনকার ভারতবাসী হিন্দুগণ অত্যন্ত গোঁড়া ছিলেন। ...বিদেশী মাত্রকেই তাহারা অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ঐতিহাসিক আলবেরুনী ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 'ম্লেচ্ছ' বা 'যবন' শব্দের ব্যবহার এই যুগেই আরম্ভ হয়। হিন্দুরা যখন দেখিল যে মুসলমানগণ এদেশে আসিয়া রহিয়া গেলেন, পূর্বতন আক্রমণকারীদের মত ফিরিয়া গেলেন না, তখন এই আগন্তুকদের প্রতি স্থায়ী ভারতবাসী হিন্দুগণের আর সহানুভূতি রহিল না। কিন্তু যখন দেখা গেল যে হিন্দু সমাজের অনেক লোক মুসলমান হইয়া যাইতেছে, তখন বর্ণ হিন্দুরা মুসলমানগণকে সম্পূর্ণরূপে হিংসা করিতে লাগিলেন কেননা এই মুসলমানদের আগমনের ফলেই তাহাদের দলে ভাঙ্গন ধরিল এবং বিশেষতঃ তাহাদের সেবকশ্রেণীর সংখ্যা হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিল। হিন্দু-মোসলেম সমস্যার গোড়ার গলদ প্রায় হাজার বৎসর আগে এইরূপেই আরম্ভ হয়।[১২]

কোহিনুর পত্রিকার ২য় কল্প, ৭ম বর্ষ, ১০ম ও ১১শ সংখ্যা, মাঘ এবং ফাল্গুন ১৩১৩ সংখ্যায় প্রকাশিত "হিন্দু মুসলমানের বিরোধের কারণ ও তন্নিবারণের উপায়" প্রবন্ধে ও. আলী এই দুই সম্প্রদায়ের বিরোধের মূল কারণ হিসেবে ইংরেজের চাতুর্যকে চিহ্নিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি বলেছেন–'... হিন্দু ও মুসলমান দুই প্রধান জাতিকে শাসনাধীনে রাখিবার নিমিত্ত ইংরাজকে ভেদনীতির অনুসরণ করিতে হইল। Divide and ruleএই রাজনীতি মূলমন্ত্র জ্ঞান করিয়া ইংরাজ দেশ শাসন করিতে লাগিল। ইহার ফলে ইংরাজগণ হিন্দুর মনে মুসলমান বিদ্বেষানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া তুলিল।'[১৩]

"হিন্দু-মুসলমান" প্রবন্ধে (*মোহাম্মদী*, ৪র্থ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৩৮) শ্রী অক্ষয়কুমার নন্দী বাংলার হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছেন। আপন আপন ধর্ম রক্ষা করতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করে হিন্দু-মুসলমান প্রকৃতপক্ষে মানবধর্মের গৌরব নষ্ট করছেন বলে তিনি অভিমত দিয়েছেন। একে তিনি গুণ্ডাদের কাজ বলে মনে করেন এবং এই অপরাধ হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই। তিনি বলেন :

> আজ জিজ্ঞাসার দিন আসিয়াছে–হিন্দু ভ্রাতা ভগিনীগণ, আপনারা কি মুসলমান ভ্রাতাদিগকে এ পর্যন্ত অবজ্ঞার চোক্ষে দেখেন নাই? মুসলমান ভ্রাতা ভগিনীগণ, আপনারাও কি হিন্দুদিগকে ভালবাসিতে পারিয়াছেন? হিন্দু মুসলমানকে ঘৃণা করেন, মুসলমান ধর্মের দিক দিয়া নহে, তাঁহাদের বাহ্যিক আচরণের দিক দিয়া। উভয়ের ধর্ম ও সমাজ নীতির মধ্যকার মিলনের দিকগুলি বাদ দিয়া আমরা বিরোধগুলি প্রবল করিয়া তুলিতেছি।[১৪]

জগতের স্রষ্টাকে উপাসনা, মানুষ মাত্রকেই ভ্রাতৃজ্ঞান করা, আহার-বিহার কোনো কিছুতে কাউকে পরিত্যাগ না করা এগুলোকে প্রাবন্ধিক জগতের সর্বজনীন ধর্ম বলে মনে করেন। অথচ এই সত্য আজ মানুষ বিস্মৃত হয়েছে। তিনি উপলব্ধি করেছেন, যখন ভারতের হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সকলকে এক সঙ্গে বাস করতেই হবে তখন বিরোধ না করে সদ্ভাবে চলাই কর্তব্য। তাতে ভারতভূমিরও গৌরব বাড়ে। এই সদ্ভাবের অভাবকে তিনি ভারতের হীনবলের কারণ মনে করেন; তার উপর ইংরেজ শাসন এই দুর্বলতাকে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে।[১৫]

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪) হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে "সাম্প্রদায়িক মিলন" প্রবন্ধে বলেছেন, 'আমার মনে হয়, ইহার প্রধানতম কারণ, ধর্ম্মসম্পর্কিত (কিন্তু বস্তুতঃ ধর্ম্মবহির্ভূত) অন্ধতা ও তজ্জনিত অনুদারতা।'[১৬] এজন্য দেখা যায় হিন্দু তার হিন্দুত্ব রক্ষার্থে অহিন্দুকে ম্লেচ্ছভাবে, এবং তার ছায়া মাড়ালে আবার তাকে গোসল করে শুদ্ধ হতে হয়। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর কাছে এ-বিষয়টিকে সম্পূর্ণ অনাত্মীয়রূপে বর্জনের মতো মনে হয়েছে। আবার তিনি মুসলমানদের দোষারোপ করে বলেছেন, ইসলামের উদার পরিমণ্ডলের মধ্যে থেকেও এক শ্রেণির ধর্মান্ধ মৌল্লা-মৌলবির সংকীর্ণ মতবাদ প্রচারের ফলে মুসলমানদের মধ্যেও হিন্দুদের সম্বন্ধে খারাপ ধারণা প্রসার লাভ করেছে। বস্তুত, তিনি হিন্দু-মুসলমান বিরোধের ক্ষেত্রে উভয় সম্প্রদায়ের দোষই স্বীকার করেছেন। তবে এ ব্যাপারে তিনি হিন্দুদেরই বেশি দোষারোপ করেছেন।[১৭] হিন্দুদের প্রতি এই অতিরিক্ত দায়ভারের কারণ হিসেবে বর্ণাশ্রম ভিত্তিক হিন্দু ধর্মের অন্তর্নিহিত সংকীর্ণতা এবং অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বিষয়ে মুসলমানের চেয়ে হিন্দুর শ্রেষ্ঠত্বকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, মুসলমানের সংকীর্ণতাকে সহজেই দূর করা যেতে পারে, কারণ ইসলামে মানুষকে মানুষ হিসেবেই মূল্যায়ন করা হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু ধর্ম যেখানে তার ধর্মের মানুষকেই ঘৃণা করতে শিখিয়েছে সেখানে অন্য ধর্মের কথা বলাই বাহুল্য।[১৮]

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী মনে করেন, এ-বিরোধ নিরসনের ভিত্তি হওয়া উচিত উদারতা ও সহিষ্ণুতা। একথা সত্য যে, প্রত্যেক ধর্মমতই স্বাধীন; তাই সকল সম্প্রদায়ের লোককে এই স্বাধীনতার অর্থ পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য তিনি তাগিদ দিয়েছেন। মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সকল ধর্মেরই কিছু আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে বিরোধিতা রয়ে গেছে। এক্ষেত্রে কারও ক্ষুব্ধ না হওয়াই উচিত।[১৯] তবে সব কিছু সত্ত্বেও মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর কাছে হিন্দু-মুসলমানের মিলন অসম্ভব মনে হয়েছে। কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন, এ পর্যন্ত অনেকেই মিলনের ডাক দিয়েছেন কিন্তু তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি; শুধু হিন্দু বা মুসলমানকে নিজ ধর্ম বিসর্জন দিয়ে এক ধর্মের অনুসারী হলেই তা হতে পারে, যা আদৌ সম্ভব নয়।

হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্বের মূলে কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১) ধর্মীয় শিক্ষা-প্রণালীকে শনাক্ত করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন ধর্মীয় চেতনার দিক থেকে বাল্যকাল হতে সাধারণ মুসলমান এই শিক্ষা পেয়ে থাকে যে, একমাত্র তারাই বেহেশতে প্রবেশ করার অধিকারী। অন্যদিকে হিন্দুরা বিধর্মী কাফের। তারা কখনো বেহেশত পেতে পারে না বরং দোজখের আগুনই তাদের উপযুক্ত শাস্তি। তাই যথা সম্ভব তাদের সংসর্গ ত্যাগ করতে হবে, আর তা যদি সম্ভব না হয় অগত্যা তাদের সঙ্গে লেনদেন করতে হবে; কিন্তু যদি বন্ধুত্ব করা হয় তবে পরকালে তাদের সঙ্গে নরকবাসের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এই ধরনের অপ্রীতিকর শিক্ষা যে কেবল মুসলমান সমাজে প্রচলিত তা নয়।

হিন্দু বালকও বাল্যকালে মুসলমানকে গো-খাদক, বিদেশি অনুপ্রবেশকারী হিসাবে শিক্ষা পেয়ে থাকে। শুধু এখানেই শেষ নয় তারা মুসলমানকে অভিযুক্ত করে ভারতভূমি কলঙ্ককারী হিসেবে। মুসলমানরা এসে তাদের দেব-দেবীর অসম্মান করেছে, তাদের নারীদের মর্যাদা নষ্ট করেছে এবং বলপূর্বক হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করে ছেড়েছে। তাই মুসলমানদের দেশ থেকে বিতাড়িত করাটা কর্তব্য, না পারলে অন্তত শত্রুভাব পোষণের মধ্যেও কতকটা আর্যগৌরব রক্ষিত থাকে।[২০] কাজেই সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, বাল্যে ধর্মশিক্ষার মধ্যেই এই বিরোধের বীজ লুকিয়ে আছে।

কাজী মোতাহার হোসেনের মতে, হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত উন্নতির উপরই নির্ভর করছে বাংলার উন্নতি। তাই তিনি শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমানের কর্তব্য স্থির করেছেন–তাদের উচিত উভয় সম্প্রদায়ের সামাজিক ও ধর্ম সংক্রান্ত ছোট ছোট ভেদাভেদ অগ্রাহ্য করে মূল সূত্র ধরে মানবতার ক্ষেত্রে মিলন সম্ভবপর করে তোলা। তাছাড়া বিদ্যালয়ের পড়াশোনার পরিবেশের ক্ষেত্রে তিনি প্রস্তাব রেখেছেন, হিন্দু ও মুসলমানের জন্য আলাদা আলাদা বিদ্যালয় না করে একসঙ্গে পাঠদানের ব্যবস্থা করার। এক্ষেত্রে ধর্মীয় শিক্ষাদানের ব্যাপারে প্রশ্ন ওঠে। কাজী মোতাহার হোসেন মনে করেন, ধর্মের অনুষ্ঠান অংশ বাদ দিয়ে তার ইতিহাস ও আদর্শগত অংশ উভয় সম্প্রদায়ের ছাত্রদের পাঠ্যতালিকায় থাকা উচিত। এতে করে একে অপরের কালচার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবে। তিনি শিক্ষা-নীতিজ্ঞদের এভাবে পাঠ্য নির্দেশ করতে আহ্বান জানিয়েছেন।[২১] তাঁর মতে–'হিন্দু-মুসলমানের ভিতর প্রকৃত স্থায়ী মনের মিল তখনই হইবে, যখন পরস্পরের প্রতি অর্থ-নৈতিক এবং অন্যান্য ব্যাপারে পূর্ণ বিশ্বাসের সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে এবং যখন পরস্পরের বন্ধুত্বে ইহারা গৌরব বোধ করিতে পারিবে।'[২২]

হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরাজমান সংকটের মূল সূত্র তুলে ধরেছেন কাজী মোতাহার হোসেন। তিনি হিন্দু-মুসলমানের মিলনের ব্যাপারে খুব বেশি আশাবাদী হতে পারেননি। এ ব্যাপারে সদিচ্ছার বড়ই অভাব লক্ষ করেছেন। তিনি দেখেছেন, মানুষের সঙ্গে মানুষের ভ্রাতৃত্ববোধ ইসলামের আদর্শ হলেও অল্প কয়েকজন খ্যাতনামা দার্শনিক, সাধক ও মুর্শিদি-সঙ্গীত রচয়িতা ছাড়া অন্য কোনো মুসলমান হিন্দুর সঙ্গে মানবতার প্রশস্ত ক্ষেত্রে মিলিত হতে চেয়েছেন বা তার আবশ্যকতা অনুভব করেছেন, সাহিত্যে তার প্রমাণের যথেষ্ট অভাব রয়েছে।[২৩]

আবুল হুসেন (১৮৯৭-১৯৩৮) একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্বের কারণ অনুসন্ধানের প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি দেখেছেন উভয় সম্প্রদায় অতীতের মোহে মোহাবিষ্ট। হিন্দু স্বপ্ন দেখছে দুহাজার বছর আগের আর্য শক্তির, আর মুসলমান ক্ষুব্ধ হচ্ছে আরবি সাম্রাজ্যের কথা ভেবে। অর্থাৎ কেউই বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে পরস্পরকে দেখছে না। হিন্দুর বক্তব্য ভারত হিন্দুর আর মুসলমান এখানে বিদেশী। অন্যদিকে মুসলমানও তার আপন অস্তিত্বে কঠোর–মুসলমান হিসেবেই তারা ভারতে

থাকবে যদি হিন্দু তাদের ধর্মনিষ্ঠতা বিলোপ করতে চায় তাহলে তাদের সঙ্গে কোনো সন্ধি নয়।[২৪] অর্থাৎ উভয় সম্প্রদায়ের এই মনোভাবের উৎস অতীতের মোহ। অতীত গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বর্তমানের সম্ভাবনার সকল দিককে বিচূর্ণ করে ফেলছে।
আবুল হুসেন এই অতীতের মোহের কারণ অনুসন্ধান করেছেন। তিনি দেখেছেন, ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধাক্কায় এবং প্রাচীন হিন্দু সভ্যতা সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের আলোচনার ফলে হিন্দু সমাজে প্রাচীনের প্রতি মোহ আরো গাঢ় হয়ে উঠল। তখন হিন্দু পণ্ডিতগণ এই সত্য প্রমাণের চেষ্টা করতে লাগল যে 'অতীত কালে হিন্দু-ভারতে বর্তমানের সমস্ত সৃষ্টিরই রূপ বিদ্যমান ছিল'। এবং এই মোহ আস্তে আস্তে গোটা ভারতে সংক্রমিত হতে শুরু করল। এর ফল হলো এই যে, তারা ভারতে অহিন্দুর স্থান দিতে কুণ্ঠিত হলো। তারা রব তুলল ভারত শুদ্ধি কর, ভারত কেবল হিন্দুর তাই এখানে অহিন্দুর কোনো ঠাঁই নেই। যারা বাইরে থেকে এসেছে তারা হিন্দুর স্বাধীনতা হরণ করেছে, তারা হিন্দুর শত্রু। আবুল হুসেন বলেছেন, সেই জন্য আজ সত্যাগ্রহীর এত আমদানি। হিন্দুর এই মনোভাবের ফলে মুসলমান খুব স্বাভাবিকভাবেই বেকায়দা অবস্থায় পড়ে যায় এবং এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য তারা অন্য বন্ধুর সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। মুসলমানের আরব, ইরান, তুরান, আফগানিস্তানের দিকে তাকানোর এই হলো কারণ। এজন্য প্রাবন্ধিক হিন্দুকে দোষারোপ করেছেন, কিন্তু তাই বলে তিনি মুসলমানদের একবারে নির্দোষও ভাবেননি। বলেছেন, মুসলমানেরও উচিত ছিল আপন সাধনার দ্বারা হিন্দুকে ভারতের বর্তমান অবস্থার দিকে ফেরানো। মুসলমানের মনের কোণে যে বেদনা জমেছে হিন্দুর কথা, ব্যবহার, ভাষার ভিতর দিয়ে, তার প্রতি হিন্দুর মনোযোগ আকর্ষণ করতে। আবুল হুসেন মনে করেন এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করলে নব ভারতের মঙ্গল পথ সূচিত হতে পারে।[২৫]
হিন্দু-মুসলমানের সংকট সমাধানে আবুল হুসেন নানাভাবে বিষয়টিকে পর্যালোচনা করছেন। তিনি লক্ষ করেছেন, উভয় সম্প্রদায়ই অতীতের সম্মোহনে মোহাবিষ্ট থাকার ফলে তাদের মিলনের চেষ্টা ফলপ্রসূ হতে পারছে না। এজন্য তিনি বলেছেন– 'প্রকৃতপক্ষে, হিন্দুকে তার প্রাচীনের মোহ ও সংস্কার ত্যাগ করতে হবে এবং মুসলমানকেও তার সংস্কার ও ধারণার মোহ ত্যাগ করতে হবে।'[২৬] সঙ্গে সঙ্গে উভয়কে এই মনোভাব ধারণ করতে হবে যে, তারা মানুষ, তাদের কল্যাণ আসবে একই পথে, তাদের জীবন-সমস্যাও এক আর সে-কারণে তাদের তপস্যা ও সাধনা একই পথে চলবে। তারা এদেশেরই মানুষ। পাশাপাশি তাদের এটাও মনে রাখতে হবে যে, মানুষের জন্য ইতিহাস, ইতিহাসের জন্য মানুষের নয়। এর থেকেও উজ্জ্বলতর ইতিহাস সৃষ্টি করা সম্ভব। লেখকের বিশেষ আহ্বান, হিন্দু-মুসলমান উভয়ে যেন প্রাচীন হিন্দুর সৃষ্টি ও প্রাচীন মুসলমানের সৃষ্টিকে সমানভাবে মানুষের সৃষ্টি হিসেবে মনে করে এবং অন্তরের সঙ্গে গৌরব অনুভব করে।[২৭] আবুল হুসেন মনে করেন এই চিন্তার মধ্য দিয়ে মিলন আসবে। তাই হিন্দু-মুসলমানকে আলাদা করে দেখতে নিষেধ করে লিখেছেন–

'এ যেন আমাদের মনে তিল-বিন্দু স্থান না পায় যে, আহ্, ওটি হিন্দুর—আর এটি মুসলমানের। আমরা যেন মনে করি—ও-সব মানুষের। ..."প্রতি মানুষই আমার ভাই, অতীতের প্রত্যেক সৃষ্টিই আমার প্রাণের বস্তু"—ইহাই নব-ভারতবাসীর বাণী হোক।'[২৮]
এ কাজে হিন্দুর ভূমিকাকেই আবুল হুসেন প্রধান হিসেবে বিবেচনা করেছেন। 'এক্ষেত্রে হিন্দু যতদিন না আপনার হিন্দুয়ানী মনোভাব... ত্যাগ করতে পারবে, ততদিন মুসলমান তাদের সঙ্গে যোগ দিতে সাহস পাবে না।'[২৯] কারণ সংখ্যা ও শক্তির দিক থেকে হিন্দুরাই বেশি। তাই প্রবল হিন্দুর থেকে আত্মরক্ষা স্বদেশপ্রেমের থেকেও জরুরি বলে মুসলমান মনে করে আসছে। হিন্দুর ব্যবহারের কারণে মুসলমানের মনে দুঃখ জমেছে উল্লেখ করে লেখক বলেন, একইভাবে মুসলমানের ব্যবহারেও হিন্দু দুঃখ পেয়েছে। 'এখন এই দ্বন্দ্ব-দ্বেষাদ্বেষি মিটিয়ে ফেলবার প্রথম উপায়—আমার মনে হয়—উভয় সম্প্রদায়ের পরস্পরের প্রতি দুঃখের পরিমাণ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা, তারপর সে দুঃখ দূর করবার চেষ্টা করা।'[৩০] এই চেষ্টার মাধ্যম হিসেবে তিনি সাহিত্যকে উপযোগী ভেবেছেন। সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়েই এই অবাঞ্ছিত বিরোধ দূর হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন। হিন্দু মুসলমানের মিলন সাধনে তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত, 'অতীত সংস্কারকে ভুলে যেতে পারলেই আমাদের মিলন সম্ভব হবে, সংস্কারাসক্ত হিন্দু ও সংস্কারাসক্ত মুসলমান চিরদিনই বিরোধ করবে, কিন্তু সংস্কারমুক্ত হিন্দু ও সংস্কারমুক্ত মুসলমানই মিল্‌তে পারবে।'[৩১]
কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০) হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের মূল কারণ শনাক্ত করতে গিয়ে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ের উল্লেখ করে বলেছেন, 'স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে যে-রাজনৈতিক স্বার্থবোধ দেশে জাগলো তার ফলে দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ উত্তরোত্তর প্রবল হওয়া অস্বাভাবিক নয়।'[৩২] যদিও তিনি এটা স্বীকার করেছেন যে, স্বদেশীর পূর্বে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক খুব মধুর ছিল এমন নয়। তিনি ফরিদপুর ও যশোরে সংঘটিত নমশূদ্র ও মুসলমানের দীর্ঘকালব্যাপী একাধিক দাঙ্গার কথা উল্লেখ করেছেন। আবার মোগল শাসনের শেষভাগে গুজরাটে ও কাশ্মীরে সংঘটিত দুটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা তুলে ধরেছেন যা বিখ্যাত ইতিহাস *সিয়ারুল মোতা আখেরীণ*-এ উল্লেখ আছে।[৩৩] এসব তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে সহজেই অনুমিত হয় যে, হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিরোধ বহু শতাব্দী পুরনো।
হিন্দু-মুসলমান সংঘাতে কার দায় বেশি এ নিয়ে পণ্ডিতেরা বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। কাজী আবদুল ওদুদ এ ব্যাপারে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের দোষই প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'বাস্তবিক, কি সেকালের দাঙ্গা কি একালের দাঙ্গা কোনোখানেই হিন্দুর শুধু কাপুরুষতার ও মুসলমানের শুধু জঙ্গ বাহাদুরীর পরিচয় যে আছে তা নয়।'[৩৪] কোনো কোনো শ্রেণির হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকলেও এই দুই বিরাট সমাজের ভিতর তিনি আশ্চর্য কোনো পার্থক্য দেখতে পাননি। তার প্রমাণ হিসেবে তিনি উপস্থাপন করেছেন, '... গুণ্ডার ভাব দুপক্ষের প্রকৃতিতেই আছে,

কেননা নৃশংসতার পরিচয় কোনো পক্ষে কম নেই, দাঙ্গার অগ্রণী হওয়ার অপরাধ থেকেও কোনো পক্ষ মুক্ত নয় ; ভীরুতাও দুই পক্ষেই আছে, ঢাকার দাঙ্গায় দেখেছি হিন্দুরা মুসলমানের ভয়ে পালিয়েছে, মুসলমান-বস্তি সারারাত জেগে কাটিয়েছে এই ভয়ে যে কখন হিন্দুরা এসে ঘর জ্বালিয়ে দেবে।'[৩৫]

শ্রী যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত "হিন্দু ও মুসলমানের প্রতি" প্রবন্ধে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের ডাক দিয়েছেন। তিনি উপলব্ধি করেছেন উভয় জাতির ভাগ্য এক সূত্রে গ্রথিত। একারণে দুই সম্প্রদায়ের একতা ভিন্ন স্বদেশের প্রকৃত উন্নতি সম্ভব নয়। কিন্তু দুই সম্প্রদায়ের রেষারেষি তাকে ব্যথিত করেছে। তিনি লিখেছেন :

> হিন্দু সম্প্রদায় মুসলমানদিগের প্রতি এখনও প্রাণ-মন খুলিয়া ভালবাসা জানাইতে শিখেন নাই; মুসলমান-সমাজও কাজে কাজেই ততটা মিশামিশি করেন না! ভালবাসার বদলেই ভালবাসা মিলে। এতদিন মার পেটের ভাইকে পর মনে করিয়া আমরা যথেষ্ট আত্মহানী ঘটাইয়াছি! পরস্পর ঠোক্‌রা ঠোক্‌রিতে এখন ত উভয়েরেই বিষদন্ত ভাঙিয়া গিয়াছে! উভয়েই আজ এক শৃঙ্খলে বাধা! আর কেন ভাই! এ তাণ্ডব অভিনয়? একত্র অবস্থান করিয়া দুইটি ভিন্ন প্রকৃতির পশুও মিত্র-ভাবাপন্ন হয়; আর আমরা তাহা পারিব না, একি কথা?[৩৬]

কাজী নজরুল ইসলামও (১৮৯৯-১৯৭৬) একান্তভাবে হিন্দু-মুসলমানের মিলন কামনা করেছেন। তাঁর রচিত প্রবন্ধ এ সত্যের পরিচয় বহন করে। এছাড়া কাব্যে, উপন্যাসে, নাটকে নজরুল হিন্দু-মুসলমানের যে রূপায়ণ ঘটিয়েছেন তা আর কারও পক্ষে সম্ভব হয়েছে বলে মনে হয় না। তিনি হিন্দু-মুসলমানকে উভয়ের স্বার্থ ভুলে একই বিশ্বমায়ের ছোট-বড় ভাই বলে ভাবতে অনুপ্রাণিত করেছেন। একই ভূখণ্ডে পাশাপাশি বসবাস করতে গিয়ে উভয় সম্প্রদায়ের উপর দিয়েই দুর্যোগ-দুর্বিপাকের ঝড় বয়ে গেছে। হিন্দু-মুসলমান উভয়েই বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড তাই প্রমাণ করে। এক অর্থে হিন্দু-মুসলমান তো সমব্যথী; তাই পারস্পরিক সম্মিলন সহজেই তাদের এক পঙক্তিতে দাঁড় করাতে পারে।

কবি নজরুলের গভীর বিশ্বাস ধর্ম শাশ্বত, তা সকল মানুষের সমগ্র বিশ্বের। তাই ধর্ম কখনো অনুদার হতে পারে না। তিনি দেখেছেন, হিন্দু-মুসলমানের মিলনের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে 'ছোঁয়াছুঁয়ির জঘন্য ব্যাপার' তথা ছুঁৎমার্গ যা কোনো ধর্মের অঙ্গ হতে পারে না। কারণ ধর্ম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং তা চিরদিনই বিশ্বের সকলের কাছে সমান সত্য হিসেবে গ্রহণীয় হয়ে থাকে। এসব বিবেচনায় নজরুলের কাছে প্রতীয়মান হয়, এই ছুঁৎমার্গ কোনো ধর্মের অঙ্গ নয় বরং তা মানুষেরই সৃষ্টি।[৩৭]তাই তিনি সেই ধর্মকে ধর্মই মনে করেন না যে ধর্ম মানুষকে ঘৃণা করতে শেখায়। তিনি হিন্দু ধর্মের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, 'এই ধর্মেই নরকে নারায়ণ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কি উদার সুন্দর কথা! মানুষের প্রতি কি মহান পবিত্র পূজা! আবার সেই ধর্মেরই সমাজে মানুষকে কুকুরের চেয়েও ঘৃণ্য মনে করিবার মতো হেয় জঘন্য এই ছুঁৎমার্গ বিধি।'[৩৮] তার মানে আবার এই নয় যে তিনি ধর্মকে একেবারে উড়িয়ে দিতে চাচ্ছেন, বরং তার বক্তব্য– 'আমরা অন্তর হইতেই বলিতেছি যে, আমাদিগকে সীমার

মাঝে থাকিয়াই অসীমের সুর বাজাইতে হইবে। নিজের ধর্মকে মানিয়া লইয়া সকলকে প্রাণ হইতে দু-বাহু বাড়াইয়া আলিঙ্গন করিবার শক্তি অর্জন করিতে হইবে।'[৩৯]

নজরুল ইসলামের কাছে ধর্মীয় পরিচয়ের বাইরে মানুষ হিসেবেই মানুষ মূল্যায়িত, আর একেই তিনি সত্য ধর্ম হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এ জন্য তিনি বলতে পেরেছেন, 'হিন্দু হিন্দু থাক, মুসলমান মুসলমান থাক, শুধু একবার এই মহাগগনতলের সীমা-হারা মুক্তির মাঝে দাঁড়াইয়া–মানব! –তোমার কণ্ঠে সেই সৃষ্টির আদিম বাণী ফুটাও দেখি! বলো দেখি, 'আমার মানুষ-ধর্ম।' দেখিবে, দশদিকে সার্বভৌমিক সাড়ার আকুল স্পন্দন কাঁপিয়া উঠিতেছে।'[৪০] ভারতে মহাজাতি সৃষ্টি করতে হলে অভিমান ভুলে হিন্দু-মুসলমান দুই ভাইকে বুক দিয়ে পাশে এসে দাঁড়াতে হবে। তাই তিনি ধর্মের সংকীর্ণ গণ্ডি কেটে বেরিয়ে আসতে মানুষকে উদ্বোধিত করে বলেছেন, 'মানবতার এই মহা-যুগে একবার গণ্ডি কাটিয়া বাহির হইয়া আসিয়া বলো যে, তুমি ব্রাহ্মণ নও, শূদ্র নও, হিন্দু নও, মুসলমান নও, তুমি মানুষ–তুমি সত্য।'[৪১]

দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এই যে দ্বন্দ্ব এর উৎস কোথায়, কেন এ মিলন-প্রয়াস সফল হচ্ছে না; কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে আলাপকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একবার বলেছিলেন, যে লেজ বাইরের তাকে কাটা যায় কিন্তু ভিতরের লেজকে কাটবে কে?[৪২] রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিকে নজরুল ইসলামের কাছে খুব অর্থবহ মনে হয়। কেননা এই লেজ তার পশুসত্তার স্বরূপ প্রকাশ করে। হোক সে বাইরের লেজ বা ভিতরের। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যেও তিনি এই পাশবিক লেজের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন। পশুর লেজ স্বাভাবিকভাবেই তার শরীরের বাইরে দৃশ্যমান হয় আর মানুষ পশু-পরিচয় দানকারী এই লেজকে তার ভিতরে লালন করে :

> ...এই যে ভিতরের ন্যাজ, এর উদ্ভব কোথায়? আমার মনে হয় টিকিতে ও দাড়িতে। টিকিপুর ও দাড়ি-স্তানই বুঝি এর আদি জন্মভূমি। পশু সাজবার মানুষের একি 'আদিম' দুরন্ত ইচ্ছা!–ন্যাজ গজাল না বলে তারা টিকি দাড়ি জন্মিয়ে যেন সান্ত্বনা পেল।
>
> সে দিন মানব মনের পশু-জগতে না জানি কী উৎসবের সাড়া পড়েছিল, যে দিন ন্যাজের বদলে তারা দাড়ি-টিকির মতো কোনো কিছু একটা আবিষ্কার করলে![৪৩]

হিন্দু-মুসলমান বিরোধের অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় উভয় সম্প্রদায়ের অতিমাত্রার ধর্মার্ততাকে। ধর্মাচারে গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দিলে মানবিক উদারতা থাকে না। ধর্ম-সত্যকে অবহেলা করে শাস্ত্রবাণীর উপর বিচারহীন গুরুত্বারোপই এই বিরোধকে ক্রমশ সংঘর্ষের দিকে নিয়ে গেছে। এই সত্যকে উপলব্ধি করে কাজী নজরুল ইসলাম "হিন্দু-মুসলমান" প্রবন্ধে বলেছেন–'হিন্দুত্ব-মুসলমানত্ব দুই-ই সওয়া যায়, কিন্তু তাদের টিকিত্ব দাড়িত্ব অসহ্য, কেননা ঐ দুটোই মারামারি বাধায়। টিকিত্ব হিন্দুত্ব নয়, ওটা হয়ত পণ্ডিত্ব। তেমনি দাড়িও ইসলামত্ব নয়, ওটা মোল্লাত্ব। এই দুই 'ত্ব' মার্কা চুলের গোছা নিয়েই আজ এত চুলোচুলি! আজ যে মারামারিটা বেঁধেছে, সেটাও এই পণ্ডিত-মোল্লায় মারামারি, হিন্দু-মুসলমানে মারামারি নয়।'[৪৪] অথচ এই দুই ধর্মের স্রষ্টা এক ও

অভিন্ন। একই উৎস থেকে উৎসারিত দুটি পথ। যে কারণে 'নারায়ণের গদা আর আল্লাহর তলোয়ারে কানোদিনই ঠোকাঠুকি বাধবে না', কারণ তাহলে 'তাঁর এক হাতের অস্ত্র তাঁরই আর এক হাতের উপর পড়বে'।[৪৫] যেখানে স্রষ্টায় ভেদাভেদ নেই, সেখানে মানুষের এই ভেদাভেদ-জ্ঞান অনভিপ্রেত, অবাঞ্ছিতও বটে।

মোতাহের হোসেন চৌধুরী (১৯০৩-১৯৫৬) "স্বাধীনতা : জাতীয়তা ও সাম্প্রদায়িকতা" প্রবন্ধে জাতীয়তাবোধের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে জাতীয়তাবোধের অভাবেই বাংলার স্বাধীনতা হারাতে হয়েছে, আবার এই জাতীয়তাবোধই পারে স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিতে। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের ক্ষেত্রেও এই জাতীয়তাবোধ ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে পারে। জাতীয় ঐক্যবোধের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক বৈষম্য দূর করা সম্ভব[৪৬] তাঁর মতে, ভারতে বসবাসকারী বিভিন্ন সম্প্রদায়কে ভারতীয় জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। আর এক্ষেত্রে জাতীয় উৎসব বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু প্রাবন্ধিক দুঃখের সঙ্গে লক্ষ করেছেন হিন্দু-মুসলমানের জাতীয় উৎসব বলে কোনো উৎসব নেই; সাম্প্রদায়িক উৎসবকেই জাতীয় উৎসব হিসেবে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর কারণ হিসেবে তিনি মনোবিনিময়ের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দেশবাসীর উদাসীনতাকে দায়ী করেছেন। অথচ সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য লাঘব করতে মনোবিনিময়ের বিশেষ প্রয়োজন আর এর জন্য প্রয়োজন জাতীয় উৎসব-প্রতিষ্ঠানের।[৪৭]

"হিন্দু-মুসলমান" প্রবন্ধে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের কারণ অনুসন্ধান করে এস. ওয়াজেদ আলি (১৮৯০-১৯৫১) সুনির্দিষ্ট বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। তাঁর এই বক্তব্যের মধ্যে বিরোধের মূল কারণগুলো ধরা পড়েছে। তিনি বলেছেন :

> আপাততঃ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘৃণা অর্থাৎ বিরোধের ভাবটাই যেন প্রবল। তার কারণ কি? আমার মনে হয় নিম্নলিখিত কারণগুলিই বর্তমান বিরোধের জন্য মুখ্যতঃ দায়ী; যথা−(১) ঐতিহাসিক শিক্ষার বর্তমান প্রণালী, (২) ধর্মগুরুদের অবাঞ্ছনীয় প্রভাব, (৩) সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি সম্পন্ন সাহিত্যের প্রভাব, (৪) চাকুরীজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা, (৫) বর্তমান রাজনীতিক জীবনে এই চাকুরীজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আধিপত্য, (৬) অতীতের সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রকে ফিরিয়ে আনবার দুরাশা এবং দুঃস্বপ্ন, (৭) বিভিন্ন ধরনের জীবনধারণ প্রণালী, (৮) সম্মিলিত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানাদির অভাব, (৯) ভবিষ্যতের বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট ব্যাপকতর সামবায়িক আদর্শের অভাব এবং (১০) বাঙালির বর্তমান জীবনে অবাঙালির অতিরিক্ত প্রভাব।[৪৮]

হিন্দু-মুসলমান বিরোধে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভূমিকার কথাও উল্লেখ করেছেন এস. ওয়াজেদ আলি। আর এক্ষেত্রে ইংরেজদের ভূমিকাকেই দায়ী করেছেন তিনি। ইংরেজ রাজত্বের যুগেই আধুনিক বাংলা সাহিত্য জন্মলাভ করে। বাঙালির জাতীয় জীবন ও মানসে ইংরেজদের প্রভাব তখন অপ্রতিহত। বিশেষ করে বাঙালি হিন্দু তখন পাশ্চাত্য সভ্যতাকে আদর্শ বলেই গণ্য করতে শুরু করেছে। আর ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষাকেও মনে করা হয়েছিল আদর্শ শিক্ষা-পন্থা হিসেবে। যে-কারণে ইংরেজ রচিত

ইতিহাসকে বেদবাক্যের মতো মেনে নিতে অসুবিধা হয়নি। সদ্য মুসলমানদের কাছ থেকে ক্ষমতা লাভ করে ইংরেজরা মুসলমানদের এবং তাদের ধর্ম ইসলামকে সুনজরে দেখেনি। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি এবং কাজের সমর্থনের জন্য মুসলমান ও ইসলামকে মসীলিপ্ত করতেও তারা কুণ্ঠাবোধ করেনি। তাই তাদের রচিত গ্রন্থ পড়ে বাঙালি হিন্দুর মুসলমানের প্রতি বিরূপ মনোভাব জেগে ওঠা স্বাভাবিক, আর সেই ভাবই প্রকাশিত হয়েছে হিন্দুর রচিত বাংলা সাহিত্যে।[৪৯] আর সে কারণেই 'সে যুগের বাংলা সাহিত্যের অনেকখানি তাই মোসলেম-বিদ্বেষ ভারাক্রান্ত। সে সাহিত্য হিন্দু-মোসলেম বিরোধ জাগিয়ে রাখতে বিশেষভাবে কার্যকরী হয়েছে।'[৫০]

হিন্দু-মুসলমানের মিলন সাধনে এস. ওয়াজেদ আলি বেশ কিছু পরামর্শ দিয়েছেন–হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতিকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিদ্যালয়ে পাঠ্য ইতিহাস গ্রন্থগুলোর আমূল পরিবর্তনের কথা বলেছেন তিনি। তাছাড়া সবসময় মনে রাখতে হবে যে, হিন্দু ও মুসলমানকে এদেশে এক সঙ্গে বসবাস করতে হবে। তাই অতীতের সেইসব ঘটনার আলোচনার দরকার যার মাধ্যমে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রদ্ধা, প্রীতি ও ঐক্যের ভাব বৃদ্ধি পায়। আর যে সব ঘটনা পুরাতন ক্ষতকে নতুন করে জাগিয়ে দেয় সে সব ঘটনা যত কম ও সন্তর্পণে উল্লেখ করা হয় ততই মঙ্গল।[৫১]

হিন্দু-মুসলমান পরস্পর রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি দিক দিয়ে সম্পর্কিত। তাই তাদের বিরোধ নিষ্পত্তি করতে হলে এই সকল দিক বিবেচনায় রাখতে হবে। এর মধ্যে ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিই গুরুত্বপূর্ণ, রাজনীতি বাহ্যিক ব্যাপার; অন্তরের মিলন হলে তা আপনিই হবে। ভিতরের মিল কিভাবে হতে পারে এই বিষয়ের উপর এস. ওয়াজেদ আলি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আর ভিতরের মিল হতে হলে তা মনের মিলের মধ্য দিয়েই হতে হবে। প্রাবন্ধিক মনে করেন, হিন্দু-মুসলমান যখন একে অপরকে চিনতে শিখবে, ভালবাসতে শিখবে অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠবে, তখন তারা একে অন্যের ধর্ম ও সভ্যতাকে সম্মান ও আদর করতে শিখবে। পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে খাওয়া-বসা, খেলাধুলা, আনন্দ উৎসব করতে থাকলে তাদের মধ্যে মনের মিল আপনাতেই হবে। বিরোধ নিজে থেকেই চলে যাবে।[৫২]

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সখ্য স্থাপনের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপায়ের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন এস ওয়াজেদ আলি; সেটি হলো অতীতের চেয়ে বর্তমানের বিষয় বেশি ভাবা এবং বর্তমানকে অতীতের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া।তবে তার চেয়ে প্রয়োজন হচ্ছে শিক্ষায়, অর্থে, সামর্থ্যে মুসলমানকে উন্নত ও হিন্দুর সমকক্ষ করে তোলা। মুসলমান অশিক্ষিত, দুর্বল, দরিদ্র এবং বিক্ষিপ্ত বলে তাকে বোকা বানানোর ইচ্ছা অন্যের মনে জেগে ওঠা স্বাভাবিক। মুসলমানের অবস্থার উন্নতির দ্বারা সে যেমন অন্যের অবহেলা থেকে বাঁচতে পারবে তেমনি হিন্দু-মুসলমান মিলনও সহজ হবে।[৫৩]

এছাড়াও হিন্দু-মুসলমানের মিলন সাধনে এস. ওয়াজেদ আলি আরও কতকগুলো পদক্ষেপ গ্রহণের কথাও ব্যক্ত করেছেন। যেমন, হিন্দু-মুসলমান উভয়কে মাতৃভাষার

চর্চার এবং পুষ্টির সাধনে একান্ত মনে আত্মনিয়োগ করতে হবে। এর পাশাপাশি প্রাবন্ধিক ধর্ম-সংস্কার-বর্জিত কিছু বিশেষ দিবসের সৃষ্টি করতে বলেছেন, যেমন বেঙ্গল ডে, নববর্ষের উৎসব প্রভৃতি; যাতে বাংলার হিন্দু-মুসলমান এক সঙ্গে মিলে প্রাণ খুলে আনন্দ করতে পারে।[৫৪]প্রাবন্ধিক জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মনে করেন হিন্দু-মুসলমানের মিলন অসম্ভব নয়। তিনি তাঁর "হিন্দু ও মুসলমানের মিলন কি অসম্ভব ?" প্রবন্ধে হিন্দু-মুসলমানকে ভারতজননীর দুটি সন্তান হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন, হিন্দু জ্যেষ্ঠ, মুসলমান কনিষ্ঠ; জ্যেষ্ঠ যদি কনিষ্ঠকে ব্যথা দিয়ে থাকে বা কনিষ্ঠ যদি জ্যেষ্ঠের হৃদয়ে আঘাত দিয়ে থাকে তবে তাও ক্ষমার যোগ্য। যদি দুটি বিপরীতধর্মী পশু প্রভুর গৃহে কিছুদিন পাশাপাশি বাস করে তারাও নিজেদের শত্রুতা ভুলে ক্রীড়ায় মগ্ন হয়; তবে মানুষ কেন তা পারবে না। হিন্দু-মুসলমান নিশ্চয় পশ্বধম নয়। সুতরাং তাদের মিলন সম্ভব।[৫৫]

সাহিত্যের মাধ্যমে মিলনভাব যে পরিমাণে প্রচার করা যায় অন্য মাধ্যমে তা সম্ভব নয়। প্রাবন্ধিক আহমদ মিঞা মনে করেন, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে অসন্তোষভাব পরিলক্ষিত হয় তার কারণ আমাদের সাহিত্যের মধ্যে জাতিগত হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতির প্রবলতর প্রকাশ। মিথ্যা কলঙ্ক কাহিনিতে আমাদের বই পুস্তক রচনা করা হয়েছে। এই সমস্যার সমাধানকল্পে লেখক সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষমূলক গ্রন্থ প্রণয়ন ও তার প্রচার বন্ধের কথা বলেছেন। পাশাপাশি মিলনভাবাপন্ন ও মিলন গঠনোপযোগী নতুন গ্রন্থ প্রণয়ন ও তার বহুল প্রচারের মাধ্যমে দেশের লোকজনকে একটা সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারা যাবে বলে মত প্রকাশ করেছেন।[৫৬] হিন্দু-মুসলমানের মিলন সাধনে পরস্পর পরস্পরের মধ্যে জানাশোনা বৃদ্ধি করতে হবে বলে খান বাহাদুর নাসির উদ্দীন আহমদ মনে করেন। তিনি বলেছেন, মিলনের জন্য পরস্পরকে পরস্পরের সভ্যতাকে ভালোভাবে বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। আর এজন্য পরস্পরের সাহিত্য, দর্শন ও শিল্প সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে হবে। হিন্দু-মুসলমান উভয়ের মধ্যে এই মনোভাব তৈরি করতে হবে যে, তারা উভয়ে এক জাতি, ভারতীয়। তাদের সবসময় মনে রাখতে হবে শুধু ধর্ম বিষয়ে হিন্দু ও মুসলমান; এছাড়া সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও অন্যান্য বিষয়ে তারা ভারতীয়। তাহলে তাদের মধ্যে যে পরমত-অসহিষ্ণুতা আছে তা দূর হবে। পাশাপাশি এই দুই সম্প্রদায়ের ভ্রাতৃত্ব ও মিলনের পথ প্রশস্ত করতে পরিবারে পরিবারে তাদের সামাজিকভাবে মেলা–মেশার ব্যবস্থা করতে হবে। বিশেষ করে উদার সাহিত্য প্রচলনের উপর প্রাবন্ধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন, যাতে পরস্পরের মধ্যে জাতি-বিদ্বেষ স্থান না পায়।[৫৭]

কাজী আনোয়ারুল কাদীর (১৮৮৭-১৯৪৮) তাঁর বেশ কয়েকটি প্রবন্ধে হিন্দু-মুসলমানের মিলন-সাধনা সম্পর্কে গুরুত্বের সঙ্গে পর্যালোচনা করেছেন। তিনি দেখেছেন, এই মিলনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে উভয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ মনোভাব। হিন্দু যেমন মুসলমানকে আপন মনে করে না এমনকি মুসলমানের সামান্য ত্রুটিও সে ক্ষমা করতে

নারাজ, তেমনি মুসলমানও হিন্দুকে আপন মনে করে না, ভাবে হিন্দুকে শায়েস্তা করাই তার ধর্ম। সে ভাবে দেশ যদি স্বরাজ পেয়ে যায় তবে অধিকতর শক্তিশালী হিন্দুরা তাদের রাখবে না, এদেশ থেকে বিতাড়িত করবে। তাই যেভাবে আছি সেভাবে থাকাই ভালো। অন্যদিকে হিন্দুদের মধ্যে একদল আছে যারা মনে করে মুসলমানরা চিরকাল ধরে তাদের উপর অত্যাচার করেছে মন্দির ভেঙেছে, নারীর উপর জুলুম করেছে এখনও ছাড়ছে না। মুসলমান যখন শাসনক্ষমতায় ছিল তখন না হয় সহ্য করেছি কিন্তু এখন আর কেন, আর তাছাড়া মুসলমানরা এখন শিক্ষা-দীক্ষা সকল দিক দিয়েই হীন এমন কি শক্তিতেও দুর্বল অতএব ওদের আর গুণ্ডামির সুযোগ দেওয়া কেন, সমূলে বিনাশ করাই এখন কর্তব্য।[৫৮]

কাজী আনোয়ারুল কাদীর মনে করেন, হিন্দুদের এই বিতাড়নমূলক মনোভাবই মুসলমানকে প্যানইসলামিজমের প্রতি ফিরে তাকাতে বাধ্য করেছে। কারণ ভারতে মুসলমান হিন্দুর এক তৃতীয়াংশ, তাই হিন্দুই এখানে প্রতাপশালী। এই প্রবল অংশ যদি দুর্বলকে পর ভাবে এবং মনে করে ভারত হিন্দুর, মুসলমান এখানে পরদেশী, তাহলে উভয়ের মধ্যে ব্যবধান তৈরি হয়। সাহিত্য ও বক্তৃতায় একথা অধিক পরিমাণে উচ্চারণের ফলে সংখ্যালঘু মুসলমান বাঁচার তাগিদে একটা আশ্রয় খোঁজে, সমরখন্দ বা বোখারার স্বপ্ন দেখে। প্রাবন্ধিক মনে করেন এই স্বপ্ন দেখাটা খুব স্বাভাবিক। এটা নিয়ে আরও নাড়াচাড়া করলে মুসলমানদের বিব্রত করে তোলা হয় ফলে উভয়ে উভয়ের কাছে পর হয়ে ওঠে।[৫৯]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর প্রবন্ধে হিন্দু-মুসলমান সমস্যাকে গুরুত্বের সঙ্গে পর্যালোচনা করে মিলনের আন্তরিক আকুতি ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মনে হয়েছে গোড়াতে অনেক কাল এই দ্বন্দ্ব ছিল না, বঙ্গবিভাগকে কেন্দ্র করে এই বিরোধ প্রকট হয়ে উঠেছে। উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদটা দিন দিন বিরাট হয়ে উঠছে কেন তার কারণ অনুসন্ধান করে তিনি বলেছেন–যতদিন আমাদের মধ্যে ধর্মবোধ সহজ ছিল ততদিন গোঁড়ামি থাকা সত্ত্বেও কোনো হাঙ্গামা বাধে নি। কিন্তু, এক সময়ে যে কারণেই হোক, ধর্মের অভিমান যখন উগ্র হয়ে উঠল তখন থেকে সম্প্রদায়ের কাঁটার বেড়া পরস্পরকে ঠেকাতে ও খোঁচাতে শুরু করলে। আমরাও মসজিদের সামনে দিয়ে প্রতিমা নিয়ে যাবার সময় কিছু অতিরিক্ত জিদের সঙ্গে ঢাকে কাঠি দিলুম, অপর পক্ষেও কোরবানির উৎসাহ পূর্বের চেয়ে কোমর বেঁধে বাড়িয়ে তুললে, সেটা আপন আপন ধর্মের দাবি মেটাবার খাতির নিয়ে নয়, পরস্পরের ধর্মের অভিমানকে আঘাত দেবার স্পর্ধা নিয়ে। এই-সমস্ত উৎপাতের শুরু হয়েছে শহরে, যেখানে মানুষে মানুষে প্রকৃত মেলামেশা নেই বলেই পরস্পরের প্রতি দরদ থাকে না।[৬০]

ধর্ম ও সামাজিক রীতিনীতির মধ্যে হিন্দু-মুসলমানে শুধু প্রভেদ নয় বরং বিরুদ্ধতাও আছে। এ সত্য মেনে নিয়েই রবীন্দ্রনাথ মিলন সাধনায় ব্রতী হতে বলেছেন। এর জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন উপলক্ষ ও বিনা উপলক্ষে পরস্পরের সঙ্গ ও সাক্ষাৎ। কারণ কাছাকাছি

আসা ও পাশাপাশি চলার মাধ্যমে মানুষকে আপন করে নেওয়া সহজ হয়ে ওঠে। তিনি এর একটা উদাহরণ তুলে ধরে দেখিয়েছেন, যখন কোরবানি নিয়ে একটা উত্তেজনা চলছে তখন হিন্দু প্রজারা তাঁর কাছে এসে এলাকায় কোরবানি রোহিত করার নালিশ জানায়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তা করেননি বরং মুসলমান প্রজাদের এমনভাবে কোরবানি দিতে বললেন যাতে হিন্দুদের মনে অকারণ আঘাত না লাগে মুসলমানরা তাই করল; ফলে কোনো অশান্তি সৃষ্টি হলো না। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন মুসলমান প্রজাদের সঙ্গে তাঁর সখ্যের কারণেই এটি সম্ভব হয়েছে। ধর্মাচারের চেয়ে মনুষ্যত্বকে রবীন্দ্রনাথ বড় করে দেখার আহ্বান জানিয়েছেন। কারণ ধর্ম ভারতের হিন্দু-মুসলমানকে মেলাতে পারেনি বরং নানাভাবে ব্যবধানই বাড়িয়ে তুলেছে।[৬১] ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, মুসলমানদের আগমনের অব্যবহিত পরে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় বিষয় ছাড়া যে পার্থক্য ছিল তা নিতান্তই সামাজিক। পরবর্তী কয়েক শতাব্দী এই পার্থক্য সামাজিক বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এর প্রধান কারণ ইংরেজ-পূর্ব ভারতের স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম ছিল তার আর্থিক জীবনের প্রাণকেন্দ্র। যেখানে রেষারেষি ও প্রতিযোগিতা সাধারণের জীবনকে বিপন্ন করে তোলেনি। ইংরেজ আগমনে ভারতের সমাজ-জীবনে মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়। তারা ভারতে ধনতন্ত্রের বীজ বপন করে; এর সূত্র ধরেই জনজীবনে আসে প্রতিযোগিতা, যা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে অর্থনৈতিক বিরোধ ঘনীভূত করে। এই অর্থনৈতিক বিরোধ প্রবল হয়ে বিংশ শতাব্দীর সূচনায় রাজনৈতিক বিরোধের জন্ম দেয়; শেষ পর্যন্ত যা ভারতকে বিভক্ত করে এবং সাম্প্রদায়িকতাকে বহমান রাখে।[৬২]

হিন্দু-মুসলমানের সংকটে প্রথম ভূমিকা রেখেছে ধর্মীয় সংস্কার। আর উভয়ের ধর্ম পরলোকমুখী হওয়ায় ইহকালীন জীবন কম গুরুত্ব পেয়েছে। ধর্মীয় সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠে মানুষে মানুষে সদ্ভাব স্থাপনে কোনো পক্ষকেই তেমন ভূমিকা রাখতে দেখা যায়নি। অন্যদিকে স্বার্থমগ্নতা সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রভৃতি দিক থেকেও করেছে উৎকণ্ঠিত; ফলে ধর্মের সঙ্গে এগুলো যুক্ত হয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে শুধু ব্যবধানই বৃদ্ধি করেছে। উভয় সম্প্রদায়ের হিতকামী প্রাবন্ধিকরা বিরোধ-মীমাংসার বিভিন্ন উপায় নিয়ে আলোচনা করলেও সাধারণের কাছে তেমন গুরুত্ব পায়নি; বরং স্বার্থমগ্নতার চূড়ান্ত পরিণতি প্রকাশ পেয়েছে দেশভাগের মধ্য দিয়ে।

প্রকৃতপক্ষে হিন্দু-মুসলমান বিরোধের মূলে অশিক্ষা, ধর্মান্ধতা ও সামাজিক কুসংস্কারকে চিহ্নিত করেছেন প্রাবন্ধিকরা। তাঁরা প্রধানত সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্পের ব্যাপক চর্চার মাধ্যমে উভয় সম্প্রদায়ের বিরূপতা দূর করে ঐক্য স্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থবোধ উভয় সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করে তুলতে পারেনি। ফলে বিভাজনই চরম পরিণতি লাভ করেছে।

তথ্যনির্দেশ

১. ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭), পৃ. ৪১৪, ৪১৫
২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৫
৩. কেনচিৎ মর্ম্মাহতেন হিতকামিনা, "মুসলমানের প্রতি হিন্দু লেখকের অত্যাচার", *নবনূর*, সৈয়দ এমদাদ আলী সম্পাদিত, ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩১০, পৃ. ১৬৮
৪. ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৪, ৪২৫
৫. সিরাজউল ইসলাম, "মিলনের একদিক", *নির্বাচিত সংকলন মাসিক জাগরণ পত্রিকা*, হাবিব রহমান সম্পাদিত (ঢাকা : ঐতিহ্য, ২০০৭), পৃ. ৮৫
৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬
৭. শ্রী মন্মথনাথ সরকার "মিলন-সমস্যা", *সওগাত*, মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন সম্পাদিত, ৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ভাদ্র ১৩৩৪, পৃ. ২০৬-২০৯
৮. জন. আর. ম্যাকলেন, "বঙ্গবিভাগ (১৯০৫) : হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক", *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত (ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩), পৃ. ৩২৪
৯. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য* (ঢাকা : চারুলিপি, ২০১২), পৃ. ১০০
১০. হাবিব রহমান, *বাঙালি মুসলমান সমাজে প্রগতিশীলতা ও রক্ষণশীলতার দ্বন্দ্ব* (ঢাকা : কথাপ্রকাশ, ২০১২), পৃ. ১৭
১১. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০১
১২. উদ্ধৃত, দিলওয়ার হোসেন সম্পাদিত, *মোহাম্মদী পত্রিকায় মুসলমান সমাজ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪), পৃ. ৬৭
১৩. উদ্ধৃত, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০১), পৃ. ২০৭
১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫
১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫, ৩৬
১৬. মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, "সাম্প্রদায়িক মিলন", *মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী রচনাবলী*, ২য় খণ্ড, আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯২), পৃ. ১৫
১৭. তদেব
১৮. হাবিব রহমান, *মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর চিন্তাধারা* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৩), পৃ. ১২৯
১৯. মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, "সাম্প্রদায়িক মিলন", *মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী রচনাবলী*, ২য় খণ্ড, আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭
২০. কাজী মোতাহার হোসেন, "বাঙালীর সামাজিক জীবন", *কাজী মোতাহার হোসেন রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, আবদুল হক সম্পাদিত (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৪), পৃ. ৯৬
২১. কাজী মোতাহার হোসেন, "শিক্ষিত মুসলমানের কর্তব্য", *কাজী মোতাহার হোসেন রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯১-৯২
২২. কাজী মোতাহার হোসেন, "বাঙালীর সামাজিক জীবন", *কাজী মোতাহার হোসেন রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭
২৩. কাজী মোতাহার হোসেন, "বাঙলা সাহিত্যের স্বরূপ", *কাজী মোতাহার হোসেন রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৪
২৪. আবুল হুসেন, "অতীতের মোহ", *আবুল হুসেনের রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, আবদুল কাদির সম্পাদিত (ঢাকা : বর্ণমিছিল, ১৯৭৬), পৃ. ৪০-৪১
২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১-৪২

২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২
২৭. তদেব
২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২-৪৩
২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫
৩০. তদেব
৩১. আবুল হুসেন, "সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান", আবুল হুসেনের রচনাবলী, ১ম খণ্ড, আবদুল কাদির (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৫
৩২. কাজী আবদুল ওদুদ, "মুসলমানের পরিচয়", *কাজী আবদুল ওদুদ রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, আবদুল হক সম্পাদিত (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৮), পৃ. ৩১৭
৩৩. তদেব
৩৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৯
৩৫. তদেব
৩৬. শ্রী যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, "হিন্দু ও মুসলমানের প্রতি", *নবনূর*, সৈয়দ এমদাদ আলী সম্পাদিত, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩১১, পৃ. ১৭৭
৩৭. কাজী নজরুল ইসলাম, "ছুঁৎমার্গ", *নজরুল-রচনাবলী*, ১ম খণ্ড (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১২), পৃ. ৩৯১
৩৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯২
৩৯. তদেব
৪০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৩
৪১. তদেব
৪২. কাজী নজরুল ইসলাম, "মন্দির ও মসজিদ", *নজরুল রচনাবলী*, ২য় খণ্ড (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১৫), পৃ. ৪৩৬
৪৩. কাজী নজরুল ইসলাম, "হিন্দু-মুসলমান", *নজরুল রচনাবলী*, ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৬-৪৩৭
৪৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৭
৪৫. তদেব
৪৬. মোতাহের হোসেন চৌধুরী, "স্বাধীনতা : জাতীয়তা ও সাম্প্রদায়িকতা", *মোতাহের হোসেন চৌধুরী রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, সৈয়দ আবুল মকসুদ সম্পাদিত (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৫), পৃ. ১০৩
৪৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৪-১০৫
৪৮. এস. ওয়াজেদ আলি, "হিন্দু-মুসলমান", *প্রবন্ধ সংগ্রহ* (ঢাকা : নবযুগ প্রকাশনী, ২০১৪), পৃ. ২৬৪-২৬৫
৪৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৭
৫০. তদেব
৫১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৫
৫২. এস. ওয়াজেদ আলি, "হিন্দু-মুসলমানের মিলন", *প্রবন্ধ সংগ্রহ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৪
৫৩. এস. ওয়াজেদ আলি, "হিন্দু ও মুসলমান কালচার", *প্রবন্ধ সংগ্রহ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২
৫৪. এস. ওয়াজেদ আলি, "বাঙালি আদর্শের প্রতিষ্ঠা", *প্রবন্ধ সংগ্রহ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪
৫৫. শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত, "হিন্দু ও মুসলমানের মিলন কি অসম্ভব ?", *নবনূর*, সৈয়দ এমদাদ আলী সম্পাদিত, ২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩১১, পৃ. ৩৭৪
৫৬. আহমদ মিঞা, "মিলনের উপায়", *সেরা বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা সংগ্রহ*, ড. রবিউল হোসেন সম্পাদিত (ঢাকা : অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০১৯), পৃ. ১৫২

৫৭. "চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ", *মুসলিম সাহিত্য সমাজ-এর বার্ষিক অধিবেশন : সভাপতিদের অভিভাষণ*, হাবিব রহমান সম্পাদিত (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০২), পৃ. ৯৫

৫৮. কাজী আনায়ারুল কাদীর, "*আমাদের দুঃখ* ", *আমাদের দুঃখ* (ঢাকা : অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০১০), পৃ. ২৭, ২৮

৫৯. কাজী আনায়ারুল কাদীর, "নেতাদের কথা", *আমাদের দুঃখ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩

৬০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "হিন্দু-মুসলমান", *রবীন্দ্রসমগ্র* (ঢাকা : পাঠক সমাবেশ, ২০১২), পৃ. ৬৬৯

৬১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬৭-৬৭০

৬২. বদরুদ্দীন উমর, "সাম্প্রদায়িকতা", *দুশো বছরের নির্বাচিত প্রবন্ধ*, মোহাম্মদ শামসুল কবির সম্পাদিত (ঢাকা : সূচীপত্র, ২০০৭), পৃ. ৩১০

আলাউদ্দিন আল আজাদের কবিতায় রাজনীতি ও শ্রেণিচেতনা

তানিয়া আক্তার*

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের কবিতায় আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯) অনিবার্য এক নাম। আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা, সভ্যতার নামে শাসন-শোষণ, শ্রেণিসংকট, রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচার, অস্তিত্বের টানাপড়েনে বিপর্যস্ত জনজীবন ও জনসমাজ তাঁর কবিতার প্রধান উপজীব্য। আলাউদ্দিন আল আজাদের শ্রেণিচেতনার বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর কবিমানসে শ্রেণিচেতনা তৈরিতে দেশ, কাল, রাজনীতি কিংবা বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রভাব কীভাবে কাজ করেছে তা অনুসন্ধান করা বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য। আমরা দেখিয়েছি, স্বদেশের ও বিশ্বের অধিকার বঞ্চিত জনগণের মুক্তির জন্য শ্রেণি-বৈষম্যহীন সুষম বণ্টন ব্যবস্থার একটি সমাজ বিনির্মাণের আকাঙ্ক্ষা তাঁকে পরিচালিত করেছে সাম্যবাদী জীবনাদর্শে। পাশাপাশি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম, বিকাশ ও বিস্তৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি ও কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সরাসরি জড়িত থাকার কারণে জনগণ, জনমানস ও জনসমাজের অন্তর্গত স্রোতকে অনুভবে সক্ষম হয়েছেন তিনি। তাঁর রাজনীতিভাবনা ও শ্রেণিচেতনার মূলে রয়েছে মঙ্গলচেতনা, সামাজিক ন্যায়বিচার, সাম্য, মানবমুক্তি ও মানবতার প্রতি সুগভীর দায়বোধ।

১.

বাংলাদেশের কবিতায় পঞ্চাশের দশক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কালপর্ব হিসেবে বিবেচিত। এ সময়ের কবিতা নানা বাঁক ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা পেরিয়ে বিচিত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে ক্রমশ সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে গিয়েছে। কবিতার অগ্রসরমানতার এই প্রবাহে কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ বিশেষ শক্তি, সামর্থ্য ও যোগ্যতার পরিচয় রেখেছেন। কবিতায় যোগ করেছেন নতুন প্রণোদনা। ১৯৪৬ সালে মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন সম্পাদিত *সওগাত* পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ “আবেগ” দিয়ে তাঁর সাহিত্যচর্চার শুরু। তিনি একাধারে কবি, খ্যাতিমান ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, গবেষক, সাহিত্য-সমালোচক ও অধ্যাপক ছিলেন। কথাসাহিত্যের পাশাপাশি কবিতায়ও তাঁর অবস্থান অত্যন্ত সুদৃঢ়। কবিতার প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ অনুরাগ। কারণ উল্লেখ করে এক সাক্ষাৎকারে কবি বলেছেন :

> কবিতা মাধ্যমেই আমার স্বাচ্ছন্দ বেশি, কারণ কবিতাতে প্রেমের নিবিড়তা ও গভীরতাকে পাই, অবচেতনে এমনকি অচেতনের সংকেতকে লাভ করি; আর বিদ্রোহ ও বিপ্লবের তূর্যধ্বনি কবিতাতেই সম্ভব। কবিতার অনুশীলনে মহাবিশ্বের অনন্তে উড়ে যেতে পারি, সভ্যতার সৌন্দর্যকে ছুঁয়ে যাই। (সিকদার আবুল বাশার, ২০০৩ : ১১৯-১২০)

---

*তানিয়া আক্তার, সাহকারী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ

মানবীয় অনুভূতির সকল স্তরকে ছুঁয়ে দেবার প্রবলতম বাসনা থেকে আলাউদ্দিন আল আজাদ গড়ে তুলেছিলেন ব্যক্তিগত কাব্যসৌধ। সুগভীর জীবনদৃষ্টি ও শিল্পভাবনা তাঁকে সমসাময়িক অন্যান্য কবিদের থেকে বিশিষ্টতা দান করেছে। তাঁর কবিতায় জীবন বা সমাজচেতনা যতোটা তীব্রভাবে প্রকাশিত, তা সমকালীন অনেকের কবিতাতেই অনুপস্থিত। বায়ান্নোর ভাষা-আন্দোলন, ষাটের গণজাগরণ, স্বাধিকার আন্দোলন ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে সমাজ-রাজনীতি-সংস্কৃতি ও জনমানুষের জীবনে যে ব্যাপক রূপান্তর ঘটে, তাকে ধারণ ও ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার অর্জন করে তিনি হয়ে ওঠেন একজন পরিপূর্ণ কবি। প্রগতিশীল মানবতাবাদী চেতনা ও আশাবাদী সংগ্রামী মনোভাব তাঁর কবিতার তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এ প্রবন্ধে আমরা দেখার চেষ্টা করব আলাউদ্দিন আল আজাদের কবিতায় রাজনীতি ও শ্রেণিচেতনা কীভাবে কাজ করেছে। আমাদের জিজ্ঞাসা হলো : দেশ, কাল, রাজনীতি কী করে তাঁর ভেতর শ্রেণিচেতনা তৈরি করেছে? তাঁর শ্রেণিচেতনার বৈশিষ্ট্য কী? বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও রাজনীতি কিংবা বিশ্বরাজনীতি কী করে শ্রেণিচেতনা প্রকাশে সহায়তা করেছে? এসব প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের জবাব অনুসন্ধানই এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য।

২.

কবিব্যক্তি রাষ্ট্র বা সমাজ বহির্ভূত কোন সত্তা নন। আর কবিতা যেহেতু জীবনের প্রতিচ্ছবি এবং জীবন যেহেতু স্বকালের সময়, সমাজ, রাজনীতি দ্বারা অবয়প্রাপ্ত হয়, তাই কবিতায় রাজনৈতিক প্রসঙ্গ, সমাজভাবনা কিংবা শ্রেণিচেতনার প্রবেশ অত্যন্ত স্বাভাবিক। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ততা থাকুক কিংবা না থাকুক, একজন কবি নানা সূত্রেই রাজনীতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জাতীয়তাবোধ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকেন। বিশেষ এক সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অনুশাসনকে গ্রহণ করে অথবা রূপান্তরিত করে তাঁকে গড়ে তুলতে হয় নিজস্ব চেতনালোক। সমাজ ও রাজনীতির সীমানা থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতাকে নিজ সংবেদনশীলতা ও প্রজ্ঞার সমন্বয়ে কাব্যরূপ দিয়ে নাগরিক হিসেবে নিজের ভূমিকাকে নিশ্চিত করতে হয়। চল্লিশের দশকের অন্যতম প্রধান কবি আবুল হোসেন (১৯২২-২০১৪) এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'কবিকে সমাজ-সচেতন হতেই হয়, সমাজ-সচেতন হতে হলে রাজনৈতিক সচেতনতাও অপরিহার্য।' (আবুল হোসেন, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৪ জুলাই ২০১৪) আর এই সমাজচেতনাই কবি আলাউদ্দিন আল আজাদের মধ্যে রাজনীতি সচেতনতা ও শ্রেণিভাবনার জন্ম দিয়েছে। সমাজের সচেতন নাগরিক হিসেবে কবিতার ব্যাপক পরিসরে তুলে ধরেছেন রাজনৈতিক বাস্তবতা ও শ্রেণিচেতনার অভিব্যক্তি।

রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি হলো রাজনীতি। আর জনগণ হলো রাষ্ট্রের মূল উপাদান। জনসমাজকে গড়ে তোলাই রাজনীতির প্রধান ও প্রাথমিক কাজ। সমালোচকের ভাষায়, 'জনসমাজের আমূল রূপান্তরই রাজনীতির প্রধান কাজ।' (পার্থপ্রতিম, ১৯৯১ : ১৩)

রাজনৈতিক চৌহদ্দিই নির্দিষ্ট করে দেয় সমাজে একজন ব্যক্তির অবস্থান ও সীমারেখা কী হবে। আর তাই সমাজস্থ প্রতিটি মানুষ তার চিন্তা ও মননে কোনো-না-কোনোভাবে রাজনীতিকে ধারণ করে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তা দ্বারা নিয়ন্ত্রিতও হয়ে থাকে।

রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত সমাজব্যবস্থায় সকল মানুষের সমানাধিকার স্বীকৃত নয়। আদিম সাম্যবাদী সমাজের ইতিহাস পেরিয়ে দেখা যায়, সমাজ শাসনের প্রতিটি পর্বেই মানুষ দুই শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল– একভাগে শাসক শ্রেণি, অন্যভাগে শোষিত শ্রেণি। সময়-পরিক্রমায় সমাজের ধরন (দাসসমাজ-সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-পুঁজিবাদী সমাজ) বদলালেও শোষণের প্রক্রিয়ায় বিশেষ পরিবর্তন আসেনি। বরং আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজে শোষণ যেন চূড়ান্ত হয়েছে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় একজন শ্রমিক শ্রমের বিনিময়ে যে মূল্য লাভ করেন তা পর্যাপ্ত নয়। শ্রমিকের শ্রমের লভ্যাংশ দিয়ে সম্পদ বৃদ্ধি পায় পুঁজিপতির। শ্রমিকের অধিকারের অর্থ চলে যায় শোষকের কাছে। কিন্তু প্রায়শই শ্রমিক শ্রেণি এ ব্যাপারে অবগত থাকে না যে, যে-শ্রম ও মুনাফার একটা অংশের বিনিময়ে পুঁজিপতির সম্পদের পাহাড় তৈরি হচ্ছে, তার উৎপাদক প্রকৃতপক্ষে তারাই। ফলে শ্রেণিবিভক্ত সমাজের একপ্রান্তে রয়েছে সম্পদের পাহাড়, অন্য প্রান্তে ক্ষুধা-দারিদ্র পীড়িত অসহায় মানবাত্মার ক্রন্দন। সরলভাবে এই শ্রেণিবিভক্ত সমাজে নিজ অবস্থান বা ভূমিকাকে উপলব্ধি করতে বা সুচিহ্নিত করতে পারাটাই শ্রেণিচেতনা।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে সংঘটিত রুশ বিপ্লবের কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রেরণা সৃষ্টি হয়। কিন্তু তার বহু বছর আগে – উনিশ শতকে শাসক শ্রেণির শোষণের হাত থেকে শোষিত শ্রেণির মুক্তির দিশারী রূপে আবির্ভূত হন দার্শনিক কাল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস (১৮২০-১৮৯৪)। ১৮৪৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টির 'ইশতেহার' প্রকাশের মধ্য দিয়ে তাঁরা পৃথিবীব্যাপী এক যুগান্তকারী তত্ত্বের সূচনা করেন। মার্কস প্রবর্তিত 'ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী'[১] মতবাদ দ্বারা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে সর্বহারা শ্রেণির সংগ্রাম শক্তিশালী হয়। বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ের এ লড়াই বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ নামে পরিচিত হতে থাকে। তাঁদের নেতৃত্ব সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির ইতিহাসে পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষকে ব্যাপকভাবে আলোড়িত ও উদ্দীপিত করেছে। মার্কসীয় দর্শন শুধু মানব জীবনের উত্থান পতনের বস্তুগত দিক নিয়ে আলোচনা করে না, বরং রাজনৈতিকভাবে তা বাস্তবায়নের দিকেও গুরুত্ব আরোপ করে। অন্যায়, অত্যাচার, বঞ্চনা, শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে যৌক্তিক অবস্থান গ্রহণ করে শোষিত মানুষকে জাগিয়ে তোলা মার্ক্সবাদী দর্শনের মূল বক্তব্য। উনিশ ও বিশ শতকের বিশ্বে এই মতবাদ রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাহিত্যিক ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। বিশেষ করে তৎকালীন অবিভক্ত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আদর্শে শ্রেণিহীন সমাজ নির্মাণের লক্ষ্যে সমাজ পরিবর্তনের নানা কর্মকাণ্ড ও সাংগঠনিক তৎপরতার কারণে কবিতায় এই যুগান্তকারী চেতনার প্রভাব লক্ষ করা যায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৯) ও রুশ বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে বাঙালি কবিদের রচনায় মার্কসীয় সাম্যবাদী চেতনা একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে চর্চিত হতে থাকে। রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক বাংলা কবিতায় কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) গণচেতনা বা শ্রেণিভাবনা প্রকাশে অভূতপূর্ব সাফল্য দেখিয়েছেন। সমালোচকের মতে, 'রবীন্দ্র-উত্তর বাংলা কবিতায় তিনিই প্রথম স্পষ্ট ভাষায় সমানাধিকারের কথা, চির-অবনতের সঙ্ঘবদ্ধ অভ্যুত্থানের কথা বলেছিলেন।' (সুমিতা, ১৯৯২ : ৩০০) মানুষ, মানবতা তাঁর কাব্যভাবনার মূল অনুষঙ্গ; শ্রেণিচেতনা তাঁর কাব্যের মূলসূত্র। 'গাহি সাম্যের গান−/ মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই নহে কিছু মহীয়ান্!' (কাজী নজরুল ইসলাম, ২০১৯ : ৮৬)− কবির এই উচ্চারণ গণজাগরণেরই মন্ত্রবাক্য। তাঁর কাব্যের শ্রেণিচেতনা গণমানুষকে শোষণ, বঞ্চনা ও পরাধীনতা থেকে মুক্তির বাসনায় উদ্দীপিত করে তুলেছে। শোষক-শোষিত, নির্যাতনকারী-নির্যাতিত সকলকে তিনি ঘা মেরে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। জনমানুষের চেতনায় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন বিদ্রোহের বাণী। সর্বহারা, বিত্তহীন ও শ্রমজীবী মানুষের যোগ্যতা, শক্তি ও সামাজিক মর্যাদাবোধের কথা তাঁর কাব্যে প্রতিফলিত।

নজরুলোত্তর বাংলা কাব্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের (১৯০৪-১৯৮৮) কবিতায় শ্রমিক শ্রেণির সঙ্ঘবদ্ধ সংগ্রামের প্রতি গভীর আস্থা ও দিন বদলের আশাবাদ ব্যঞ্জনাময় অভিব্যক্তি নিয়ে প্রকাশিত, 'আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতারের/ মোটে মজুরের/ আমি কবি যত ইতরের/ আমি কবি ভাই কর্মের আর ঘর্মের।' (প্রেমেন্দ্র, ১৯৯৪ : ২৩) তিরিশের অন্যতম প্রধান কবি বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২) শ্রেণিসংগ্রামের বাস্তব রূপকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি অনুধাবনে সমর্থ্য হয়েছিলেন যে শ্রমিকের ঐক্যবদ্ধতাই পারে ধনতান্ত্রিক সমাজ বিনাশ করে শোষণ, বঞ্চনার শৃঙ্খল থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে :

আকস্মিক ঘটনায়, দৈবচক্রে, অর্থের উৎপাতে
পুরুষার্থ নির্ণীত যে সমাজের উঁচু-নিচু স্তরে
সেখানে জুয়াড়ি স্বার্থ সঞ্চয়ী গৃধর ভিড়ে মাতে
মানুষ সেখানে শুধু ছিনিমিনি করি কেনা দরে। [...]
সেই তিক্ত বঞ্চনার, বাণিজ্য-লক্ষ্মীর রক্তাতুর
সাম্রাজ্যের অভিসার ধুলিস্যাৎ প্রাণের বিপ্লবে। (বিষ্ণু, ১৯৫৯ : ১৭৬)

বিংশ শতকের চল্লিশের দশকের কবিতায় সমকালস্পৃষ্ট, রাজনীতি সচেতন, সমাজমনস্ক, গণমুখীচেতনা নির্ভর কবিতার ধারাটি ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। ঔপনিবেশিক শোষণ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলি, মন্বন্তর, দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অব্যবহিত চাপে চল্লিশের কবিরা নিজেদেরকে সমর্পিত করেছিলেন শাসন, শোষণ, দারিদ্র, নিপীড়ন ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে। শ্রেণি-সচেতন, মানবতাবাদী, প্রতিবাদী চেতনায় উজ্জীবিত করে তুলেছিলেন কবিতাকে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯-২০০৩), সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-১৯৪৭), সমর সেন (১৯১৬-

১৯৮৭), অরুণ মিত্র (১৯০৯-২০০০) প্রমুখের কবিতায় শ্রমজীবী, শোষিত, দরিদ্র, নিপীড়িত সাধারণ মানুষের প্রতি অকুণ্ঠ ভালবাসার পাশাপাশি শ্রেণিহীন সমতাভিত্তিক শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সম্মিলিত শক্তির জাগরণবাণী উচ্চকণ্ঠ হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে আমরা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'মে দিনের কবিতা', সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'ছাড়পত্র' কবিতার কথা স্মরণ করতে পারি।

ক. প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা
চোখে আর স্বপ্নের নেই নীল মদ্য
কাঠফাটা রোদ সেঁকে চামড়া।
শতাব্দী লাঞ্ছিত আর্তের কান্না
প্রতি নিঃশ্বাসে আনে লজ্জা;
মৃত্যুর ভয়ে ভীরু বসে থাকা, আর না -
পরো পরো যুদ্ধের সজ্জা। (সুভাষ, ২০০৮ : ৩৫)

খ. চলে যাবো– তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি
নবজাতকের কাছে এ আমার অঙ্গীকার। (সুকান্ত, ২০০৫ : ৫)

পুঁজিবাদের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি ও শোষণ-বঞ্চনাহীন সমাতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা চল্লিশের বাংলা কবিতায় বিশেষভাবে মুদ্রিত। বাস্তবতাবোধ ও মানবতাবোধ কবিদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে সাম্যবাদী চেতনা লালন ও পরিচর্যায়।

৩.

সাতচল্লিশের দেশ-বিভাগোত্তর সময়ে পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ববঙ্গে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে শ্রেণিচেতনা সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক পরিসরে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। পঞ্চাশের অন্যতম প্রধান কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ এসময় স্বদেশের সামগ্রিক মুক্তিসংগ্রামে সাম্যবাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চিন্তাচেতনা দ্বারা বিশেষভাবে উজ্জীবিত হয়েছেন। শ্রেণিসচেতন কবি হিসেবে তাঁর কাব্যভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে মানুষ ও সমাজ। সমালোচকের ভাষায়, 'বাংলাদেশের সমকালীন গণমুখী চেতনার কবিতার তিনিই প্রধান পুরুষ' ছিলেন। (হুমায়ূন মালিক, ২০১৫ : www.kaliokalam.com) ব্যক্তিজীবনে তিনি বামধারার রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন। ছাত্রজীবনে বিভিন্ন প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলন এবং সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বিধায় ব্যক্তি এবং সমাজকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের প্রবণতা তৈরি হয় তাঁর মধ্যে। কবিতায় যার স্পষ্ট প্রভাব লক্ষণীয়। এ প্রসঙ্গে সমালোচক জানান, 'বামপন্থী রাজনৈতিক চিন্তাদর্শ তাঁর কবিতাকে বিশেষভাবে প্রাণবন্ত করেছে। তাতে একদিকে রয়েছে তাঁর দেশের মাটির গন্ধ, অন্যদিকে বঞ্চনাদীর্ণ শ্রমক্লিষ্ট নিম্নকোটির মানুষের জীবনোল্লাসের ধ্বনি।' (বশীর আল-হেলাল, ১৯৭৫ : ৩১) বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোয় তিনি উন্মোচন

করেছেন স্বদেশের আর্থ-সামাজিক জীবনের বহুমাত্রিক অবক্ষয়, শোষিত-ক্লিষ্ট জনতার অসহায় আর্তনাদ, কখনো বা তাদের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের কাহিনি। আলাউদ্দিন আল আজাদের কবিতায় শ্রেণিভাবনার প্রকাশ একমুখী নয়; রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, ইতিহাসবোধ, স্বকালভাবনা, প্রেমানুভব, আন্তর্জাতিকতা ও ঐতিহ্য সংরাগ পরিপূরক স্রোত হিসেবে তাঁর কবিতার শ্রেণিভাবনা তথা গণমুখিনতাকে পরিপূর্ণ রূপ প্রদান করেছে।

সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই মানুষ নিরাপদ এবং নিশ্চিন্ত জীবনযাপনের আশায় গোষ্ঠী ও সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করেছে। সমাজের উৎপাদন-ব্যবস্থা বিকাশের একটি বিশেষ স্তরে এসে সামাজিক অবস্থান এবং স্বার্থগত ভিন্নতার সূত্রে সৃষ্ট হয়েছে পরস্পরবিরোধী শিল্পপতি-বুর্জোয়া শ্রেণি ও সর্বহারা- শ্রমিক শ্রেণি। এ প্রসঙ্গে সমালোচক জানাচ্ছেন, 'যখন উৎপাদনের উপায়গুলির এমন একটু উন্নতি হইল যে একের পরিশ্রমে একাধিক লোকের ভরণপোষণের ব্যবস্থা হওয়া সম্ভবপর (যেমন কৃষিকার্য) তখন হইতেই শ্রেণী বিভেদের বাস্তব ভিত্তি হইল।' (অণিল ১৯৮৭ : ১০) মানবসভ্যতায় যেদিন থেকে এই শ্রেণির জন্ম, শ্রেণিদ্বন্দ্বের শুরুও তখন থেকেই। কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রমাণ করেছেন যে, আদিম সাম্যবাদী সমাজ ব্যতীত অন্যান্য সকল সমাজের ইতিহাস হলো শেণি-সংগ্রামের ইতিহাস, 'The history of all hitherto existing society is the history of class struggles.' (Marx and Fredrick Engels, 1906 : 12) আধুনিক পুঁজিবাদী সময়ে এসে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের বহুমুখী বিরোধ ও বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। অর্থনৈতিক মানদণ্ডে সৃষ্ট শ্রেণি-বিভাজন, শ্রম-বিভাজন, যান্ত্রিকায়নের কারণে পণ্য উৎপাদক পুঁজিবাদী জগতে মানবিক সত্তার অবমাননা ঘটেছে চূড়ান্তভাবে। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের লড়াই হয়েছে চূড়ান্ত। ব্যক্তি সরে গেছে ব্যক্তি থেকে, নিজেকে সে গুটিয়ে নিয়েছে সমাজ থেকে। গণমুখী স্বদেশপ্রেমে উজ্জীবিত আজাদের কবিতায় ব্যাপক পরিসরে জায়গা করে নিয়েছে শ্রেণিসংকটে জর্জরিত মানবাত্মার করুণ ও বিদ্রোহাত্মক উপস্থাপন। ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় কার্যকর শ্রেণিগত বিরোধ, শোষণ-প্রক্রিয়া ও তার প্রভাব-পরিণতি-প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ ঘটেছে নানা সূত্রে। সমাজদেহে বিরাজমান অন্যায় নির্যাতন, অপশাসন, অসাম্য-বৈষম্যকে তিনি উপলব্ধি করেছেন এবং সত্যদ্রষ্টা হয়ে কবিতায় তা প্রকাশও করেছেন অবলীলায়। অধিকারের সঙ্গে অপ্রাপ্তির বিরোধ, প্রত্যাশিত শান্তির সঙ্গে রূঢ় কঠিন বাস্তবতার দ্বন্দ্বের ছবি সেখানে স্পষ্ট। কতিপয় উদাহরণ :

ক. আমার ভায়রা বিদেশি কোম্পানিতে চাকুরী করতেন
সেদিন শুভক্ষণে এমডি হয়ে গেলেন...
পার্টি দিতে হবে
যেখানে দাওয়াত পাবেন চেয়ারম্যান ফেয়ারম্যান ক্লিয়ার ডিয়ার
তেলতেলে শিল্পপতি হংকং হাজী ডেমোক্রেট
অন্তত কয়েকজন মন্ত্রী পরিষদের সম্মানিত সদস্যও-
ডিজিটাল টেলিফোনে সরলা বালিকা আমার শালিকা বললে

বোনকে, আপা খোকা তো বেশ জ্বর শুনলাম কাল সন্ধ্যায়
এদিকে এসো না। [...]
আমরা দু'জনেই অধ্যাপনা করি, বুঝলাম ওরকম ঝকমকে
মহাজলসায় আমাদের উপস্থিতি ময়লা মনে
হোতে পারে। (আলাউদ্দিন আল আজাদ, ২০০৬ ক : ৩৫১)

খ. সারে পাতা লম্বা টেবিলে খাচ্ছেন ব্যস্ত আত্মভোলা
শানদান মেহমান মন্ত্রী শিল্পপতি ভদ্রলোক
সমাজের চুড়ামণি। [...]
ক্ষুধার্ত শিশুরা কাপে দৃষ্টিও ঝাপসা যেন অন্ধ
হতে থাকে, মনে মনে জপে, 'আল্লাহ খাদ্য দিয়ে আজ।'
দারোয়ান শক্ত লাঠি হাতে আসছে তেড়ে ভীষণ
ক্রুদ্ধ। কুত্তার বাচ্চারা! চেঁচিয়ে বলছে একজন,
ভাগ ভাগ! মাঝের একটা মাথা তুলে ঘিন্‌ঘিন্‌
চেহারা, বলল হুজুর আমরা এটো খাচ্ছি, হাড়
ছাবা নিচ্ছি, আর কিছু না। আমাদেরকে মারবেন না।
(আলাউদ্দিন আল আজাদ, ২০০৬ খ : ৪৬)

ক-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে, কবির ধনী শ্যালিকা মধ্যবিত্ত অধ্যাপক বোন-দুলাভাইকে স্বামীর সাকসেস পার্টিতে আমন্ত্রণ করেন নি। এমনকি তাঁদের উপস্থিতিকে এড়িয়ে যেতে আশ্রয় করেছেন অপকৌশল। খ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে দেখা যাচ্ছে যে, নেতাকর্মী ও মন্ত্রীদের উদ্দেশ্যে আয়োজিত ভোজে উচ্ছিষ্ট খাবারের আশায় ভিড় জমিয়েছে মৌলিক অধিকার বঞ্চিত কতিপয় ভুখা শিশু। কিন্তু সভ্যদের সৃষ্ট আয়োজনের উচ্ছিষ্টেও যেন ওদের অধিকার নেই। তাই দারোয়ানের উদ্যত লাঠি ওদের বাঁচার অধিকার ছিনিয়ে নিতে তৎপর হয়েছে। অর্থনৈতিক মানদণ্ডে সৃষ্ট শ্রেণিবৈষম্য রাষ্ট্রব্যবস্থা, সমাজনীতি ও ব্যক্তিসম্পর্কে যে ক্ষত ও বিচ্ছিন্নতার জন্ম দিয়েছে, সে সংক্রান্ত বাস্তবতা প্রতিবিম্বিত হয়েছে উদ্ধৃতিগুলোতে।

কবি আজাদ বিশ্বাস করতেন, স্বদেশ কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণির মানুষের জন্য বরাদ্দকৃত ভূমি নয়, বরং মাতৃভূমির বুকে জন্ম নেয়া সকল শ্রেণি-পেশা-ধর্ম-বর্ণ মানুষের জন্যই তা সমান অধিকারের। তাই দেশ, সমাজ ও জনতার প্রতি গভীরভাবে দায়বদ্ধ কবি কেবল শ্রেণিসংকটের প্রভাব বিষয়ে কথা বলেই ক্ষান্ত হননি, বরং মেহনতি জনতার ঐক্যবদ্ধ শক্তি ও প্রতিরোধ ভাবনাকে তীব্র আশাবাদে উজ্জ্বল করে প্রকাশ করেছেন কবিতায়। মার্কসবাদ শ্রেণিহীন সমাজ নির্মাণের লক্ষ্যে জনতার সংগ্রামী চেতনার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে। মার্কসীয় তত্ত্বানুসারে সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদী রাষ্ট্রে পৌঁছাতে হলে প্রথম প্রয়োজন শ্রেণিচেতনা। শ্রেণিচেতনার জাগরণ দ্বারাই শ্রমজীবী মানুষের অধিকার তথা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে কার্ল মার্কসের বরাত দিয়ে সমালোচক জানিয়েছেন, 'অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শক্তিশালী শ্রমিকশ্রেণীর অভ্যুদয় অনিবার্য এবং এর ফলে সমাজের মধ্যে পরস্পরের সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্য

অবশ্যম্ভাবীরূপে সঞ্জাত হচ্ছে, তার পরিণতি হলো সোশালিস্ট বিপ্লব।' (হীরেন্দ্রনাথ, ১৩৬৩ : ২০) অর্থাৎ, স্বশ্রেণিসুলভ জাগ্রত চেতনাই পারে ব্যক্তিকে নিজ অধিকার বিষয়ে সোচ্চার করে তুলতে।

আলাউদ্দিন আল আজাদ দেখেছেন, এদেশে যারা ক্ষেতে-খামারে-ফসলের মাঠে শ্রম দেয়, কল-কলকারখানার চাকা ঘুরিয়ে অর্থনীতিকে সচল রাখে যারা, তাদের জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পরিবর্তে নিত্য অভাব লেগে থাকে। শ্রমিকের শ্রমে মালিকের জীবনের মান ও সম্পদ বাড়ে, অথচ শ্রমিকের শ্রেণি-অবস্থার কোনো উন্নতি ঘটে না। এই বঞ্চনার শৃঙ্খল থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে ধনতান্ত্রিক সমাজ ধ্বংসের লক্ষ্যে জনতার সচেতন অভিব্যক্তিকে কবিতায় আশ্রয় করেছেন কবি :

> ... জানেনই তো হুজুর আমাদেরই
> ঘামের টাকায় আপনেরা রাষ্ট্র চালান, মাসঅন্তে মোটা
> অঙ্কের মাইনে গণেন যদিও তা কিছু নয়, বিদেশ থেকে
> আমদানী করা নতুন নতুন গাড়ি চালান, ধানমণ্ডি গুলশান
> বনানী বারিধারায় সুন্দর সুন্দর বাড়ি বানান এবং ছেলেমেয়েদেরকে
> ইংল্যান্ড ইউরোপ আমেরিকায় পাঠান
> লেখাপড়া করতে :
> আমাদের সেই টাকার কিছু ভাগ আমিও তো পেতে পারি? [...]
> ... ঠিক আছে যান। আমার পাওনা আমি বুঝে নেবো,–
> কেমন ক'রে আপনিও বুঝবেন, একদিন।
> (আলাউদ্দিন আল আজাদ, ২০০৬ ক : ৩৫১)

আলাউদ্দিন আল আজাদ কবিতায় রচনা করেছেন শোষকের বিরুদ্ধে শোষিত মানুষের সম্মিলিত জাগরণের ইতিবৃত্ত। তিনি জানতেন, সম্মিলিত প্রতিরোধ দ্বারা শ্রেণিশাসনের বিলোপসাধন করতে না পারলে নিপীড়িত মানুষের মুক্তি অধরা থেকে যাবে। আশাবাদী সংগ্রামী মনোভাব তাঁর কাব্যে নবতর ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হয়েছে। কবিতায় বঞ্চনা-বৈপরীত্যের সংঘাত ও টানাপড়েন যেমন স্পষ্ট, তেমনি জীবনকে পূর্ণভাবে পাবার বাসনার কথাও প্রকাশিত। প্রার্থিত সুন্দরের সঙ্গে বাস্তবের অসামঞ্জস্য, প্রাপ্য অধিকারের সঙ্গে না পাওয়ার বিরোধ, অসম সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান ছিল স্থিরপ্রতিজ্ঞ। শস্যশ্যামল বাংলার একটি ক্ষুদ্র শস্যদানার প্রতিও ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ। তিনি চেয়েছেন শস্যের সুষম বণ্টন, রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধায় জনতার সমানাধিকার। এ ব্যাপারে নিজের অবস্থানকে স্পষ্ট করতে গিয়ে কবি বলেছেন, 'আমার লেখার উদ্দেশ্য শ্রেণীসংগ্রামকে শাণিত করা যাতে শোষক শ্রেণীকে সম্মিলিত যুদ্ধে ধ্বংস করা যায় এবং পৃথিবীতে আনা যায় সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ। সর্বহারার মুক্তিই ছিল আমার দায়বদ্ধতা।' (সিকদার আবুল বাশার, ২০০৩ : ১১২)

সমাজ ও জনতার প্রতি দায়িত্ববোধ কবি আজাদকে কর্মীর ভূমিকায় অবতীর্ণ করেছিল। ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম দ্বারা সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন সম্ভব বলে বিশ্বাস করতেন তিনি। তাই

কবিতাকেও গড়ে তুলেছেন সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে। ফলে জনতার কথা, বিপ্লবের ভাষা, মিছিলের ডাক, নতুন দিনের প্রত্যাশা অনায়াসে উঠে এসেছে কবিতায়। প্রাসঙ্গিক কিছু উদাহরণ :

ক. আমরা নতুন যুগের সূর্য-সম্মত জনতা।
উজ্জ্বল এক সমবায় দিনের সঙ্গমে
এমন মহৎ কিছু এমন বিরাট কিছু এমন সুন্দর কিছু
পশ্চাতে রেখে যাবো
যা দেখে আগামীকালের নাগরিকেরা যেন
গভীর বিস্ময়ে সিঁড়ির পাশেই হতবাক হয়ে থাকে।
(আলাউদ্দিন আল আজাদ, ২০০৬ ক : ২৫)

খ. দেয়ালের সব লেখা মুছে দাও
তারপরে লেখো প্রকাণ্ড অক্ষরে
প্রকাণ্ড অক্ষরে তারপরে লেখো
লেখো আমি ভালোবাসি গণতন্ত্র! [...]
ধানের গমের গুচ্ছ গণতন্ত্র
পাটের তুলোর জন্ম গণতন্ত্র
ক্ষুধার তৃষ্ণার তৃপ্তির গণতন্ত্র
দিনের রাতের দীপ্তি গণতন্ত্র।
(আলাউদ্দিন আল আজাদ, ২০০৬ ক : ১৩৬)

সময়ের প্রবহমান সামগ্রিক বাস্তবতাকে একান্তভাবে ধারণ করেছেন কবি। জীবনের জয়গানকে কেবল ব্যক্তিক স্বার্থের অংশ করে প্রকাশে তৎপর হননি, বরং সমগ্রের প্রতি প্রবল অনুরাগ তাঁর চেতনাকে পরিচালিত করেছে সর্বজনীনতার পথে।

আলাউদ্দিন আল আজাদের কবিতায় শ্রেণিভাবনা জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণতায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েনি। তাঁর অবস্থান বিশ্বমানবতার পক্ষে। এ কারণে তাঁর কবিতাগুলোতে প্রকাশিত আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা কোনো সুনির্দিষ্ট জাতিগোষ্ঠী বা ভৌগোলিক সীমারেখায় গণ্ডিবদ্ধ নয়। তাঁর সমাজচেতনা ধর্ম-বর্ণ-দেশের সীমারেখার ঊর্ধ্বে উঠতে সমর্থ হয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে কার্ল মার্কস সম্পর্কে তাত্ত্বিক আর্নেস্ট ফিশারের মূল্যায়ন উল্লেখ্যযোগ্য, 'মার্কসের কাছে নির্ণায়ক জিনিসটা কেবল ''সার্বিক'', নিজেই নিজের লক্ষ্য এমন কোন ব্যবস্থা নয়। তার নির্ণায়ক হচ্ছে বরং মানুষ – মূর্ত্ত, বাস্তব, ব্যক্তি মানুষ। তাঁর চিন্তার, সমস্ত চেষ্টার বিষয় হচ্ছে সম্পূর্ণ মানুষ, মানুষের বাস্তবতা, ইতিবাচক মানবতা।' (ফিশার, ২০২৩ : ২৩) মার্কস ও মার্কসবাদের অনুসারী কবি আলাউদ্দিন আজাদের ক্ষেত্রেও এই মন্তব্য প্রযোজ্য। কেননা দেশকে পেরিয়ে তিনি পৌঁছে গিয়েছেন বৈশ্বিক বা আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে। পৃথিবীর নানা প্রান্তে সংঘটিত দাঙ্গা-বিরোধ, ফ্যাসিবাদী আগ্রাসন, অনাচার-অবিচার, যুদ্ধ-বিগ্রহ, শাসন-শোষণের সামাজিক ও রাজনৈতিক অভিসন্ধির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন কবি। বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর মূল আরাধ্য :

গ্রাম-নগর ও পথে-প্রান্তরে দিই ডাক :
    স্বদেশ আমার হুঁশিয়ার
রণদৈত্যের অক্ষৌহিণী তোলে হাঁক;
    পৃথিবী আমার হুঁশিয়ার!! [...]
    শান্তি নামুক খামারে খামারে ঝুর্‌ঝুর্‌
    শান্তি নামুক কলকারখানা ভরপুর
    শান্তি নামুক গৃহ অঙ্গনে, শিল্পীর
    কলম তুলিতে শান্তি নামুক সৃষ্টির।
    (আলাউদ্দিন আল আজাদ, ২০০৬ ক : ৩১)

কবির সুর এখানে 'দৈশিক হয়েও বৈশ্বিক, প্রতিবাদী হয়েও শান্তিবাদী'। (আলাউদ্দিন আল আজাদ, ২০০৬ ক : 'মুখবন্ধ') জনতার অধিকার আদায় এবং কাঙ্ক্ষিত শান্তি প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে সংগ্রামী ভূমিকায় অবস্থান নিয়েছেন কবি। যেখানেই অন্যায় দেখেছেন, সেখানেই বিদ্রোহী হয়েছেন। মূলত একটি শান্তিময় পৃথিবী ও নিরুপদ্রব স্বদেশ গড়ার প্রত্যয় থেকে কবির হৃদয়ে বিপ্লবীচেতনার জন্ম – মানুষের প্রতি তীব্র মমত্ববোধ যার উৎস। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সৃষ্ট নানা সংকট আর বৈরী সময়ের পটভূমিতে নতুন এক সমাজ প্রতিষ্ঠার দৃঢ় প্রত্যয় তাঁর কবিতায় শিল্পমূর্তি লাভ করেছে। তিনি ছিলেন শেণিহীন সমাজ নির্মাণের আকাঙ্ক্ষিত রূপকার। কবিতায় সেই স্বপ্নের প্রকাশ স্পষ্ট :

চেরাগের দৈত্য এসে হাজির হবে চক্ষের নিমেষে
বলবে, হুজুর আমি কী করতে পারি আপনার জন্য হুকুম করুন।
বলবো আমাকে মুক্ত করো, [...]
ধ্বংস কর, ধ্বংস কর এই সভ্যতাকে, যার সদস্যরা
দস্যুর চেয়েও হিংস্রঃ যারা বোমা বিস্ফোরিত
করে, মর্টার চালিয়ে গ্রেনেড নিক্ষেপ ক'রে [...]
রক্তাক্ত, রক্তাক্ত করেছে আমার
এই সুন্দর পৃথিবীতে নেমে আসা স্বর্গের শিশুকে।
(আলাউদ্দিন আল আজাদ, ২০০৬ খ : ৬৩)

শ্রেণিশোষণের স্বরূপ প্রকাশ করতে স্বদেশের পটভূমিকার পাশাপাশি বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে শোষক-শোষিতের মধ্যকার দ্বন্দ্ব, বুর্জোয়া শক্তির বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের সংগ্রামী চেতনার শৈল্পিক উপস্থাপন ঘটিয়েছেন কবিতায়।

গণমানুষের প্রতিদিনের দুঃখ-দারিদ্র-বঞ্চনা-কান্না কবির কাব্য সৃজনের উপজীব্য হয়েছে। দুঃখী, দীন মানুষের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আন্তরিকতার, ভালোবাসার। স্পষ্টভাবেই তাঁর অবস্থান নিপীড়িত মানুষের পক্ষে। আজাদের অনেক কবিতাতেই দেখা পাওয়া যায় শ্রেণিবিভেদের ধাক্কায় সমাজের মূল স্রোত থেকে ছিটকে পড়া মানুষের আর্তি, অসহায় বাস্তবতার করুণাত্মক উপস্থাপন। পাশাপাশি তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা না ঘটলে সমাজের একটা বড় অংশের জীবনমানের কোনো বদল

সম্ভবপর নয়, বরং সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নে যা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক প্রভাব তৈরি করে। কবিতায় দেখি :

ছোট ভাইটির হাত ধরে এখন ঘুরে বেড়ায় পথে পথে
কখনো কাগজ কুড়ায় কখনো শুকনো পাতা কখনো ঝরা ফুল [...]
এমনি করে সে বেড়ে উঠবে বসন্তে শীতে গ্রীষ্মে বর্ষায়
ক্রমে শহরের অভিজাত বাসভবনে মষলাপেটার
কাজ পাবে
একদিন অবশ্যই বিয়ে হয়ে যাবে ওর কোনো হকার যুবকের সাথে
কিংবা ইটভাঙা মজুরের সাথে
বস্তিতে ছোট্ট খুপরি, একদিন ওর মেয়েও বকুলের মালা
বিক্রি করতে বেরুবে রাস্তায়।
(আলাউদ্দিন আল আজাদ, ২০০৬ ক : ৩৩৯)

কবি এ কথা ভেবেও চিন্তিত ও বিষণ্ন হয়েছেন যে, সমাজে যারা অবহেলিত কিংবা নিচু অবস্থানে রয়েছে, সময়ের পরিক্রমায় তাদের অবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্তন সূচিত হয় না। দুরবস্থা একটা চক্র হয়ে ঘুরতে থাকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে।

আলাউদ্দিন আল আজাদ জীবনের গভীর অবধি পৌঁছাতে চেয়েছেন। বিভাগোত্তর সময়ের নানামুখী ঘাত-প্রতিঘাত, রাষ্ট্র অন্তবর্তী ব্যক্তির আত্মসংকট, জাতিসত্তাসংকট, প্রতিরোধভাবনা তাঁর মনোলোককে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। জীবদ্দশায় তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ, ভাষা-আন্দোলন, গণজাগরণ, স্বাধীনতা সংগ্রাম, স্বৈরশাসন, দুর্ভিক্ষ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা-উত্তরণ-অবনমনের বহুমুখী চালচিত্র। দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ যন্ত্রণাকাতর সময় পরিসরের সংগ্রামমুখরতার স্পন্দন তাঁকে বুঝতে সাহায্য করেছিল শাসন-শোষণের রাজনৈতিক কার্যকারণ। তাঁর কবিতায় বিস্তৃত পরিসরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলি, রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থাপনা, রাজনীতিবিদদের কপটতা, সামাজিক সংকট ও জনতার অবস্থান ইত্যাদির রূপায়ণ ঘটেছে। বাঙালি জাতীয়তাবাদ, প্রগতিশীল সংস্কৃতিভাবনা দ্বারাও গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন তিনি। ব্যক্তি ও সমাজকে আবিষ্কারের প্রেরণা থেকে সমকালীন জীবন সংকটকে বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। রাষ্ট্র অভ্যন্তরে চলমান ক্ষমতার লড়াই কীভাবে জনতার জীবন নির্মাণে প্রভাব ফেলেছে তাঁর অনুসন্ধানে সমাজকে দেখার আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন কবি।

দেশবিভাগ-পরবর্তী সময়ে সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন আসে তা আলাউদ্দিন আল আজাদের কবিতায় সমুজ্জ্বল। ভাষা-আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামে কবি যেমন প্রত্যক্ষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন, তেমনি সমাজের রূপ ও রূপান্তরে সংলগ্ন থেকেছেন। আর তাই সময়চেতনা ও ইতিহাসভাবনা তাঁকে সমাজ সচেতন করে তুলেছে। ক্ষমতাবান শাসকগোষ্ঠী দ্বারা জনতার নিপীড়ন তাঁকে অনুধাবনে সক্ষম করেছে যে, কেবল অর্থনৈতিক মানদণ্ডেই

সমাজস্থ জনতার জীবনে বিভাজনরেখা সৃষ্ট হয় না, বরং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকাঠামোর অব্যবস্থাপনা দ্বারাও ব্যক্তি শোষণের শিকার হয়। তাঁর কবিতায় পাওয়া যায় এই দৃষ্টিভঙ্গির রূপায়ণ :

ক. ইটের মিনার ভেঙেছে ভাঙুক। একটি মিনার গড়েছি আমরা
চার কোটি কারিগর
বেহালার সুরে, রাঙা হৃদয়ের বর্ণ লেখায়।
পলাশের আর
রামধনুকের গভীর চোখের তারায় তারায়
দ্বীপ হয়ে ভাসে যাদের জীবন, যুগে যুগে সেই
শহীদের নাম
একেঁছি প্রেমের ফেনিল শিরায়, তোমাদের নামে।
তাই আমাদের
হাজার মুঠির বজ্রশিখরে সূর্যের মতো জ্বলে শুধু এক
শপথের ভাস্কর। (আলাউদ্দিন আল আজাদ, ২০০৬ ক : ৩৬)

খ. রক্ত ঝরাই দিল্লীর পথে, রক্ত ঝরে
অগ্নির মত বাঁশের কেল্লা বেদীর পরে
রক্ত ঝরাই ফাঁসির মঞ্চে দ্বীপান্তরে :
ঝরেছে সকল রক্ত। এখন ক'খানা হাড়ে
ঝকঝক করে তীব্র তীক্ষ্ণ বর্শা-ফলা :
নতুন দস্যু আসে যদি, দেশ দেবোনা তারে
ইস্পাত-হাড়ে গড়েছি বজ্র বহ্নি-জ্বালা।
(আলাউদ্দিন আল আজাদ, ২০০৬ ক : ৬৫)

ক-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে, মাতৃভাষার প্রতি গভীর মমত্ববোধ, অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে জাতির সম্মুখে উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বায়ান্নোর ভাষা-আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে নির্মিত প্রথম শহীদ মিনারটি ভেঙে ফেলার প্রসঙ্গ এবং তার প্রতিবাদে তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে দীপ্ত শপথ উচ্চারিত হয়েছে কবিতাটিতে। একুশের সকালের আন্দোলনে কবি সরাসরি অংশ নিয়েছিলেন। চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করেছিলেন একুশের প্রথম শহিদ রফিকউদ্দিনের নির্মম মৃত্যু। এছাড়াও দেখেছিলেন আবদুল জব্বার ও আবদুল বরকতের গুলিবিদ্ধ হওয়ার দৃশ্য। অতঃপর বাঙালির প্রতিবাদী চেতনা, সাম্য ও সংঘবদ্ধ শক্তির প্রতীক হিসেবে ২৩ ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয় শহীদ মিনার। ২৬ ফেব্রুয়ারি নুরুল আমিন প্রশাসনের নির্দেশে পুলিশ কর্তৃক শহিদ মিনারটি ভেঙে ফেলা হলে সমস্ত জনতার সম্মিলিত প্রতিবাদের অংশ হিসেবে আজাদ কবিতাটি রচনা করেন – শাসকের বিরুদ্ধাচরণ ও মুক্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা যার মূল সুর।

প্রায় অনুরূপ বিষয়ের অবতাড়না রয়েছে খ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে। পলাশীর রক্তঝরা ইতিহাসের অনুষঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে একুশের চেতনা। উপমহাদেশের স্বাধীনতার জন্য ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জনতার লড়াকু ইতিহাসের সমান্তরালে বিভাগোত্তর নতুন আগ্রাসী শক্তি, শোষক গোষ্ঠী ও বর্গিদস্যুদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী অবস্থানকেও চিহ্নিত করা

হয়েছে। বাঙালির সংগ্রামী শপথ ঐতহ্যবাহী ঘটনার সঙ্গে অঙ্গীভূত করে উপস্থাপিত হয়েছে কবিতায় ।

একজন রাজনীতি-সচেতন কবি হিসেবে আলাউদ্দিন আল আজাদ তাঁর সামাজিক দায়কে এড়িয়ে যেতে পারেননি। ফলে তাঁর কবিতার একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের নানামাত্রিক চালচিত্র। এই প্রবণতা আমরা লক্ষ করি, পঞ্চাশের অন্য দুই গুরুত্বপূর্ণ কবি শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬) ও হাসান হাফিজুর রহমানের (১৯৩২-১৯৮৩) কবিতায়। শামসুর রাহমান লিখেছেন *দুঃসময়ে মুখোমুখি*, *উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ*; অন্য দিকে হাসান হাফিজুর রহমানের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি *আমার ভেতরের বাঘ*। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আলাউদ্দিন আল আজাদ দেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করতেন এবং সেই সব লিখে রাখতেন ডায়রিতে। কবির বিশ্বাস ছিল, 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে জড়িয়ে আছে যে গভীর মানবিক ট্র্যাজেডি তা বাংলাদেশে মহৎ শিল্পসাহিত্যের জন্ম দেবে, এ প্রত্যাশা শুধু মনস্তাত্ত্বিক নয়, নন্দনতত্ত্বের দিক থেকেও অত্যন্ত বাস্তব।' (আলাউদ্দিন আল আজাদ, ১৯৯৯ : ১০০) কবির এই বিশ্বাসের প্রতিফলিত রূপ লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে স্বাধীনতা-উত্তরকালে; বিশেষত সত্তর, আশি ও নব্বইয়ে রচিত কবিতায়।

হাজার বছরের বাঙালি জাতির মুক্তির সংগ্রামে প্রথম সফল সশস্ত্র এক ঐতিহাসিক স্তম্ভ হলো একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি দিয়ে বাঙালির জীবনে সুখকর কোনো অভিজ্ঞতা বয়ে আনতে পারেনি। বরং স্বাধীনতার স্বপ্ন, সংবিধানের মূলমন্ত্রের অবমাননা, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যা, স্বৈরাচারী শাসনামল ইত্যাদি বাঙালির জীবন থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল সুখ, স্বস্তি ও নিরাপত্তা। প্রচলিত ঘটনাপ্রবাহকে এড়িয়ে গিয়ে কাব্যসাধনায় নিমগ্ন থাকতে পারেননি আলাউদ্দিন আল আজাদ। বৈরী রাজনৈতিক পরিবেশে জনতার অধিকার কীভাবে ভূলুণ্ঠিত হয়েছে, অপশাসনের দৌরাত্ম্যে কীভাবে সমাজ অভ্যন্তরে শ্রেণি বিভাজনের বিভেদরেখায় পিষ্ট হয়েছে সাধারণের জীবনমান, তার রূপও কবিতায় প্রকাশিত। ফলে তাঁর কবিতার দীর্ঘ পরিসরে পাওয়া যায় স্বাধীনতার নামে ঔপনিবেশিকতার ভিন্ন রূপ, অসাম্য, অনৈক্য, পাকিস্তানি ধারণার পুনরুজ্জীবন, জাতীয়তাবাদের পরাজয়, কবির মানবিক আশাবাদী জীবনাকাঙ্ক্ষার অবারিত প্রকাশ। ক্ষতবিক্ষত, বিক্ষুব্ধ স্বদেশ, জাতীয় জীবনের সংকট-সম্ভাবনা ও প্রতিবাদী চেতনাকে বিষয় করে কবি লিখলেন অসংখ্য কবিতা।

শোষণ-বঞ্চনাহীন ও শ্রেণি-বৈষম্যশূন্য একটি সাম্যবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাঙালিকে উজ্জীবিত করেছিল একাত্তরের মহান যুদ্ধে। কিন্তু যুদ্ধোত্তর সময়ে স্বাধীনতার বিরুদ্ধ শক্তির চক্রান্তে সামরিক শাসনের শোষণমূলক ও কর্তৃত্বপরায়ণ মনোভাব রাষ্ট্রে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। মৌলিক গণতন্ত্রের ছদ্মবেশে একনায়ক শাসনের শৃঙ্খলে জনতার রাজনৈতিক অধিকার নষ্ট করা হয়। পুঁজিবাদ ও সামরিক শক্তির প্রতাপে সুস্থ, সুন্দর

জীবনের পরিবর্তে ব্যক্তির জীবনে দেখা দেয় অভাব, অত্যাচার ও বিপন্নতা। জীবনযাপনের মৌলিক অধিকার বঞ্চিত জনতা ও শাসকগোষ্ঠীর মধ্যকার দ্বান্দ্বিকতা একশ্রেণির জীবনে নিয়ে আসে দুর্বিষহ যন্ত্রণা। এমনকি প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা সামাজিক সংকটে ভিনদেশ থেকে আগত সহযোগিতা পর্যন্ত প্রাপ্য হয় না এই শ্রেণির ভাগ্যে। তাদের হক দখল করে সম্পদ বেড়েছে শোষকের। সামাজিক বিপ্লবের কর্মসূচি হিসেবে সমকালের বাস্তবতার অন্তর্ভুক্ত শোষকশ্রেণির মর্মান্তিক চেহারা হাস্যরসাত্মক ভঙ্গিতে উপস্থাপিত হয়েছে কবিতায়। উদাহরণগুলো দেখে নেয়া যাক :

ক. কি গভীর ভালবাসা– আপনাদের বড় প্রিয় বস্তু আমি, বড়
আকর্ষণীয়– বিবৃতি ও বক্তৃতায় সংবাদপত্রে রোজই দেখতে পাই–
অথচ আমি কিইবা দিতে পারছি প্রতিদান, শুধু দিই উপহার
ক্ষুধা তৃষ্ণা উলঙ্গতা আশ্রয়হীনতা রোগশোকে মৃত্যু-হাহাকার
আবর্জনাস্তূপ বস্তিতে ঝাঁক ঝাঁক মাছির চেয়েও বহুল সংখ্যায়
বাড়ছি আমি, ...
নিমেষেই বেড়ে যায় অনেকের নিভৃত মুহূর্তেও সেই দুর্ভাবনা যখন ভাবেন
আমারই জন্য বরাদ্দ বিশ্বতহবিলের সিংহভাগ কোথায় হারিয়ে যায়।

খ. একি যাদু দেখলাম, হায় একি ভেল্কি
দু'দিনেই গুদামের বুকগুলো হাল্কা :
রাস্তার আশেপাশে নামে কালোরাত্রি
বস্তারা সেই ফাঁকে কাথা করে যাত্রা।
মোদের হাতের চটের থলি
খালি থাকতেই পায় আরাম :
আরাম দিলেন উজির সাহেব
বেঁচে থাকুক তাহার নাম।
(আলাউদ্দিন আল আজাদ, ২০০৬ ক : ৫৮)

ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাধ্যমে সমাজসত্য উন্মোচন আলাউদ্দিন আল আজাদের কবিতার একটি বিশেষ ভঙ্গি। ঠাট্টা রসিকতার ছলে তিনি কবিতায় উন্মোচন করেছেন এমন সব ঐতিহাসিক সত্যকে, যা বাঙালির জীবনে চলমান শ্রেণিশোষণ ও ক্ষমতার চক্রান্তে নিষ্পেষিত মানবাত্মার অসহায় বাস্তবতার উপস্থাপনকে নিশ্চিত করেছে ।

একজন সৎ, কর্তব্যনিষ্ঠ রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে আজাদ কবিতায় সুস্থ, সুন্দর ও কল্যাণময় প্রকাশকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি ছিলেন বাস্তব জীবনের ভাষ্যকার। দেশমাতৃকার প্রতি দায়বদ্ধ কবি রাষ্ট্রকাঠামোর উপরিতলের বাস্তবতার পাশাপাশি ভেতরতলের গভীরতর সত্যগুলোতেও অবলীলায় আলোক নিক্ষেপ করেছেন। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিরাজমান অসাম্য, অন্যায় শোষণ-শাসন তাঁকে বিপ্লবী করে তুলেছে। রাষ্ট্রনেতাদের অনৈতিক কর্মকাণ্ড ও মিথ্যা প্রতিশ্রুতির কথা তিনি তুলে এনেছেন অকপটে। ভাষা হয়েছে তীক্ষ্ণ, তির্যক ও বস্তুতান্ত্রিক। *লেলিহান পাণ্ডুলিপি* কাব্যের 'দুর্ভিক্ষ' কবিতায় পাই :

আবার দুর্ভিক্ষ হবে সামনের

ভাদ্র আশ্বিন মাসে [...]
বিপ্লবী নেতারা বিবৃতি দেবেন
গণজমায়েত গরম বক্তৃতা; [...]
যথেষ্টই আছে ভাত কাপড়ের মওজুদ
অন্তত গোপন গুদাম ঘরে :
কিন্তু দ্বারে দ্বারে ধর্ণা দাও
পাবে না সত্য, ন্যায়
নিরাপত্তাকে–
শান্তির বড়ই দুর্ভিক্ষ।
(আলাউদ্দিন আল আজাদ, ২০০৬ ক : ১৬৯)

অশুভ শক্তির চক্রান্ত স্বাধীন বাংলার বুকে এনে দিয়েছিল পরাধীনতার শৃঙ্খল। মৌলিক চাহিদার নিশ্চয়তাহীন জীবনে মানুষ হারিয়ে ফেলেছিল বাঁচার আনন্দ। জীবন ও জীবিকার হুমকিতে আক্রান্ত মানবাত্মা থেকে মানবিক মূল্যবোধগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। স্বাধীনতার বিরুদ্ধশক্তির অপতৎপরতায় অনেক নিরপরাধ সাধারণ মানুষও পরিণত হয়েছিল জেলফেরত দাগি আসামী হিসেবে। আত্মীয়, বন্ধু, পরিজন থেকে ছিটকে গিয়ে পরিণত হয়েছিল নিসঃঙ্গ মানুষে। ক্ষমতাবানের সঙ্গে ক্ষমতাহীনের লড়াইয়ে পরাস্ত মানুষের অসহায় বাস্তবতার খোঁজ জানিয়ে আজাদ লিখেছেন :

আমিও মাস্তান, মা'য়ের কান্নাভরা চোখের প্রশ্রয়ে
ক্রুদ্ধ বাবার কথায় কান দিই না–
কিন্তু তিনি একটু আগেই আমার সামনে দাঁড়িয়ে তর্জনী তুলে
সোজা বলে দিয়েছেন রক্তচক্ষু মেলে, এক্ষুণি বেরিয়ে যাও
বাসা থেকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চডিগ্রি নিয়েও, তিন বছরেও
যখন একটা চাকরী জোগাড় করতে পারলেনা
তখন এখানে আর গিলতে এসোনা।
আমি পরিত্যক্ত, একান্ত নিঃসঙ্গ।
(আলাউদ্দিন আল আজাদ, ২০০৬ ক : ৩৪৪)

কবির সমকালীন বাংলাদেশের সমাজ-সংকটের সামগ্রিক একটা রূপরেখা অঙ্কিত হয়েছে কবিতায়।

আলাউদ্দিন আল আজাদের কবিতার শ্রেণিচেতনা প্রেমভাবনাকেও আচ্ছন্ন করেছে। তাঁর কবিতায় প্রেম অজানা উৎস থেকে জাগ্রত কোনো অনুভব নয়, বরং প্রেমকে তিনি বিবেচনা করেছেন সমাজ-সংসার ও রাষ্ট্রনীতির অন্তর্ভুক্ত করে। প্রেমের রোমান্টিকতার সঙ্গে সমাজচেতনার সমন্বয় ঘটিয়েছেন কবিতায়। বস্তুতান্ত্রিক চিন্তাচেতনার আলোকে প্রেমকে অনুভব করেছেন বলে তা হয়েছে মানবিক ও জাগতিক। প্রেম ও বিপ্লবকে তিনি পরস্পরের পরিপূরক করে উপস্থাপন করেছেন কবিতায়। জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত নিজস্ব দার্শনিক অভিব্যক্তি প্রকাশে প্রেমকে আশ্রয় করেছেন। তেমনই একটি উদাহরণ হলো, 'জুলায়খা', 'ইউসুফ/ যখন এ অধমকে ভালোবেসেছেন তাই বলি :/ স্বাধীনতা, স্বাধীনতা ছাড়া আমার নিকট অন্য/ সব অর্থহীন; অর্থহীন বাঁচা জীবন

যৌবন/ অর্থহীন এ জগৎ, অর্থহীন প্রেম-অশ্রুজল।' (আলাউদ্দিন আল আজাদ, ২০০৬ ক : ৯৭)

আজাদের কবিতায় জীবনের জটিল, সূক্ষ্ম সব অনুভূতিকে প্রেমের আশ্রয়ে তুলে ধরার প্রচেষ্টা লক্ষ্যযোগ্য। ব্যক্তিগত অনুভবের পরিধি ভেঙে তার ভেতর গেঁথে দিয়েছেন সমাকালভাষ্য। চলমান জীবন, যন্ত্রণাময় জীবন-সংকটের সঙ্গে মিশে গিয়েছে কবির প্রেমসত্তা। প্রেমের কবিতার আড়ালেও অস্থিরতা আক্রান্ত সমকাল-পৃথিবীর করুণ ভাষ্য নির্মিত হয়েছে কবিতায় :

আমার প্রেয়সী নয়া সড়কের ওপারে জাগে
হাতে শাঁখা নেই, পোড়া ধানশিস, আকুল সিঁথি
চৈত্রের ঝড়ে হারায়েছি যেই বাস্তুভিটা
তারি খড়কুটো খুঁজছি দু'পাশে দিকশূন্য।
দেখা হবে জানি, রাত্রিশেষের সকালে ধ্রুব
মিছিলের মাঝে নতুন সূর্যোদয়ের পথে।
(আলাউদ্দিন আল আজাদ, ২০০৬ ক : ২৮)

প্রেমের রোমান্টিকতার সঙ্গে সমাজচেতনার সমন্বয় ঘটেছে আজাদের কবিতায়। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রেমের সঙ্গে বাস্তবের লড়াই-সংঘাত, টানাপড়েনে প্রেমিকাকে কেবল কামনার বস্তু করে ভাবেননি তিনি। কবির প্রেমিকা তাঁর মিছিলের সঙ্গী। নতুন সমাজ ও দেশ নির্মাণের স্বপ্নে নারীকে দেখেছেন সহযোগী হিসেবে, 'হঠাৎ আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম/ বিস্মিত হলাম :/ বহুদিন ফেলে-আসা সেই পরিচিত মুখ।/ দেখলাম, সে তুমি/ তুমি/ তোমার দেহের নরম কাঠামো ভেঙ্গে তুমিও নেমে এসেছো।' (আলাউদ্দিন আল আজাদ, ২০০৬ ক : ৩৪) আজাদের কবিতায় প্রেমভাবনা নারীপ্রেমের ক্ষুদ্র গণ্ডি পেরিয়ে পৌঁছে গিয়েছে মানবপ্রেমের বৃহত্তর সীমানায়। 'প্রফাইল' নামক কবিতাটিতে প্রেমাকুতির সমান্তরালে শান্তি ও মানবতার লড়াইয়ে কবি নিজেকে উৎসর্গ করেছেন :

তোমার মাঝে আমার পূর্ণতা যখন দেখেছি
তখন তোমাকে পূর্ণ করেই চাই।
তার আগে যতক্ষণ বেঁচে আছি একমাত্র প্রতিজ্ঞা জানাই :
এ জৈবিক দেহকে করব দুর্জয় প্রতিরোধের শিবির।
সারা পৃথিবীতে
উদ্দাম শান্তির আগে
আমার শান্তি নেই।
(আলাউদ্দিন আল আজাদ, ২০০৬ ক : ২৯)

একান্ত ব্যক্তিগত উপলব্ধির নিঃসরণ দিয়ে কবিতায় ধারণ করেছেন চিরায়ত মানব উপলব্ধির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশকে, যা আজাদের গভীর প্রজ্ঞা ও মননের ফসল।

কবি হিসেবে আলাউদ্দিন আল আজাদের মূল সাধনাই ছিল মানুষের কল্যাণসাধন, অসাম্য ও শোষণ-নিপীড়নহীন সমাজব্যবস্থার গুরুত্ব উপস্থাপন ও প্রতিষ্ঠা। পৃথিবীর

নির্যাতিত জনগণ বিপ্লবী রাজনীতির মাধ্যমে পুঁজির মালিক, লুণ্ঠনকারী, সাম্রাজ্যবাদী, ভণ্ড রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে – এমন প্রত্যাশাই ঝলসিত হয়েছে কবিকণ্ঠে। এ ব্যাপারে তিনি কল্পনাবিলাসী নন; অপশাসন ও দুঃশাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি উপস্থিত হয়েছেন সৈনিকরূপে :

আমি উপস্থিত
সশস্ত্র যুবক
অস্ত্র আমার ভালোবাসা
অস্ত্র আমার সাম্যমৈত্রী
অস্ত্র আমার স্বাধীনতা
আমি শক্ত, রক্তবীজ
চিরমৃত্যুঞ্জয়–
মত্ত রাক্ষসের মতো পৃথিবীকে আপনারা
আর চিবোতে পারবেন না।
(আলাউদ্দিন আল আজাদ, ২০০৬ খ : ৩০)

তীব্র স্বাদেশিকতার বোধ এবং নিরুপদ্রব শান্তিময় পৃথিবী নির্মাণ – কবিতায় এই দুই আবেগকে যথাযথভাবে ধারণ করেছেন কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ। কবিতায় শ্রেণি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বজনীন মঙ্গল কামনা করেছেন তিনি। তাঁর কবিতায় প্রতিফলিত সমাজভাবনার স্বরূপ প্রসঙ্গে সমালোচক জানান, 'আলাউদ্দিন আল আজাদের ক্রমঅগ্রসরমাণ সমাজচেতনা সুস্পষ্ট মার্কসবাদী চারিত্র্যে ক্রমরূপান্তরিত হয়েছে।' (দিলারা হাফিজ, ২০০২ : ৮১) মার্কসীয় চেতনা, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রতি আস্থাশীলতা তাঁর কাব্যভাবনাকে প্রভাবিত করেছে। তাই বলে কোনো সুনির্দিষ্ট তত্ত্ব বা মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করায় তৎপরতা দেখাননি তিনি। কবিতায় কোনো বিশ্বাসকেই চূড়ান্ত সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠাও দেননি। কারণ, তিনি বিশ্বাস করতেন যে, একজন কবির অভিজ্ঞতা 'স্বাধীন প্রেরণাজাত' না হলে কোনো সফল শিল্পকলার জন্ম সম্ভবপর নয়। তাই তাঁকে পুরোপুরি মার্কসবাদী কবি হিসেবে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা যায় না, যেমনটা দীনেশ দাশ (১৯১৩-১৯৮৫) বা ফয়েজ আহমদ ফয়েজকে (১৯১১-১৯৮৪) বলা হয়। সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে গিয়ে কবিতায় সুস্থ প্রগতিশীল মানবিক উপলব্ধির প্রকাশ হিসেবে সর্বজনীন মানবতাবাদের প্রতিষ্ঠাকেই অধিক গুরুত্বারোপ করেছেন কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ।

পঞ্চাশের দশকের শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, আল মাহমুদ (১৯৩৬-২০১৯), আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (১৯৩৪-২০০১) প্রমুখের কবিতায়ও আমরা এই সর্বজনীন মানবতার বোধ লক্ষ করি। তাঁরাও মধ্যবিত্তের শ্রেণি অবস্থান সম্পর্কে সচেতন। কিন্তু শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান ও আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ শ্রেণিচেতনাকে শ্রেণি-রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত করেন নি। কবিতার বিষয় ও ভাব নির্মাণে রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রত্যক্ষ সহায়তা নেন নি।

তাঁরা প্রধানত জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকে মুখ্য উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এ সূত্রে আমরা উল্লেখ করতে পারি শামসুর রাহমানের *বন্দি শিবির থেকে*, হাসান হাফিজুর রহমানের *বিমুখ প্রান্তর* এবং আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর *সাতনরী হার*, *আমি কিংবদন্তির কথা বলছি* কাব্যের প্রসঙ্গ। অবশ্য আল মাহমুদ জীবনের এক বিশিষ্ট পর্বে মার্কসবাদী রাজনীতি ও জাতীয় চেতনাকে সমান্তরাল স্রোতে প্রবাহিত করেছিলেন; এর প্রতিফলন ঘটেছে *সোনালি কাবিন* কাব্যগ্রন্থে। পরবর্তী কালে সে ধারা থেকে তিনি সরেও এসেছিলেন।

অন্য দিকে আলাউদ্দিন আল আজাদ বরাবরই মার্কসবাদী রাজনীতি ও মতাদর্শ দ্বারা চালিত। তাঁর কবিতা ধারণ করে আছে দেশ ও জনতাকে। তাঁর কাব্যজগতের দিকে দৃষ্টি ফেরালে এটা লক্ষ্যযোগ্য হয় যে, স্বদেশের ও বিশ্বের অধিকার বঞ্চিত জনগণের মুক্তির জন্য শ্রেণি-বৈষম্যহীন সুষম বণ্টন ব্যবস্থার একটি সমাজ বিনির্মাণের ঐকান্তিক প্রত্যাশা আপন ভঙ্গিতে ব্যক্ত করেছেন। এমনকি প্রেম, রোমান্টিকতা, স্বপ্ন ও সৌন্দর্যবোধ উৎসারিত অনেক কবিতায়ও তিনি সংগ্রামী চেতনাসমৃদ্ধ সমাজভাবনা ও বাস্তবতাবোধের প্রকাশ দেখিয়েছেন। কাব্যশরীরে এঁকে দিয়েছেন সমকালের সামাজিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংকটের সামগ্রিকতার প্রতিচ্ছবি। সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নির্যাতিত, বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত জনগণের প্রতি তীব্র সমর্থন, একাত্মতা, প্রতিবাদ ও আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন কবিতায়। এছাড়াও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম, বিকাশ ও বিস্তৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি ও কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সরাসরি জড়িত থাকার কারণে জনগণ, জনমানস ও জনসমাজের অন্তর্গত স্রোতকে অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও শিল্পসম্মত ভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন। তাঁর রাজনীতিভাবনা ও শ্রেণিচেতনার মূলে রয়েছে মঙ্গলচেতনা, সামাজিক ন্যায়বিচার, সাম্য, মানবমুক্তি ও মানবতার প্রতি দায়বোধ। কবিচৈতন্যে বিরাজমান এই লক্ষ্য ও চেতনাপ্রবাহ কবি আলাউদ্দিন আল আজাদকে বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান ও প্রতিনিধিত্বশীল কবিপ্রতিভা হিসেবে স্বীকৃত করে তুলেছে।

টীকা

১. মার্কস প্রবর্তিত 'ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী' মতবাদ অনুসারে, মানব সমাজের সকল কিছু অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ইতিহাস নির্ধারিত হয় সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারাই। অর্থাৎ, মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদ হচ্ছে ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা। মার্কসবাদীদের মতে, উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক (mode of production) পরিবর্তন হলে সমাজ কাঠামোর (social structure) পরিবর্তন হয়, আর এর ফলে পরিবর্তন আসে উৎপাদন সম্পর্কে (production relation)। যার অনিবার্য পরিণাম হিসেবে ইতিহাসের পরিবর্তন সূচিত হয়।

সহায়ক গ্রন্থ

অণিল মুখার্জি (১৯৮৭)। *সাম্যবাদের ভূমিকা*। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা।

আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৯৯)। *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*। গতিধারা, ঢাকা।
___________________(২০০৬ ক)। *কবিতাসমগ্র ১*। গতিধারা, ঢাকা।
___________________(২০০৬ খ)। *কবিতাসমগ্র ২*। গতিধারা, ঢাকা।
কাজী নজরুল ইসলাম (২০১৯)। *সঞ্চিতা*। কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
দিলারা হাফিজ (২০০২)। *বাংলাদেশের কবিতায় ব্যক্তি ও সমাজ*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯১)। *উপন্যাস রাজনৈতিক*। র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা।
প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯৯৪)। *শ্রেষ্ঠ কবিতা* [সম্পা. আবদুল মান্নান সৈয়দ]। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা।
ফিশার, আর্নেস্ট (২০২৩)। *মার্কস আসলে যা বলেছেন* [অনু. জাভেদ হুসেন]। সংহতি, ঢাকা।
বশীর আল-হেলাল (১৯৭৫)। *সাম্প্রতিক কবি ও সাম্প্রতিক কবিতা*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
বিষ্ণু দে (১৯৫৯)। *কবিতাসমগ্র ১*। আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা।
সিকদার আবুল বাশার [সম্পা.] (২০০৩)। *আলাউদ্দিন আল আজাদ জীবন সাহিত্য*। বাতায়ন প্রকাশন, ঢাকা।
সুকান্ত ভট্টাচার্য (২০০৫)। *ছাড়পত্র*। বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা।
সুভাষ মুখোপাধ্যায় (২০০৮)। *পদাতিক* [সম্পা. ড. মাহবুবুল হক]। অবসর, ঢাকা।
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৩৬৩ ব.)। *স্বপ্ন থেকে বাস্তব*। চক্ষুসা কান, বাক, কলকাতা।
Marx, Karl and Fredrick Engels (1906). *MANIFESTO of THE COMMUNIST PARTY*. Charles H. Kerr & Company, Chicago.

সহায়ক প্রবন্ধ

সুমিতা চক্রবর্তী (১৯৯২)। 'মার্কসীয় চেতনা ও বাংলা কবিতার প্রগতিশীল ধারা'। *বাংলার সংস্কৃতিতে মার্কসবাদী চেতনার ধারা* [সম্পা. ধনঞ্জয় দাস]। অনুষ্টুপ, কলকাতা।
হুমায়ূন মালিক (২০১৫)। 'কবিতায় গণমুখিতা ও আলাউদ্দিন আল আজাদ'। *কালি ও কলম*, ঢাকা, এপ্রিল ২০১৫
https://www.kaliokalam.com/%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%96%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A6%BF-%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A6%BE/

সহায়ক দৈনিক পত্রিকা

আবুল হোসেন (৪ জুলাই ২০১৪)। 'জীবন-অভিজ্ঞতার নির্যাসই কবিতা'। সাক্ষাৎকার গ্রহণ : জুনান নাশিত। সম্পাদক : তাসমিমা হোসেন। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা।

জিয়াহায়দারের নাট্যনিরীক্ষা

সাদ্দাম হুসাইন*

সারসংক্ষেপ

সৃজনশীল চিন্তাচেতনা ও মননধর্মী নাট্যপ্রয়াসে জিয়া হায়দারের (১৯৩৬-২০০৮) রয়েছে ভিন্নমাত্রিক দক্ষতা। নাট্যতত্ত্বের জটিল গ্রন্থি-উন্মোচন ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে তিনি ছিলেন নিরীক্ষাধর্মী। তিনি নাটকের ক্ষেত্রে নির্দেশকের ভূমিকা, অভিনয়-ক্ষমতা, সংলাপের মৌলিকত্ব ও ভাষাগঠনে সম্পূর্ণ নিজস্ব ভঙ্গির যে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন, তা বাংলাদেশের নাটকে ভিন্নতার আভাস। নাটকের বিষয় ও প্রকরণ নিয়ে নানামাত্রিক নিরীক্ষায় নিয়োজিত ছিলেন তিনি। যে নিরীক্ষার দুটি উৎকৃষ্ট-দৃষ্টান্ত– *শুভ্রা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ* এবং *এলেবেলে*। নাটকদ্বয়ে তিনি পাশ্চাত্যের নাট্যপ্রকরণকে কীভাবে স্বসময় ও স্বদেশের বাস্তবতার নিরীক্ষে কতটা যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন করেছেন, তা পাঠ-বিশ্লেষণ, বর্ণনামূলক, তুলনামূলক এবং ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে দেখানো হয়েছে।

১.

‘কবি জিয়া হায়দার’ আর ‘নাট্যকার জিয়া হায়দার’– এরা দুজন আলাদা সৃষ্টিশীল মানুষ। যেন দুজন জিয়া হায়দার আলাদা রক্ত-মাংস ও ব্যক্তিত্বে তৈরি– যারা ভিন্ন ভিন্ন স্রোতের ভেতর দিয়ে পৃথক অভিজ্ঞতা ও অভিঘাতে অবগাহিত হয়ে এসে উঠেছেন দুটো ভিন্ন ঘাটে। যার একটায় ‘কবিতা’ এবং অপরটায় ‘নাটক’। বোধহয় এভাবেই ‘কবি ও নাট্যকার’ জিয়া হায়দার দ্বিখণ্ডিত হয়ে যান আমাদের অজান্তেই। সর্বোপরি এই দুটি সত্তার নিক্তিনৈতিকতায় ‘নাট্যকারসত্তা’টাই অধিক ওজোস্বী ও তেজোস্বী। কেননা, তিনি ছিলেন নাট্য-অনুবাদক, নাট্যনির্দেশক, প্রযোজনা-অধিকর্তা, নাট্যপ্রবন্ধকার, নাট্যসংগঠক ও নাট্যশিক্ষক। আমেরিকার হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইস্ট-ওয়েস্ট সেন্টার থেকে নাট্যকলা বিষয়ে তিনিই দেশের প্রথম এমএফএ। এছাড়া তিনি নাট্যকলা বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা নিয়েছেন কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি, নিউইয়র্ক; বার্মিংহাম ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য শেক্সপিয়র থিয়েটার; গোয়েটে ইন্সটিটিউট ফেলোশিপ (জার্মানি) থেকে। ফলে তিনি অনায়সেই লিখেছেন– পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত *থিয়েটারের কথা*। যেখানে তিনি কেবল স্বল্পজ্ঞাত নানা তথ্যই সন্নিবেশ করেননি, বরং সকল তথ্য ব্যাখ্যা-ভাষ্যের মাধ্যমে নিজের আলোকসঞ্চারী প্রতিভার সাক্ষ্য রেখেছেন। কার্যত, নাট্যবিষয়ক বিপুল জ্ঞান ও বিস্তর প্রত্যক্ষ-পাশ্চাত্য অভিজ্ঞতা জিয়া হায়দারকে গতানুগতিকতা বর্জিত ব্যতিক্রমী নাট্যভাবনায় উন্নীত করে। তিনি হয়ে ওঠেন ‘নিরীক্ষাপ্রবণ নাট্যকার’। যে নিরীক্ষার দুটি উৎকৃষ্ট-দৃষ্টান্ত– *শুভ্রা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ*এবং *এলেবেলে*। প্রসঙ্গত, তাঁর অধিকাংশ নাটকে নিরীক্ষাপ্রবণতা পরিলক্ষিত হলেও উল্লিখিত দুটি নাটকে

---

*ড. সাদ্দাম হুসাইন : প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়, নেত্রকোণা

এই নিরীক্ষা অধিক প্রবল বিধায় এখানে কেবল দুটি নাটক সমালোচনা-দৃষ্টিতে বিশ্লেষণের মাধ্যমে পাঠযোগ্য করার প্রয়াস পাওয়া গেছে।

২.

ইউরোপীয় নাট্যছাঁচে এবং ভাষার ধাঁচে রচিত নাট্যকার জিয়া হায়দারের সর্বপ্রথম নাট্যপ্রয়াস *শুভ্রা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ*। দুই অঙ্ক বিশিষ্ট নিরীক্ষাধর্মী এবং প্রতীকী এই নাটকটির রচনাকাল ১৯৬৯ সাল। এ-বছরের সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে বাংলা একাডেমিতে আয়োজিত একটি ঘরোয়া সভায় নাট্যকার নাটকটি পাঠ করেন। পাঠশেষে অনেকে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি নাট্যকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অভিমত দেন। তাঁদের কিছু কিছু অভিমত তিনি সাদরে গ্রহণ করে নাটকের প্রয়োজনীয় অংশ পরিবর্তন এবং সংশোধন করেন। মঞ্চের জন্য লেখা নাটকটি মঞ্চায়নের আগেই ঢাকা বেতারে অভিনীত হয় এ-বছরের এপ্রিলের সাতাশ তারিখে। এরপর ১৯৭০ সালে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয়। নাটকটি লেখার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে নাট্যকার বলেন :

> ১৯৬৭-এর অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রগতিশীল ছাত্র সংস্থা SDS নিউইয়র্কের কলাম্বিয়া য়ুনিভার্সিটিতে ভিয়েতনাম-যুদ্ধ বিষয়ে একটি র‌্যালী ও সেমিনারের আয়োজন করে। সেই সেমিনারের মূল শ্লোগান ছিলো বিশ্বব্যাপী শান্তি। শ্রোতা হিসেবে যেখানে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিলো। সেমিনার শেষে আমরা ক'জন ছাত্রছাত্রী আড্ডা দিতে বসে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করি। সে আলোচনায় পৃথিবীতে কোনোদিন শান্তি আসেনি এবং আসবেও না– এ-ধরনের একটি মন্তব্য নিতান্তই হালকাভাবে আমি করেছিলাম। আমার মন্তব্যের সূত্র ধরে ধর্মতত্ত্ব বিষয়ের একজন ছাত্রী শান্তি শব্দটি স্রেফ Myth—এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর অভিমতটি আমার চিন্তাকে আলোড়িত করে; এবং পরবর্তী দু'মাসের ভেতরে আমি বর্তমান নাটকটির প্রাথমিক খসড়া তৈরী করি। অবশেষে ১৯৬৯-এর সেপ্টেম্বরে বর্তমান রূপ নিয়ে নাটকটি শেষ হয়।[১]

উপর্যুক্ত অংশের 'শান্তি শব্দটি স্রেফ Myth—' মন্তব্যটি বিশেষ মনোযোগ দাবি করে। কারণ, পৃথিবীতে কখনোই চিরশান্তি আসেনি। এসে থাকলেও তা ক্ষণিকের মতো আলো বিকিরণ করে চলে গেছে দূরে! ধর্মন্থগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ঈশ্বর জগতে শান্তি আনায়নের প্রয়োজনে কখনো স্বয়ং নিজেই এসেছেন স্বর্গভূমি ত্যাগ করে, কখনোবা পাঠিয়েছেন নবি-রাসুল-অবতার। *কোরানের* সুরা নহলের ৩৫ সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছে, 'এবং সত্যসত্যই আমি প্রত্যেক মণ্ডলীর প্রতি প্রেরিতপুরুষ প্রেরণ করিয়াছি।'[২]তাছাড়া এ-সুরার ৬২ সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছে, 'ঈশ্বরের শপথ, সত্যসত্যই আমি তোমার (নবি মুহাম্মদের) পূর্বে মণ্ডলী সকলের প্রতি তত্ত্ববাহকদিগকে প্রেরণ করিয়াছিলাম।'[৩]কেন? কারণ, আল্লাহ জগতে শান্তিপ্রতিষ্ঠার নিমিত্তেই যুগে যুগে অসংখ্য প্রেরিতপুরুষ তথা নবি-রাসুল প্রেরণ করেছিলেন। *শ্রীমদ্ভগবদগীতার* চতুর্থ অধ্যায়ের ৭ ও ৮ নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে : যে যে সময়ে পৃথিবীতে ধর্মের গ্লানি বা অধঃপতন হয়; সেই সেই সময় আমি (ঈশ্বর) নিজেকে সৃষ্টি করি। সাধুদের পরিত্রাণ, পাপীদের বিনাশ এবং ধর্মকে

পুনরায় প্রতিষ্ঠা করতে যুগে যুগে আমি অবতীর্ণ হই।[৪] এ থেকে বোধগম্য হয় যে, জগতে শান্তিপ্রতিষ্ঠার জন্যে ঈশ্বর সর্বদা সচেষ্ট। অর্থাৎ একজন নবি বা অবতার জগতে আসলেন, যাবতীয় অপকর্ম দূর করলেন, অশুভ শক্তি বিনাশ করলেন– সর্বোপরি প্রতিষ্ঠা করলেন কিছু নতুন নিয়ম-কানুন-বিধান। ফলে জগতে কিছু দিনের মতো শান্তি আসল। কিন্তু তাঁদের তিরোধানের পরমুহূর্তেই জগত যে অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থায় ফিরে যেতে লাগল। অর্থাৎ অশান্তির অশুভ ছায়া জগতে পুনরায় পড়তে শুরু করল। এজন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জগতে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, কৃষ্ণ অবতার গ্রহণ করে অসুর বিনাশ করেছেন এবং তিরোহিত হয়েছেন। ইসলাম ধর্মের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, নবি মুহাম্মদের জন্মের আগে আরবের অবস্থা খুব খারাপ ছিল, যাকে বলা হলো 'আইয়ামে জাহেলিয়া' বা 'অন্ধকার যুগ'। তিনি আসলেন, আরবের অবস্থা দেখলেন, 'অন্ধকার' দূর করলেন অতঃপর তিরোধান করলেন। কিন্তু তাঁর তিরোহিতের দিন থেকেই শুরু হলো অশান্তি! তাঁর লাশ কবরস্থ করা বাদ দিয়ে কে সিংহাসনে বসবে তা নিয়ে শুরু হলো মাথাব্যথা! অর্থাৎ আবার অশান্তির সূচনা। এ-কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হলো– ধর্মতত্ত্ব বিষয়ের একজন ছাত্রীই তো নাট্যকারকে বলেছিলেন, 'শান্তি শব্দটি স্রেফ Myth'। সেই ছাত্রী ধর্মের এ-বিষয়গুলো ভালোভাবেই জানতেন বলেই এমন 'যথার্থ' কথা বলতে পেরেছিলেন। যা নাট্যকারকে বিশেষভাবে আলোড়িত করেছিল এবং যার প্রেক্ষিতেই নাট্যকার লেখেন তাঁর এ-নাটকটি।

ষাটের দশকে নাটকটি লেখা। বস্তুত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ষাটের দশক ছিল এক ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ দশক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫) সবেমাত্র শেষ হয়েছে। তার ক্ষত তখনো শুকায়নি। দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে বিভিন্ন দেশে। এছাড়া তখন ঔপনিবেশিকতা, সামন্ত জমিদার ও পুঁজিবাদবিরোধী তথা এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার মুক্তিকামী মানুষের এক সর্বাত্মক লড়াই চলছে। অন্যদিকে চলছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বব্যাপী আধিপত্য বিস্তারের এক অব্যাহত প্রচেষ্টা।[৫] অর্থাৎ বিশ্বময় তখন বিরাজ করছে অস্থির অবস্থা– যে অবস্থাকে নাট্যকার চিত্রিত করেছেন সংবাদপত্রের শিরোনামের ভাষায় :

> সুন্দর : বৈরুতে ইসরাইলী হামলা... পোলাণ্ডে সলিডারিটি... পারমাণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে... ইরান ইরাক যুদ্ধ... কাবুলে মুজাহিদ বাহিনী... গৃহবধুর আত্মহত্যা... দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি...[৬]

১৯৭০ সালে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত নাটকে 'পত্রিকার শিরোনাম' সংক্রান্ত কোনো প্রসঙ্গ ছিল না। মূলত তিনি অগাস্ত বোয়াল (১৯৩১-২০০৯) এর Newspaper Theatre দ্বারা প্রভাবিত হয়েই দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯৮৫) 'পত্রিকার শিরোনাম' সংযুক্ত করেন। কারণ, এই শিল্পপ্রকরণের মাধ্যমে দেশের এবং বিশ্বের অস্থির অবস্থার সত্যকার মর্মার্থ দর্শকের সামনে খুব সহজেই উপস্থাপন করা

সম্ভবপর ছিল। জিয়া হায়দার অগাস্ত বোয়ালের Newspaper Theatre সম্পর্কে বলেন :

> বোয়াল ব্রাজিল থেকে বহিষ্কৃত হবার আগে এরেনা থিয়েটারের কার্যক্রমে নিউজপেপার থিয়েটারের বিকাশ ঘটান। দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত ও অন্যান্যসূত্রে পাওয়া সংবাদগুলি নিয়ে নাট্যিক পারফরমেন্স করা হতো। এর টেকনিকও খুব সহজ। সংবাদগুলির পরিবেশনা এমনভাবে পরিকল্পিত হতো যাতে সেগুলির সত্যকার মর্মার্থ শ্রোতা অনুধাবন করতে পারে।[৭]

এ-নাটকে 'পত্রিকার শিরোনাম' সংযুক্তির মাধ্যমে বোয়াল প্রদর্শিত 'সহজ টেকনিক'ই গ্রহণ করেছেন নাট্যকার। ফলে পাঠক বা দর্শক খুব সহজেই ষাটের দশকের আন্তর্জাতিকমহলের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ অবস্থা সম্পর্কে জানতে সক্ষম হয়। উল্লেখ্য যে,এই উত্তাল ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ দশকে আমাদের দেশের পরিস্থিতিও ছিল ভয়ানক। ১৯৬৪ সালের ১ অক্টোবর থেকে ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত *দৈনিক আজাদ* পত্রিকায় যে সংবাদগুলো প্রকাশিত হয়েছিল তার মধ্যে জনসাধারণের ওপর সরকারের বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন ও নিপীড়ন বিষয়ক সংবাদই ছিল সবচেয়ে বেশি। এসময় শতকরা প্রায় ৫২ ভাগ খবর ছিল প্রত্যক্ষভাবে সরকার-বিরোধী। রাজনৈতিক মামলা আর প্রশাসনিক আমলা বিষয়ক সংবাদগুলোও মূলত সরকার-বিরোধী। কেননা আমলাদের সংবাদ বলতে আসলে তাদের অগণতান্ত্রিক আচরণ আর অপকর্মকেই বুঝাত। আর রাজনৈতিক মামলাগুলো প্রত্যক্ষভাবে আইয়ুব সরকারের নিপীড়নমূলক কার্যকলাপের সাক্ষ্য বহন করত।[৮] তখন দেশে গণঅভ্যুত্থান শুরু হয়েছে। জেগে উঠেছে দেশের সাধারণ মানুষ। প্রত্যন্ত গ্রামগঞ্জ থেকে, হাটবাজার থেকে, কলকারখানা থেকে, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অসংখ্য মানুষ জড়ো হয়েছে ঢাকার রাজপথে। শুরু হয়েছে আইয়ুব-বিরোধী গণআন্দোলন। অর্থাৎ এদেশেও তখন বিরাজ করছে অস্থির অবস্থা– যে অবস্থাকে নাট্যকার সুবর্ণগ্রাম জাংশান স্টেশনের 'ওয়েটিং রুম' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং প্রতীকী ভাষায় চিত্রিত করেছেন তার প্রকৃত রূপ :

> কল্যাণী : বাথরুমে পানি নেই, দেয়াল আর ছাদ জুড়ে আরশোলা...
>
> সুন্দর : মাকড়সাও আছে।
>
> কল্যাণী : মাকড়সা!
>
> সুন্দর : এই দেখো, দেয়ালের কোণায়, অন্য কোণাতেও নিশ্চয়ই আছে।
>
> আনন্দ : (ঘরের অন্য কোণায়) এ কোণায় মাকড়সার জালে একটা আরশোলা আটকে মরে রয়েছে।
>
> সুন্দর : (বলতে বলতে টেবিলের দিকে এগোয়) তাহলে দাঁড়ালো, পানিহীন বাথরুম, অজস্র আরশোলায় ভরানো আর মাকড়সার জালে জড়ানো সুবর্ণগ্রাম নামের এই জাংশান স্টেশনের ওয়েটিং রুমে আমরা চারজন শান্তিগড়ের যাত্রী।[৯]

সুবর্ণগ্রাম জাংশান স্টেশনের এই নোংরা 'ওয়েটিং রুম'ই ষাটের দশকের ক্লেদাক্ত সময়। এখানে সুবর্ণগ্রাম পাকিস্তান-অধীন বাংলাদেশ। যেখানে একসময় সোনার

ফসল ফলত। যা দুশো বছরের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ এবং পাকিস্তানি নব্য ঔপনিবেশিক শাসন-বঞ্চনার কারণে 'ওয়েটিং রুমের' দশায় পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ রুম আছে কিন্তু তা অবস্থানযোগ্য নয়। এমন পরিস্থিতিতে এদেশের মানুষ 'শান্তিগড়ে' পৌঁছাতে চায় এবং যেখানে যাওয়ার জন্যেই তাদের অনন্তকাল ধরে প্রতীক্ষার প্রহর গুণে চলা। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত শান্তিগড় জায়গাটা কেমন তা কারো জানা নেই। কীভাবে যেতে হয়, কতদূরের পথ কিংবা ট্রেনের সময় কখন এতদ্বিষয়েও কোনো ধারণা নেই তাদের। একটি 'ইচ্ছেশক্তিই' তাদের প্রণোদনা :

আনন্দ : শান্তিগড় জায়গাটা কেমন সে বিষয়ে নিশ্চয় তোমার ধারণা আছে।
কল্যাণী : জানবো কি করে, আগে তো যাইনি কখনো।
সুন্দর : নিশ্চয় সুন্দর, শান্তিময়।
শুভ্রা : নিশ্চয় স্নিগ্ধতার আলোকে শুভ্র।
কল্যাণী : নিশ্চয়ই কল্যাণময় আশীর্বাদে প্রাণবন্ত।
আনন্দ : আশ্চর্য!
কল্যাণী : কেন।
আনন্দ : তোমরা, মানে, আমরা শান্তিগড়ে চলেছি। অথচ সে জায়গা সম্পর্কে কোনো ধারণা বা জ্ঞান কোনো কিছুই আমাদের নেই। যেন অন্ধের মতো পথ হাতড়িয়ে চলা আমাদের।
কল্যাণী : আমাদের ইচ্ছাই আমাদের পথ প্রদর্শক।
সুন্দর : আমাদের এই মহৎ ইচ্ছার জয় হবেই।[১০]

'শুভ্রা-সুন্দর-কল্যাণী-আনন্দ'দের এই এই ইচ্ছেশক্তির জয় হয়েও ছিল। ইচ্ছার বলেই আমরা পেয়েছি আমাদের 'শান্তিগড়' তথা স্বাধীন বাংলাদেশ। এখানে শান্তিগড় নাট্যকারের কল্পিত 'স্বাধীন বাংলাদেশ'।[১১] উল্লেখ্য যে, স্বপ্নের শান্তিগড় বাস্তবে রূপ নেবে কিনা কিংবা শান্তিগড় প্রতিষ্ঠিত হলেও সেখানে 'শান্তি' বিরাজ করবে কিনা এতদ্বিষয়ে নাট্যকার হয়তো সন্দিহান ছিলেন। কারণ, ১৯৬৯ সালে দাঁড়িয়ে নিশ্চিত বলা সম্ভব ছিল না যে, শান্তিগড় প্রতিষ্ঠিত হবেই। তবে তখন যেহেতু গণআন্দোলন শুরু হয়েগিয়েছিল, ফলে নাট্যকার হয়তো ধরেই নিয়েছিলেন যে, 'আমাদের এই মহৎ ইচ্ছার জয় হবেই।' এজন্যই নাট্যকার নাটকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুভ্রা, সুন্দর, কল্যাণী, আনন্দকে সুবর্ণগ্রামের ছোট্ট স্টেশনে ক্ষুদ্র ওয়েটিং রুমে অপেক্ষমাণ রেখেছেন শান্তিগড়ে যাওয়ার জন্য। এই 'অপেক্ষা'র দিক থেকে নাটকটি স্যামুয়েল বেকেটের *Waiting for Godot* (১৯৫৩) নাটকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। *Waiting for Godot* নাটকের ভ্লাদিমির এবং এস্ট্রাগনকেও গডোর জন্য অপেক্ষমাণ দেখা যায়। মূলত তারা 'অস্তিত্বের সংকটে'[১২] আক্রান্ত– যা থেকে মুক্তির জন্য তারা প্রতীক্ষার করছে গডোর জন্য, কিন্তু গডো কবে আসবে, আদৌ আসবে কিনা– তাও অমীমাংসিত। এমনকি গডো আসলে কী এবং এর জন্য প্রতীক্ষার কোনো মানে আছে কিনা– তাও সংশয়ের কুহেলিতে আচ্ছন্ন রয়ে যায়। আলাদা-আলাদা দিন মিশে যায় একটি আদ্যন্তহীন অভিন্ন দিনের পরিধিশূন্য অস্তিত্বে। সবকিছু বদলে যায়–

পোজো অন্ধ, লাকি বোবা– এমনকি পাতাশূন্য গাছটিতেও দেখা যায় নতুন পাতা, অথচ কোনো কিছুই বদলায় না তাদের : এটাই জীবনের, সর্বোপরি 'মানব-অস্তিত্বের' কূটাভাস– যার ইঙ্গিত মেলে নাটকের প্রথম সংলাপেই : 'Nothing to be done'.[১৩] কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। কেননা, 'Nothing to be done', therefore, must always be interpreted with the idea of waiting for Godot in mind. Whatever Didi and Gogo do cannot bring Godot there, and they cannot stop waiting for Godot. They do a lot, but the waiting must persist.'[১৪] ফলে আমরা নাটকের শেষপর্যন্ত ভ্লাদিমির ও এস্ট্রাগনকে 'আশার ছলনে ভুলে' থাকতে দেখি :

VLADIMIR : Well? Shall we go?
ESTRAGON : Yes, let's go.
They do not move[১৫]

জিয়া হায়দারের *শুভ্রা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ* নাটকের চরিত্রেরাও অস্তিত্বের সংকটে আক্রান্ত– যা থেকে মুক্তির জন্য তারা প্রতীক্ষার করছে শান্তিগড়ে যাওয়ার জন্য। ভ্লাদিমির ও এস্ট্রাগনের মতো শুভ্রা, সুন্দর, কল্যাণী, আনন্দকেও নাটকের শুরু থেকে শেষপর্যন্ত 'আশার ছলনে ভুলে' থাকতে দেখা যায় :

চারজন : (এক সঙ্গে) আমরা চারজন। শান্তিগড়ের যাত্রী। আমরা জানি না, কেউই জানে না, কতোকাল ধরে সুবর্ণগ্রাম নামের এই ছোট্ট জাংশান স্টেশনের ততোধিক ছোট্ট ওয়েটিং রুমের অন্ধকারে অপেক্ষমাণ। আমরা চারজন।[১৬]

এভাবে বেকেটের মতো জিয়া হায়দারও নেতিবাচকতার মধ্যেও ইঙ্গিত দেন ইতিবাচকতার। কার্যত অ্যাবসার্ড নাটক আপাত হতাশা তথা নেতিবাচকতার নিদর্শন মনে হলেও তা শেষাবধি ইতিবাচকতারই ইঙ্গিত দেয় :

> It (Absurd Drama) aims to shock itsaudience out of complacency, to bring it face to face with the harsh facts of the human situation as these writers see it. But the challenge behind this message is anything but one of despair. It is a challenge to accept the human condition as it is, in all its mystery and absurdity, and to bear it with dignity, nobly, responsibly; precisely because there are no easy solutions to the mysteries of existence, because ultimately man is alone in a meaningless world. The shedding of easy solutions, of comforting illusions, may be painful, but it leaves behind it a sense of freedom and relief. And that is why, in the last resort, the Theatre of the Absurd does not provoke tears of despair but the laughter of liberation.[১৭]

Waiting for Godot নাটকের বালক চরিত্রের সাথে *শুভ্রা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ* নাটকের পয়েন্টসম্যান চরিত্রের সাথেও খানিকটা সাদৃশ্য বিদ্যমান। আমরা *Waiting for Godot* নাটকে দেখি যে, বালক চরিত্রের সাথে গডোর যোগাযোগ আছে এবং কেবল সেই জানে গডো কখন, কোন সময় আসবে। কিন্তু সে সবসময় গডোর আসার ব্যাপারে ভ্লাডিমির আর এস্ট্রাগনের সাথে হেয়ালির সুরে কথা বলেছে:

VLADIMIR : You have a message from Mr. Godot.
BOY : Yes, sir.
VLADIMIR : He won't come this evening.
BOY : No, sir.
VLADIMIR : But he'll come tomorrow.
BOY : Yes, sir.
VLADIMIR : Without fail.
BOY : Yes, sir.
Silence.[১৮]

শুভ্রা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ নাটকের পয়েন্টসম্যানের সাথে স্টেশন মাস্টারের যোগাযোগ রয়েছে। পুরো স্টেশন জুড়ে যে দুটি আলোর কথা বলা হয়েছে তার একটা রয়েছে পয়েন্টসম্যানের কাছে। আর কেবল সেই জানে যে, কখন আসবে শান্তিগড়ের ট্রেন। অথচ যখনই শুভ্রা, সুন্দর, কল্যাণী, আনন্দ শান্তিগড়ের ট্রেনের খবর জানতে চেয়েছে তখনই সে হেয়ালির সুরে কথা বলেছে *Waiting for Godot* নাটকের বালকের মতোই :

সুন্দর : পয়েন্টসম্যান। ... আশা করি তুমি নিশ্চয়ই শান্তিগড়ের সংবাদ জানো।
পয়েন্টসম্যান : শান্তিগড়! কেন, সেখানকার কথা তো বলেইছি আপনাদের।
সুন্দর : না, মানে কেমন করে যেতে হয় সেখানে।
পয়েন্টসম্যান : সঠিক বলতে পারবো না, তবে শুনেছি... (থেমে যায়)
আনন্দ : কি শুনেছ?
পয়েন্টসম্যান : শুনেছি এই সুবর্ণগ্রাম স্টেশন থেকে একটা লুপ লাইন বেরিয়ে গেছে ওই ওদিকটাতে। জায়গাটার নাম বোধ হয় অনন্তপুর। সেইখানে নেমে হেঁটে হেঁটে হেঁটে যেতে হবে।
কল্যাণী : কতোদূর।
পয়েন্টসম্যান : কতদূর তা সঠিক বলতে পারবো না। দশ ক্রোশ হতে পারে, বিশ পঞ্চাশ, একশ ক্রোশ হওয়াও বিচিত্র কিছু নয়। তারপর যেতে যেতে যেতে দেখবেন একটা জলাভূমি, একেবারে বদ্ধ। সেখানে মোড় নিতে হবে।
সুন্দর : কোন্ দিকে?
পয়েন্টসম্যান : তা পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ ঈশান নৈঋত ঊর্ধ্ব অধঃ যে কোনদিকে নিলেই চলবে। নিয়ে আবার যেতে হবে, যেতে যেতে যেতে দেখবেন একটা বিরাট অশত্থগাছ, সেই গাছের বয়স ধরুন...
আনন্দ : পয়েন্টসম্যান!
পয়েন্টসম্যান : জ্বী।
শুভ্রা : দোহাই তোমার, তুমি আরেকটা রূপকথা শুনিয়ো না।
সুন্দর : কিন্তু সে লুপ লাইনের ট্রেনটা কখন।
পয়েন্টসম্যান : সে সময়ও বলতে পারবো না। তবে শুনেছি যে, রাত দুপুর পেরিয়ে গেলে, সবাই ঘুমে বিভোর হয়ে গেলে, সেই ঘুমের ভেতরে কোন্ এক ফাঁকে নাকি ট্রেন এখানে আসে, ভীষণ নিঃশব্দে, তেমনি নিঃশব্দেই চলে যায়।[১৯]

তাছাড়া *Waiting for Godot* নাটকের সংলাপের সাথে *শুভ্রা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ* নাটকের সংলাপের কিছু জায়গায় ঈষৎ সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন :

VLADIMIR : Silence!
All listen, bent double.
ESTRAGON : I hear something.
POZZO : Where?
VLADIMIR : It's the hert.[২০]

এই সংলাপের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে :

শুভ্রা : কিসের শব্দ যেন? (সবাই চমকে ওঠে) তোমরা শুনছো?
(সবাই চুপ। শব্দটি আবার শোনা যায়)
ওই যে, ট্রেনের হুইস্‌ল!
সুন্দর : না, না, বাঁশীর মতো শোনালো– জীবনের আর্তনাদে ভরা বাঁশীর মতো।[২১]

অ্যাবসার্ড নাট্যকলার যে সংগঠনশৈলী তা *শুভ্রা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ* নাটকে অনুসৃত হয়েছে। এ নাটকের কেন্দ্রীয় বিষয় আধুনিক জীবনের সর্বাত্মক অর্থহীনতা, শূন্যতা, ক্লান্তি, নৈরাশ্য এবং অন্তহীন প্রতীক্ষা। এখানেও তিনি অ্যাবসার্ড আবহে চেতন নয়, অবচেতনের জগতে সন্ধানী আলো ফেলেছেন এবং তুলে এনেছেন শুভ্রতা ও কল্যাণের সঙ্গে মলিনতা ও অকল্যাণের দ্বন্দ্বে বিপর্যস্ত মানুষের অন্তর্জগতের স্তরিভূত চিত্র। এছাড়া ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও নাট্যকার অ্যাবসার্ডিটির বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছেন। উল্লেখ্য যে, অ্যাবসার্ড নাটকের চরিত্রেরা যেহেতু meaningless world তথা 'অ্যাবসার্ড-পৃথিবী'র বাসিন্দা, সেহেতু তারা যেন ভাষা খুঁজে পায় না, বরং বহুকষ্টে মনে রাখে 'সংলাপপ্রবাহ'। অর্থাৎ সংযোগের প্রধান অবলম্বন 'বাক্‌কুশলতা'র সম্ভাবনা ফুরিয়ে গেছে 'অ্যাবসার্ড-পৃথিবী' থেকে। সংলাপের মধ্যে অ্যাবসার্ড-নাট্যকার তাই 'দীর্ঘ নীরবতার' নির্দেশ করেন। এই দীর্ঘ নীরবতা ভেদ করে চরিত্রেরা যখন কথা বলে, তখন তারা যেন একই কথারই পুনরাবৃত্তি করে– সর্বোপরি তা হয়ে যায় 'পারম্পর্যহীন' এবং 'সংক্ষিপ্ত'। এই সূত্রে *Waiting for Godot*-র সঙ্গে *শুভ্রা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ* নাটকের সংলাপের অন্তর্স্রোতের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। দৃশ্যত এসব সাদৃশ্য দৃশ্যমান হলেও *শুভ্রা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ* নাটকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ও রচনাকুশলতার স্বাতন্ত্র্যে তা সার্থক মৌলিক নাট্যসৃষ্টি। কারণ, স্যামুয়েল বেকেট তাঁর *Waiting for Godot* নাটকে কেবল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর মানুষের মনের হতাশা, শূন্যতাবোধ, অন্তহীন ক্লান্তি এবং একটা মিথ্যা আশা-স্বপ্ন-কল্পনার কথা বলেছেন। আর জিয়া হায়দার এ বিষয়গুলোর পাশাপাশি দেশিক, আন্তর্জাতিক ও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাকেও উপস্থাপন করেছেন, যা তাঁর নিরীক্ষাপ্রবণ দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচায়ক।

৩.

নিরীক্ষাধর্মী ভাষায় রচিত *এলেবেলে* (রচনাকাল : মে-জুন ১৯৭৫, প্রকাশকাল : মে ১৯৮১) বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে এক স্বতন্ত্র দৃষ্টান্ত। কেননা, 'ইমপ্রোভাইজেশন' তত্ত্বাবলম্বনে রচিত 'গ্রুপ থিয়েটার' বিষয়কেন্দ্রিক বাংলাদেশের

অদ্বিতীয় নাটক *এলেবেলে*। নাটকটি রচনার মধ্য দিয়ে জিয়া হায়দার 'ডিরেকটর মানে ডিক্‌টেটর' রীতির পরাজয় এবং গ্রুপ থিয়েটারের জয় দেখিয়েছেন। নাট্যকারের ভাষ্যে :

> ইমপ্রোভাইজেশনের ওপর ভিত্তি করেই *এলেবেলে* নাটকটির নিরীক্ষা। কাহিনী বা প্লট বলতে যা বোঝায় তার গুরুত্ব এতে খুব বেশি নেই। এবং সেই সঙ্গে পাশ্চাত্যের ষাটের দশকে রেষ্টুরেন্ট থিয়েটারের যে প্রচলন ঘটেছিলো *এলেবেলের* উপস্থাপনায় তারও আশ্রয় নেয়া হয়েছে।
>
> ইমপ্রোভাইজেশনে সাধারণত একটিমাত্র পরিস্থিতি অথবা কাহিনীক্রম (সিনারিও) দেয়া হয়; কুশীলবরা নিজ দক্ষতায় ও উপস্থিত বুদ্ধিমত্তায় তাকে এগিয়ে নিয়ে যায়, নাটকীয় পরিণতি দান করে। তবে, এখানে অতিরিক্ত একটি পদ্ধতি নেয়া হয়েছে, নিরীক্ষার অপর দিক-নির্দেশক এ্যাকশন বলে যাবে, কুশীলবরা তার নির্দেশই অনুসরণ করবে। কেননা 'ডিরেকটর মানেই ডিকটেটর'। বলা বাহুল্য, নাট্য সম্পর্কিত এই নীতি নাট্য প্রয়োজনায় অপরিহার্য; কিন্তু এ নাটকে সেই নীতির অনুসরণে একটি বক্তব্যও এসে গেছে : অযোগ্য ব্যক্তির অবিবেচনাপ্রসূত ডিকটেটরশীপ পরিণামে বিপর্যায়ই এনে দেয়।[২২]

এখানে ইমপ্রোভাইজেশনের কথা বলেছেন নাট্যকার– যা নাট্যচর্চায় আবশ্যিক অঙ্গরূপে স্বীকৃত ও ব্যবহৃত। এছাড়া নাট্যমঞ্চায়ণকৌশলে 'রেস্টুরেন্ট থিয়েটার'-এর ধারণার কথাও বলেছেন তিনি। পাশ্চাত্যে ষাটের দশকে শুরু হয়েছিল এই রেস্টুরেন্ট থিয়েটার চর্চা। ব্যবসায়িক প্রসার লাভের উদ্দেশ্যে রেস্টুরেন্ট মালিকরা তাদের রেস্টুরেন্টের মধ্যেই এই থিয়েটারের আয়োজন করতেন। কার্যত 'রেস্টুরেন্ট থিয়েটার' এবং 'ইমপ্রোভাইজেশন' তত্ত্ব ব্যবহার করলেও 'ডিরেকটর মানে ডিকটেটর' এবং 'অযোগ্য ব্যক্তির অবিবেচনাপ্রসূত ডিকটেটরশীপ'– এ দুটি বিষয়কে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন নাট্যকার। মূলত এ দুটি বিষয়ের সাথেই 'ডিরেকটর' শব্দটি ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। কাজেই নাট্যপ্রয়োজনায় ডিরেকটর বা নির্দেশকের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা অত্যাবর্শক।

নাট্যপ্রযোজনায় নাট্যকারের পরে নির্দেশকের স্থান। কেননা, নাট্যকার নাটক রচনা করে তাঁর কাজ শেষ করেন। অতঃপর চলমান ও দৃশ্যমান থিয়েটারের অঙ্গনে পদার্পণ করেন নির্দেশক– যিনি এই প্রয়োগশিল্পের জগতে দলনায়ক এবং অগ্রগণ্য সৃজনশীল ব্যক্তি। নাট্যকার তাঁর নাটকে যে বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করতে চান, তার দ্বারা সম্পূর্ণ প্রভাবিত না-হয়ে নিরপেক্ষ ও স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ থেকে নাটকটিকে বিচার করা– সর্বোপরি শব্দকে দৃশ্যমান এবং কল্পনাকে পরিবেশের বাস্তবতায় আবদ্ধ করাই নির্দেশকের কাজ। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় উৎপল দত্তের (১৯২৯-১৯৯৩) *টিনের তলোয়ার* (১৯৭৩) নাটকের কথা। নাটকটি উৎপল দত্তের নিজের পরিচালনায় ১২-ই আগস্ট, ১৯৭১ সালে 'পিপলস্ লিটল থিয়েটার'-এর প্রযোজনায় কলকাতা শহরে, রবীন্দ্রসদন মঞ্চে প্রথম অভিনীত হয়। ১৯৭১ সালে অভিনীত নাটকটি যদি কোনো নির্দেশক স্বকালে মঞ্চস্থ করতে চান, তাহলে তিনি নিশ্চয় উৎপল দত্তের সেই *টিনের তলোয়ার* নাটকটিকে হুবহু তুলে ধরবেন না– বরং তিনি নাটকটি সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করে নিজস্ব ব্যাখ্যায় একালের উপযোগী করে মঞ্চস্থ করবেন। দর্শকও বুঝতে পারবে যে, এ তাদের চোখে দেখা কোনো ঘটনা এবং তারই বিরুদ্ধে প্রবল-প্রতিবাদ। এভাবে নির্দেশক নাটকের বক্তব্যকে

নতুন ব্যাখ্যায় দর্শকের কাছে পৌঁছে দেন। উল্লেখ্য যে, রিহার্সাল বা মহড়ার মাধ্যমেই নির্দেশক নাটককে দর্শকের কাছে পৌঁছে দেন বা মঞ্চায়নের জন্য উপযুক্ত করেন। এই রিহার্সাল বা মহড়ার ওপর ভিত্তি করেই ডিরেকটর বা নির্দেশককে দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। প্রথম শ্রেণিতে রয়েছেন– বের্টল্ট ব্রেশ্‌ট (Eugen Berthold Friedrich Brecht; ১৮৯৮-১৯৫৬), ইউজিন ভক্তানগভ (Yevgeny Bagrationovich Vakhtangov; ১৮৮৩-১৯২২), স্টানিস্লাভস্কি (Konstantin Sergeyevich Stanislavski; ১৮৬৩-১৯৩৮), টায়ারন গাথরি (Sir William Tyrone Guthrie; ১৯০০-১৯৭১), ম্যেয়ারহোল্ড (Vsevolod Emilyevich Meyerhold; ১৮৭৪-১৯৪০) প্রমুখ। যাঁরা নির্দেশনার ক্ষেত্রে 'ডিকটেটরশিপ' নীতি পরিহার করে থিয়েটারকে একাধিক ব্যক্তির সম্মিলিত কর্মফল হিসেবেই বিবেচনা করেছেন :

> বের্টল্ট ব্রেখ্‌ট মহড়া চলাকালীন সময়ে তাঁর অভিনেতা-অভিনেত্রীদের উপর নির্ভর করে বসে থাকতেন আর বিশ্বাস করতেন যে অভিনেতা-অভিনেত্রীরাই তাঁকে তাঁর নিজের লেখা নাটকের অর্থ উদ্ধার পথ দেখাবে। নির্দেশক ইউজীন ভক্তানগভ তাঁর শিল্পী কুশলীদের সঙ্গে গোল টেবিল বৈঠকে বসতেন এবং সবাই মিলে নাটকের একটি সাধারণ ব্যাখ্যা ও অর্থে উপনীত হবার চেষ্টা করতেন। এইভাবে বিভিন্ন নির্দেশক অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কর্তব্য সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা পোষণ করতেন। স্টানিসলাভস্কি অভিনেতা-অভিনেত্রীকে বলতেন, 'তুমি যে মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছ একথা তোমাকে অবশ্যই ভুলে যেতে হবে'। টায়ারন গাথরি বলেন, 'সব ভুলে যাও, অবশ্য মঞ্চে তোমার নিজের কর্তব্য ছাড়া'।ম্যেয়ারহোল্ড অভিনেতা-অভিনেত্রীকে বলতেন যে, তাঁকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, তিনি দর্শকদেরই একজন।[২৩]

দ্বিতীয় শ্রেণিতে রয়েছেন ফরাসি অভিনেতা ও নির্দেশক লুই জুভের (Jules Eugène Louis Jouvet; ১৮৮৭-১৯৫১)। নির্দেশকের ভূমিকাসম্পর্কিত তাঁর বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিন্ন :

> In a rehearsal room, a person is watching, listening, and keeping alert to all the nuances of the actors' performances. Sometimes he laughs with satisfaction, sometimes he frowns in thought, sometimes he paces with excitement, and sometimes he strains to hear a whispered line delivered with perfect inflection. Above all, he watches for the sign of false expression. Can you guess who this person is? It is the director of the play. This person could be called the gardener of consciousness, the mender of ruptures, the jailer of environment, the weaver of words, the gravedigger of the self, the charioteer of the theatre, the slave of the stage, the juggler and magician, the alchemist of metals, the political strategist, the economist, the musician, the explainer, the artist, and the advertiser of preparation.[২৪]

উপর্যুক্ত দুটি দৃষ্টান্ত থেকে দুই ধরনের নির্দেশকের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম ধরনের নির্দেশকের কাছে নাটকই প্রথম ও প্রধান এবং দ্বিতীয় ধরনের নির্দেশক নিজেকেই প্রথম ও প্রধান বলে মনে করেন। এ ধরনের নির্দেশকের পতন প্রায়ই লক্ষ করা যায়। জিয়া হায়দার তাঁর *এলেবেলে* নাটকে এই দ্বিতীয় ধরনের নির্দেশকের কথাই বলেছেন ব্যঙ্গের সাথে এবং তার পতনও দেখিয়েছেন চমৎকারভাবে।

জিয়া হায়দার গ্রুপ থিয়েটারের লোক ছিলেন। গ্রুপ থিয়েটার সম্পর্কে তাঁর অভিমত :

> থিয়েটার বিষয়টিই একাধিক ব্যক্তির সম্মিলিত কর্মফল, অর্থাৎ থিয়েটারকর্ম মাত্রই একটি গ্রুপের কর্ম।... নাট্য ইতিহাসের বিবর্তনে, বিশেষভাবে এই বিশ শতকে এতো দ্রুত যে সব drama genre-এর বিকাশ ঘটেছে ও ঘটছে তার পেছনে একমাত্র কারণ 'গ্রুপ থিয়েটারের' নীতি অনুসারে পাওয়া নাট্যকারের স্বাধীনতা।... 'গ্রুপ থিয়েটারের' কর্মরীতির প্রতি লক্ষ্য করলে এটা দেখা যাবে যে, এর সমস্ত কর্মই যৌর্থভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে।[২৫]

জিয়া হায়দার 'নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়' ও 'বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব থিয়েটার আর্ট (বিটা)'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। এছাড়া চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইউনিভার্সিটি থিয়েটার'র পরিচালক ছিলেন। ফলে তিনি 'ডিরেকটর মানে ডিকটেটর' নীতিকে সম্ভবত খুব একটা ভালোভাবে নিতে পারেননি, বরং গ্রুপ থিয়েটারের ব্যাপারে তিনি ছিলেন বেশি আগ্রহী। কারণ, গ্রুপ থিয়েটারে সবার মতামত বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভালো কিছু নেওয়া হয়। যেমন : একজন একটা আইডিয়া দিলো, একজন একটা সংলাপ দিলো এবং ডিরেকটর সেটা নিজে ভালো বলে বিবেচনা করতে চাইলে গ্রুপের অন্যান্য সদস্যের মতামত গ্রহণ করবেন, আর খারাপ বলে বিবেচনা করলেও অন্যদের মতামতের ভিত্তিতেই বর্জন করবেন। এভাবে গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে গ্রুপ থিয়েটার দর্শকদের ভালো কিছু উপহার দেয়। তবে সেখানেও ডিরেকটরের ভূমিকা থাকে সবচেয়ে বেশি এবং গ্রুপের অন্যান্য সদস্য ডিরেকটরের সিদ্ধান্তকে ভালোভাবে গ্রহণ করেন। নাটকে কী বিষয় উপস্থাপিত হবে– সেটা গ্রুপের সকল সদস্যই জানতে পারে। এ ক্ষেত্রে মঞ্চ হলো অভিনেতা-অভিনেত্রীর, কিন্তু অভিনেতা-অভিনেত্রীসমেত মঞ্চ হলো ডিরেকটরের। আর 'ডিরেকটর মানে ডিকটেটরশিপ' নীতিতে ডিরেকটরই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকেন। এখানে ডিরেকটর যা বলবেন, তা অভিনয়ের সাথে জড়িত সকল সদস্য মানতে বাধ্য থাকে। ফলে এমনও ঘটনা ঘটে যে, নাটকে কী হচ্ছে– সেটা ডিরেকটর ভিন্ন অন্য কেউ ভালোভাবে জানেই না! এ ক্ষেত্রে ডিরেকটর যদি করতালি পাওয়ার যোগ্য হন, তাহলে তিনিই পাবেন; আর গালি পাওয়ার যোগ্য হলেও তিনিই পাবেন। নাট্যকার জিয়া হায়দার আলোচ্য *এলেবেলে* নাটকে মাত্র দুটি সংলাপের মাধ্যমে এই দুই ধরনের নীতির পার্থক্য দেখিয়েছেন :

> ছেলে : রাগ করছেন কেন। আপনি নিজের দিকটাই দেখতে চাইছেন; অন্যের সমস্যাও বিবেচনা করতে হয়।
>
> নির্দেশক : আগে আমারটা, কেবল আমারটাই। তোমাদেরটা গোল্লায় যাক, আমার কিচ্ছু যায় আসে না।[২৭]

নাট্যকার যখন নাটকটি রচনা করেন, তখন এদেশে গ্রুপ থিয়েটারচর্চার অবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না। মমতাজউদদীন আহমদের (১৯৩৫-২০১৯) কথায় সে সময়ের থিয়েটারচর্চার অবস্থা :

> তেয়াত্তর-চুয়াত্তর সালে নাটক থৈ থৈ করছিল, পঁচাত্তরে কিছুদিন ঝিম মেরেছিল, ছিয়াত্তরে তেমন থৈ থৈ করা হৈ হৈ আর নাই; এখন কিছুটা স্থিতিস্থাপকতা এসেছে। এরই মধ্যে অনেক কটি গোষ্ঠী থেমে গেছে, কেউ কেউ হয়তো দম ধরে গুম হয়ে বসে আছে। যাদের সংগঠন মজবুত, সঙ্কল্প

> অদম্য এবং সুযোগ অনুকূল, তাঁদের গোষ্ঠী নিজেদের নিয়মে নিয়মিত নাটক করছেন। ভালো নাটক ভালোভাবে করতে হলে এখন গ্রুপ করতেই হবে। দলছুট একক প্রচেষ্টায় মঞ্চের আশেপাশে যাবার উপায় নাই। দশ-বিশ বছর আগে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যখানে বসে নাটক লেখা আর নাটক করার সেসব কায়দা-কানুনও গেছে। ওসব ছিল মৌসমী হিক্কা। এখনকার নাটক নাট্যকারের মুখের দিকে তাকায় না গোষ্ঠীর যৌথ সাধনার সঙ্গেই ধরা দেয়। আজকালকার নাট্যকর্মে ব্যক্তি এসে সিংহাসনে বসবেন আর গুণগ্রাহীরা দাঁড়ের ময়নার মতো শেখানো বুলি বলবে– সে যুগ হয়েছে বাসি। এখন ভাবনা-চিন্তা সবাইকে সমানভাবে ভাগ করে নিতে হচ্ছে। কালকের সঙ্গে আজকের নাটকের দুস্তর ব্যবধান। যতই আপসোপ করি না কেন, আর সেই সহজ সিংহাসন পাওয়া যাবে না। নাটক করতে হলে কারিগর হতে হবে, কর্মী হতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ নিয়ে শখের নাটক করার কথা এ সময়ে আর ভাবা যাবে না।[২৬]

জিয়া হায়দার এই ব্যাপারটিকেই উপলব্ধি করেছিলেন। এজন্য তিনি নাটকে 'ডিরেকটর মানে ডিকটেটরশিপ' নীতিকে মানতেন না। আর মানলেও অযোগ্য ব্যক্তির ডিকটেটরশিপকে কখনোই মেনে নিতে পারেননি। কারণ, অযোগ্য ব্যক্তির ডিকটেটরশিপের পরিণাম– 'অনিবার্য বিপর্যয়'! এই ব্যাপারটিকে দৃশ্যায়িত করার উদ্দেশ্যেই তিনি রচনা করেছেন *এলেবেলে*।

'নির্দেশক' চরিত্রটি *এলেবেলে* নাটকের 'অযোগ্য ব্যক্তি', যে বাল্যবেলায় ইংরেজি স্কুলে অধ্যায়নকালে একটি নাটকে 'মৃতসৈনিক'-এর ভূমিকায় অভিনয় করে খুবই সুনাম অর্জন করেছিল এবং পরবর্তীতে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত নাট্যসমালোচনা পড়ে নাট্যবিষয়ে অর্জন করেছিল অঘাধ পাণ্ডিত্য। ফলে সে সবসময় নিজেকে 'সুদক্ষ অভিনেতা', 'শ্রেষ্ঠনাট্যবোদ্ধা'– সর্বোপরি 'শ্রেষ্ঠনির্দেশক' হিসেবেই পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। এছাড়া সে লক্ষ্য করে, এ দেশের নাট্যকর্মে নির্দেশকের ভূমিকা অদ্যাবধি কোনো গুরুত্ব পায়নি। ফলে নাটকের নির্দেশনা দিয়ে সে স্বপ্রজ্ঞাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। সেটাই হবে তার কৃতিত্ব– যে কৃতিত্বের ইতিহাস যদি কেউ না-লেখে, তবে স্বয়ং নিজেই 'বেনামে' তার ইাতহাস লিখে যাবে। কারণ, স্ববিবেচনায় সেই এদেশের নাটকে বিপ্লব এনেছে– যে বিপ্লবের কথা নাটকের শুরুতেই সগর্বে বলেছে দর্শকের উদ্দেশ্যে :

> নির্দেশক : সমাগত সুধী দর্শকবৃন্দ। আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। (সে বাও করে) রেস্টুরেন্টের ভেতরে নাটক। এই যে ব্যাপারটা, মানে রেস্টুরেন্ট ড্রামা, এদেশে নতুন; বিদেশে অবশ্য পুরোনো। আমি যদিও দেখিনি, শুনেছি। আর শুনেই, (অহংকার মিশ্রিত হাসিতে) আমার ইনট্যুইশন তো খুব প্রখর আর ক্রিয়েটিভ ফ্যাকাল্টিও প্রচুর– অতএব শুনেই আমি এ ধরনের নাট্যকর্ম চালু করার আয়োজন করেছি। আপনারা যারা এখানে এই সময়ে এসেছেন, এদিকে চা-টাও খাবেন, আর ওদিকে ফাও হিসেবে নাটকও দেখবেন– বেশ মজার উপরি পাওন কিন্তু। এমন একটি ব্যাপার আমাদের দেশে যুগান্তরকারী, আমাদের দেশের নাট্যআন্দোলনে বিপ্লব। (বেশ জোর দিয়ে, গর্বের সঙ্গে) আমি বলতে চাই, এ বিপ্লবের সূচনা আমারই হাতে।... এর সমস্ত ক্রেডিট

> আমার। এর জন্য নাট্যআন্দোলনের ইতিহাসে আমার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে, থাকতেই হবে। (হাসি- হাসি মুখে গলার টাই নাড়াচাড়া করে)
> আজকে শুভ উদ্বোধন। আপনারা তো জানেনই, রেস্টুরেন্টের নাম 'এলেবেলে'। এলেবেলে রেস্টুরেন্টের প্রথম নাট্যানুষ্ঠান বলেই নাটকটির নামও দেয়া হয়েছে এলেবেলে। নাটকটি আমারই লেখা, আমারি পরিচালনা। পরিচালনা শব্দটা এখন পুরোনো হয়ে গেছে, সে জন্যে আর সবাই নির্দেশক কথাটি ব্যবহার করে। আর তাই আমিও... এভাবে বলাটাই ভালো : রচনা ও নির্দেশনা আবু আলি মিরধা, বি. এ. হন্স, এম. এ. থার্ড ক্লাশ ঢাক মানে ঢাকা– অর্থাৎ আমার।[২৭]

থার্ড ক্লাশ নিয়ে এম. এ. পাশ করা এই নির্দেশক চরিত্রটি তার রেস্টুরেন্টে যে নাটকটি পরিচালনা করতে যাচ্ছে, তাকে সে এক্সপেরিমেন্ট বা নিরীক্ষাধর্মী ব্যাপার বলতে চেয়েছে। কারণ, এদেশে সেই প্রথম এ ধরনের নাটক প্রথম মঞ্চস্থ করতে যাচ্ছে। অথচ তার নাটকটি লেখাই হয়নি! না-লিখলেও সমস্যা নেই। কারণ, ইমপ্রোভাইজেশন থিয়েটারে (Improvisational Theatre) নাটক না-লিখলেও চলে, তাৎক্ষণিক একটা বিষয় নিয়ে নাটক মঞ্চস্থ করা যায়। ব্রিটিশ থিয়েটার পরিচালক কিথ জনস্টোন (Keith Johnstone; ১৯৩৩-২০২১)-ও এমনটাই বলেছেন। তাঁর মতেImprovisational Theatre হলো : 'the art of creating theatrespontaneously, without a script'[২৮]। অর্থাৎ পাণ্ডুলিপি ছাড়াই স্বতঃস্ফূর্তভাবে থিয়েটার তৈরির শিল্পই প্রকৃতপক্ষে ইমপ্রোভাইজেশন থিয়েটার– যার উদ্ভব প্রাচীন গ্রিসে। প্রথম অভিনেতা হিসেবে চিহ্নিত থেসপিস– যিনি ডয়োনিসিয়া উৎসবে দর্শকসমক্ষে তাৎক্ষণিক অভিনয়ের বিভিন্ন উদ্ভাবনী কৌশলের পরিচয় দিয়ে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। মূলত ডয়োনিসিয়া উৎসবে থেসপিসের তাৎক্ষণিক অভিনয়ের বিভিন্ন উদ্ভাবনী কৌশল থেকেই ইমপ্রোভাইজেশনের যাত্রা।[২৯] আমাদের দেশেও তাজিয়া মিছিলের সময় বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষ একত্রিত হয় এবং তারা ইমাম হোসেনের বিভিন্ন কার্যকলাপকে তাৎক্ষণিক অভিনয়ের মাধ্যমে দেখায়। কবি গানেও ইমপ্রোভাইজেশন ব্যবহৃত হয়। তাড়াছা মানুষমাত্রই প্রতিটা মুহূর্তে ইমপ্রোভাইজেশনের মধ্যে দিয়ে চলে। কারণ, মানুষের ভবিষ্যৎ অজানা। ধরা যাক একজন ক্রিকেটার ব্যাটিং করছেন, একজন বল করলেন– তখন ব্যাটস্ম্যান নিশ্চয় গ্রামার মেপে বলে আঘাত করবে না; বরং তিনি তাৎক্ষণিক বুদ্ধির জোরে বলটিতে আঘাত করবেন। এছাড়া ধরা যাক, একজন ব্যক্তি গ্রামে কিংবা গঞ্জে ডুগডুগি বাজিয়ে বানরখেলা দেখাচ্ছেন, বানর কী করবে, তিনি সেটা জানেন না; এসময় তিনি বানরের কার্যকলাপ দেখে তাৎক্ষণিক বুদ্ধির জোরে কিছু বলবেন বা করবেন। এছাড়া আমরা কোনো জায়গায় কারো সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে কিংবা অন্য কোনো কাজ করতে গেলে তাৎক্ষণিক বুদ্ধির জোরেই সেটা করে থাকি। অথচ কাজশেষে স্বপক্ষে যুক্তি দেখাই। এক্ষেত্রে শেকস্পিয়রের 'all the world's a stage and all the men and women merely players.'[৩০]— উক্তিটিই যথার্থ। *এলেবেলে* নাটকের নির্দেশক চরিত্রের ইমপ্রোভাইজেশন সম্পর্কে তেমন ধারণা না-থাকা সত্ত্বেও তার নির্দেশিত

নাটকের পাত্র-পাত্রী হিসেবে যে 'ছেলে' ও 'মেয়ে' চরিত্র রয়েছে– যারা এ বিষয়ে অবিজ্ঞ ও তুখোড়, তাদেরকে নির্দেশনা দিয়েছে। তারাও তার নির্দেশনা মোতাবেক নাট্যঘটনার বিস্তার ঘটাতে থাকে। কিন্তু নির্দেশক হঠাৎ নিজের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে বলে : 'আমি নির্দেশ দিচ্ছি। কেন, তোমার জানা নেই, আমার নির্দেশ তোমাকে বিনা দ্বিধায় পালন করতে হবে?'[৩১] এমন কড়াকথা নাটকের পাত্র-পাত্রীরা প্রথমদিকে কিছু মানলেও পরে কোনোভাবেই মানতে চায়নি, বরং তারা নিজেদের মতো করে অভিনয় করে গেছে। এরকম আচরণ দেখে নির্দেশক নাটকের চরম পর্যায়ে বিরতি দিয়ে মঞ্চের লাইট বন্ধ করে দিয়ে কাঞ্চু ও মিউজিশিয়ানকে বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। বিরতির পর পুনরায় নাটক আরম্ভ হলে নাটকের পাত্র-পাত্রী দক্ষতার সাথে সাবলীলভাবে অভিনয় করে। কিন্তু নির্দেশক তার নিজের ঠাট ঠিক রাখার জন্য পুনরায় ডিকটেটরশিপ করেছে, বলেছে : 'শেষটা হবে করুণ, বেদনা দায়ক; বুকটা ব্যথার ভারে সুমসাম করে উঠবে। গলার কাছে কি যেন একটা যন্ত্রণা দলা পাকিয়ে উঠবে, কান্না কান্না হয়ে যাবে কণ্ঠ। চোখের ভেতরে খড়কুটোর মতো কি যেন একটা খোঁচা দিতে থাকবে, অশ্রু গড়াতে যেয়ে মুক্তা হয়ে যাবে।'[৩২] নির্দেশকের এমন অযৌক্তিক কথা শুনে বিরক্ত হয়েছে পাত্র-পাত্রী। ফলে তৈরি হয়েছে দ্বন্দ্ব– যে দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে নির্দেশকের 'ডিকটেটরশিপ' প্রবণতা প্রস্ফুটিত হয়েছে :

ছেলে : বিরক্ত করবেন না তো!

নির্দেশক : বিরক্ত!

ছেলে : দেখুন, এখন মাথার ঠিক নেই...

নির্দেশক : মাথা! তোমাদের মাথার কোনো দাম নেই আমার কাছে। খালি কান দু'টোই ঢের, বুঝলে।

মেয়ে : কান।

নির্দেশক : হ্যাঁ হ্যাঁ। আমার মাথা দিয়ে যা বেরোয় তা ওই কান দিয়ে শুনবে, আর তাই করে যাবে– আণ্ডারষ্টাণ্ড।[৩৩]

নির্দেশকের এমন আচরণ এবং কার্যকলাপ ফরাসি অভিনেতা ও নির্দেশক লুই জুভের চিহ্নিত নির্দেশকের পরিচয়কেই স্মরণ করিয়ে দেয়– যে আচরণ নাটকের পাত্র-পাত্রী কোনোভাবেই মানতে পারেনি, বরং সুযোগ মতো ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে বলেছে : 'আর ডিরেক্টর মানেই তো ডিক্টেটর!'[৩৪] এই ব্যঙ্গটাই নাট্যকার জিয়া হায়দারের এ-নাটকের মূল উদ্দেশ্য। তবে তিনি কেবল ব্যঙ্গ করেই সাঙ্গ করেননি, বরং ব্যঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে ডিকটেটরশিপের পতনও দেখিয়েছেন :

নির্দেশক :আমার নির্দেশ। ভুলে যেওনা, নাটকের ডিরেকটর মানেই সর্বেসর্বা। অতএব বিনা বাক্যে। বিনা প্রশ্নে আমর নির্দেশ তোমাদের মানতেই হবে।

ছেলে : (শ্লোগানের মতো করে বলতে থাকে) নির্দেশকের নির্দেশ ...

মেয়ে : মানিনা, মানিনা। ...

নির্দেশক : (অসম্ভব উত্তেজিত হয়ে) কি, কি বললে?

ছেলে : তোমার হুকুম ...
(এবার মিউজিসিয়ানও ছেলে ও মেয়ের সঙ্গে যোগ দেয়)
ছেলে মেয়েমিউজিশিয়ান : মানিনা, মানিনা।
(ছেলে চেয়ার থেকে সরে আসে, তিনজনে নির্দেশককে ঘিরে ধরে, এবং শ্লোগান দিতে থাকে। মিউজিশিয়ান দ্রুত লয়ে বাজনা বাজাতে থাকে।)
নির্দেশক : (উম্মাদগ্রস্ত ভাবে) আমি হুকুম করছি, আমার হুকুম, আমার নির্দেশ, এখনো মেনে নাও, নইলে ...
তিন জন : মানিনা, মানিনা।[৩৫]

স্লোগান দিতে দিতেই ছেলে, মেয়ে ও মিউজিশিয়ান মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যায় এবং ডিক্‌টেটরশিপেরও পতন হয়। এভাবে নাট্যকার 'ডিরেক্‌টর মানে ডিক্‌টেটর' রীতির পরাজয় এবং গ্রুপ থিয়েটারের জয় দেখিয়েছেন।

এলেবেলে নাটকের ভেতরে নাটক। অর্থাৎ নাটকটি মঞ্চস্থ হচ্ছে 'এলেবেলে' নামক রেস্টুরেন্টে। সেখানে মানুষ চা খাচ্ছে এবং ফাও হিসেবে নাটক দেখছে। ফলে নাটকের ফাঁকে ফাঁকে কুশীলবরা কখনো কখনো খরিদ্দার তথা দর্শকদের সাথে কথা বলছে, কোনো সময়ে নিজেদের নিয়ে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হচ্ছে, আবার কোনো কারণে তারা নিজেদের পরিচিত জনদের সাথে কথাও বলছে। ফলে মাঝে-মধ্যে সংলাপের ধারাবাহিকতা বজায় থাকছে না। এছাড়া কখনো কখনো কিছু চরিত্র ফ্রিজ হচ্ছে আর বাকি চরিত্র অভিনয় করছে। যার ফলস্বরূপ চরিত্রগুলোর মধ্যে বর্তমানের সাথে অতীতের স্মৃতিকাতরতার একটা ব্যাপারও লক্ষ করা যায়। তাছাড়া এ নাটকের ঘটনার ধারাবাহিকতাও অনুপস্থিত। ফলে দর্শক-পাঠক সবসময় একটা ঘোরের মধ্যে থাকে– যা দেখে নাটকটিকে প্রাথমিক অবস্থায় অ্যাবসার্ড বলেই মনে হয়। কিন্তু অ্যাবসার্ড নাটকের জন্য প্রয়োজন :

> As the reality with which the Theatre of the Absurd is concerned is a psychological reality expressed in images that are the outward projection of states of mind, fears, dreams, nightmares, and conflicts within the personality of the author, the dramatic tension produced by this kind of play differs fundamentally from the suspense created in a theatre concerned mainly with the revelation of objective characters through the unfolding of a narrative plot. The pattern of exposition, conflict, and final solution mirrors a view of the world in which solutions are possible, a view based on a recognizable and generally accepted pattern of an objective reality that can be apprehended so that the purpose of man's existence and the rules of conduct it entails can be deduced from it.[৩৬]

মার্টিন এসলিন অ্যাবসার্ড নাটকের 'psychological reality' (মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতা)-কে বোধগম্য করার জন্য এখানে সুস্পষ্টভাবে অ্যাবসার্ড নাটক (Absurd Drama) এবং সাধারণ নাটক (Normal Drama)[৩৭]-এর পার্থক্যও উপস্থাপন করেছেন। তাঁর মতে,সাধারণ নাটকে যেহেতু 'objective characters' থাকে, সেহেতু এখানে মুখ্য হয়

'objective reality' (বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবতা), আর অ্যাবসার্ড নাটকে যেহেতু 'subjective characters' থাকে, সেহেতু এখানে মুখ্য হয়ে ওঠে 'psychological reality'। সাধারণ নাটক প্রারম্ভিক অবস্থা (exposition) থেকে ক্রমবর্ধমান তীব্রতায় ক্লাইমেক্সে পৌঁছায়, যার মাধ্যমে নাটকের পরিণতি লাভ করে। অর্থাৎ 'The pattern of exposition, conflict, and final solution mirrors a view of the world in which solutions are possible'। এছাড়া অ্যাবসার্ড নাটকের দর্শক-পাঠক এমনসব ঘটনাপ্রবাহের সম্মুখীন হয়, যেগুলো আপাতবিচ্ছিন্ন-উদ্দেশ্যবিহীন, চরিত্রগুলো অবিরত একই প্রবাহে আবর্তিত এবং যা ঘটছে– যা হচ্ছে– সব যেন বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন অভিজ্ঞতার বহির্ভূত। এমত পরিস্থিতিতে সাধারণ নাটকের প্যাটার্নে (pattern) অ্যাবসার্ড নাটকের সমাধান (solution) সম্ভব হয় না। উল্লেখ্য যে, 'dramatictension' (নাটকীয় উৎকণ্ঠা) নাটকের প্রধান উপাদান। সাধারণ নাটকে 'dramatictension' সৃষ্টি হয় 'with the revelation of objective charactersthrough the unfolding of a narrative plot'-এর মাধ্যমে, কিন্তু অ্যাবসার্ড নাটকে যেহেতু 'narrative plot' থাকে না, সেহেতু এখানে 'subjectivecharacters'-এর psychological reality'-এর মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয় 'dramatic tension'। *Waiting for Godot* নাটকের ভ্লাডিমির, এস্টাগন এবং *শুভ্রা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ* নাটকের শুভ্রা, সুন্দর, কল্যাণী, আনন্দ চরিত্রগুলো মূলত 'subjective characters'। এই চরিত্রগুলোর মধ্যে কোনো উত্থান-পতন কিংবা Doing and Suffer নেই। তারা নাটকের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই অবস্থায় থাকে। মূলত তারা 'অস্তিত্বের সংকটে' আক্রান্ত। ফলে থেমে গেছে তাদের মানসিক গতি। এমত সংকটাপন্ন পরিস্থিতি থেকে মুক্তির জন্যই তাদের নিরন্তর প্রতীক্ষা– যার মধ্যে নিহিত রয়েছে 'psychological reality'[৩৮]। *এলেবেলে* নাটকের নির্দেশক চরিত্রটি subjective characters নয়, বরং objective characters। কারণ, তার উত্থান-পতন আছে, আছে objective reality। তাছাড়া নাটকটি প্রারম্ভিক অবস্থা (exposition) থেকে ক্রমবর্ধমান তীব্রতায় ক্লাইমেক্সে পৌঁছিয়েছে– যার মাধ্যমে নাটকের পরিণতি লাভ করে। অর্থাৎ নাটকটির গঠনশৈলিতেও অ্যাবসার্ড প্রকরণ নয়, বরং ইমপ্রেভাইজেশান তত্ত্ব ব্যবহৃত হয়েছে। কার্যত, অ্যাবসার্ড নাটকের মতো ইমপ্রোভাইজেশান নাটকেও অনুপস্থিত থাকেসংযত ও সংগতিপূর্ণ সংলাপ এবং নাট্যঘটনার ধারাবাহিকতা :

> ইম্প্রোর বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে কোনো নির্দিষ্ট নাটক বা নিয়মবদ্ধ শিল্পরূপ থাকে না। এর ভাষা ও ভঙ্গি কোনো বিধিনিয়মের ধারায় আবদ্ধ নয়। এখানে কোনো কাহিনী নেই। পূর্বপরিকল্পিত সুশৃঙ্খল নেই।... সীমানা বেঁধে দেওয়া নেই। সৃষ্টিবেগের জলপ্রপাতকে আবদ্ধ করার চেষ্টা নেই।[৩৯]

অর্থাৎ ইমপ্রোভাইজেশান তত্ত্বাবলম্বনে রচিত নাটকে যেহেতু সুশৃঙ্খলিত কাহিনি বা নাট্যঘটনা থাকে না, সেহেতু এই নাটকের ভাষাও কোনো বিধিবদ্ধ নিয়মে আবদ্ধ থাকে না। ফলে এই ধরনের নাটকের ভাষা অনেকক্ষেত্রে অ্যাবসার্ড নাটকের ভাষাভঙ্গির মতো মনে হয়।

৪.

জিয়া হায়দার ছিলেন পাশ্চাত্য অভিজ্ঞতাপুষ্ট একজন নিরীক্ষাপ্রবণ নাট্যকার। ফলে তাঁর মৌলিক নাটকগুলোর মধ্যে বের্টল্ট ব্রেশ্‌ট, স্যামুয়েল বেকেট এবং অগাস্ত বোয়ালের প্রভাব লক্ষণীয়। তিনি এ-সকল বিশ্ববরেণ্য নাট্যকারদের নাটক এবং নাট্যতত্ত্ব সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করে এ দেশীয় প্রেক্ষাপটে প্রয়োগ করেছেন। ফলে *শুভ্রা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ* কেবল সংলাপরীতিতে অ্যাবসার্ড থাকে না, বরং গঠনগত সুষমা এবং দর্শনগত দিক থেকেও অ্যাবসার্ড। সর্বোপরি এটি পাকিস্তান-অধীন ষাটের দশের বাংলাদেশের অস্থিতিশীল-উদ্ভট তথা ‘অ্যাবসার্ড-পরিস্থিতির’ই প্রতিনিধিত্ব করে। অর্থাৎ জিয়া হায়দার*শুভ্রা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ*নাটকের প্রকরণশৈলীতে পাশ্চাত্যের অ্যাবসার্ড ব্যবহার করলেও বিষয়ের ক্ষেত্রে তিনি সর্বদাই তার স্বসময় ও স্বদেশকেই প্রধান্য দিয়েছেন। ফলে নাটকটি হয়ে ওঠে এ-দেশের অস্থিতিশীল উদ্ভট পরিস্থিতির শিল্পিত রূপায়ণ। তবে এখানে তিনি বাড়তি বিষয় হিসেবে সংযোগ করেছেন অগাস্ত বোয়ালের Newspaper Theatre শিল্পপ্রকরণ– যে সংযুক্তির মাধ্যমে পাঠক বা দর্শক খুব সহজেই ষাটের দশকের আন্তর্জাতিকমহলের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ অবস্থা সম্পর্কেও জানতে সক্ষম হয়। এই নাট্যনিরীক্ষায়ও তিনি সার্থক।

গ্রুপ থিয়েটারের একজন একনিষ্ঠ কর্মী তিনি, এজন্য খুব কাছ থেকে গ্রুপ থিয়েটারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। ফলে তিনি কখনোই ‘ডিরেক্টর মানে ডিক্টেটর’ রীতিকে মানতেন না। আর মানতেন না বলেই তিনি গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের পাশাপাশি *এলেবেলে* নাটকে এই থিয়োরি প্রয়োগ করে এই আন্দোলনকে আরো বহুগুণে বেগবান কারার বাঞ্ছাপোষণ করেছেন। যা তাঁর আজীবন নাট্যান্দোলনেরই একটি বহিঃপ্রকাশ। তবে এখানে বাড়তি বিষয় হিসেবে তিনি যোগ করেছেন ‘ইমপ্রোভাইজেশন’ শিল্পপ্রকরণ। এই নাট্যনিরীক্ষায়ও তিনি সফলতায় পর্যবশিত হয়েছেন। যার মাধ্যমে অ্যাবসার্ড ও ইমপ্রোভাইজেশনের পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভবপর হয়।

তথ্যনির্দেশ

১ জিয়া হায়দার, ‘প্রথম সংস্কারের ভূমিকা থেকে’, *শুভ্রা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ* (ঢাকা : মুক্তধারা, সেপ্টম্বর ১৯৮৫) [পৃ. সংখ্যা উল্লেখ নেই]

২ গিরিশচন্দ্র সেন অনূ, *কোরাণ শরিফ*, মুহাম্মদ আবদুল হাননান সম্পা. (ঢাকা : বিশ্বসাহিত্য ভবন, ২০১৪), পৃ. ২৭৩

৩ তদেব, পৃ.২৭৫

৪ জগদীশ চন্দ্র ঘোষ সম্পা.,*শ্রীমদ্ভগবদগীতা*(কলিকাতা : প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ৮ম সং., ১৯৫৮), পৃ. ১৩৭-১৩৮

৫ লেনিন আজাদ, *উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান : রাষ্ট্র, সমাজ ও রাজনীতি* (ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৭, পৃ. ৫১৮

৬ জিয়া হায়দার, *শুভ্রা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০

৭ জিয়া হায়দার, *থিয়েটারের কথা*, ৫ম খণ্ড (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, জুন ২০০৭), পৃ. ১৮৫

৮ লেনিন আজাদ, *ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান : রাষ্ট্র, সমাজ ও রাজনীতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১৭

৯ জিয়া হায়দার, *শুভ্রা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০-২১

১০ তদেব, পৃ.১৮

১১ শহীদ ইকবাল, *বাংলাদেশের নাট্যচর্যা (১৯৪৭-২০২১)* (কলকাতা : যাপনচিত্র, ডিসেম্বর ২০২১), পৃ. ৮৩
ফারহানা আখতার, *জিয়া হায়দার : জীবন ও নাট্যসাহিত্য* (ঢাকা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, জুন ২০১৪), পৃ. ৫

১২ অ্যাবসার্ড নাট্যকারের মানুষের মনের হতাশা, শূন্যতাবোধ, নৈরাশ্য প্রভৃতির সমন্বয়ে মানব-অস্তিত্বের (human’s existence) সংকট নিরূপণ করেন। যার মধ্য দিয়ে অ্যাবসার্ড নাটকের অন্তর্গত বাস্তবতা (inner psychological reality) চিত্রিত হয়। মার্টিন এসলিনের কথায় : ‘The realism of these plays is a psychological, and inner realism; they explaore the human sub-conscious in depth rather than trying to describe the outward appearance of human existence.’ [Martin Esslin, ‘Introduction’,*Absurd Drama*, With an introduction by Martin Esslin (Great Britain: Penguin Books, 1965), p. 23]

১৩ Samuel Beckett, *Waiting for Godot* (London : Faber and Faber Limited, 2nd edition, 1965), p. 9

১৪ Normand Berlin, ‘The Tragic Pleasure of *Waiting for Godot*’, *Samuel Beckett’s Waiting for Godot,* Edited by Harold Bloom(New York: Bloom’s Literary Criticism, new edition, 2008), p. 61

১৫ Samuel Beckett, *Waiting for Godot*, Ibid, p. 94

১৬ জিয়া হায়দার, *শুভ্রা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫

১৭ Martin Esslin, ‘Introduction’,*Absurd Drama*, With an introduction by Martin Esslin (Great Britain: Penguin Books, 1965), p. 23

১৮ Samuel Beckett, *Waiting for Godot*, Ibid, p. 91

১৯ জিয়া হায়দার, *শুভ্রা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮-৬৯

২০ Samuel Beckett, *Waiting for Godot*, Ibid, p. 46

২১ জিয়া হায়দার, *শুভ্রা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬

২২জিয়া হায়দার, ‘নাটকের কথা’, *এলেবেলে*, (ঢাকা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ, মে ১৯৮১), [পৃ. সংখ্যা উল্লেখ নেই]

২৩ আতাউর রহমান, ‘নাট্যপ্রযোজনায় নির্দেশকের ভূমিকা’, *নাট্যপ্রবন্ধ বিচিত্রা* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৯৫), পৃ. ৬৬

২৪ Jules Eugène Louis Jouvet, *The Art of Acting*, translated from French by Robert Cohen (London: Routledge, 1991), p. 72

২৫ জিয়া হায়দার, ‘গ্রুপ থিয়েটার ও বাংলাদেশের প্রেক্ষিত’, *নাট্য বিষয়ক নিবন্ধ* (ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৮১), পৃ. ১৮-২৩

২৬ মমতাজউদদীন আহমদ, ‘বাংলাদেশের নাটক ও বিবিধ কথা’, *সমকাল*, ইসমাইল মোহাম্মদ সম্পা. (ঢাকা : বিংশ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৮৫), পৃ. ৭৮

২৭ জিয়া হায়দার, *এলেবেলে*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১-২

২৮ Keith Johnstone, *Impro: Improvisation and the Theatre* (London: Routledge, 1981), p. 7

২৯ অন্‌জন্ দাশগুপ্ত, ‘ইম্প্রোভাইজেশান’, *নাটক : তত্ত্ব ও শিল্পরূপ : নাট্যকলা বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন*, রামেন্দু মজুমদার সম্পা. (ঢাকা : সোসাইটি ফর এডুকেশান ইন থিয়েটার, আগস্ট ১৯৯৭), পৃ. ৯৮

৩০ William Shakespeare, ‘As You Like It’, *Shakespeare : Complete Works*, Edited by W. J. Craig (New York : Oxford University Press, 1905), p. 227

৩১ জিয়া হায়দার, *এলেবেলে*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮

৩২ তদেব, পৃ.৪৯

৩৩ তদেব, পৃ.৫৩

৩৪ তদেব, পৃ.৫৬

৩৫ তদেব, পৃ.৫৭

৩৬ Martin Esslin, ‘The Significance of the Absurd’, *The Theatre of the Absurd*, (London : Bloomsbury Academic, Bloomsbury Revelations edition, 1st published in 2014), pp. 350-351.

৩৭ এখানে ‘সাধারণ নাটক’ (Normal Drama) বলতে মূলত ‘অ্যাবসার্ড নাটক’ ব্যতীত সকল নাটকেই বোঝানো হয়েছে। রোনাল্ড হেইম্যান (Higham Ronald Hayman; ১৯৩২-২০১৯)-ও *Waiting for Godot*’র সাথে অন্যান্য নাটকের পার্থক্য দেখাতে সকল নাটকে ‘NormalDrama’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন : ‘The tensions of the <u>normal play</u> are constructed around the interaction of the characters and the ignorance of the audience about what’s going to happen next. In *Waiting for Godot* they soon get to know that nothing is going to happen next and that there’s no chance of any development of character through relationships.’ [Ronald Hayman, ‘Waiting for Godot’, *Samuel Beckett*, (London : Heinemann Educational Books Ltd, 1st published in 1968), pp. 5-6]

৩৮ The realism of these plays (Absurd Drama) is a psychological, and inner realism; they explor the human subconscious in depth rather than trying to describe the outward appearance of human existence. [Martin Esslin, ‘Introduction’,*Absurd Drama*, With an introduction by Martin Esslin (Great Britain: Penguin Books, 1965), p. 23]

৩৯ অন্‌জন্ দাশগুপ্ত, ‘ইম্প্রোভাইজেশান’, *নাটক : তত্ত্ব ও শিল্পরূপ : নাট্যকলা বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯

২৫ এপ্রিল ২০২৪
শহীদ তাজউদ্দিন আহমদ সিনেট ভবন
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী ॥ বাংলাদেশ

ক্রোড়পত্র

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মের দুশ বছর উপলক্ষ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা গবেষণা সংসদ গত ২৫ এপ্রিল ২০২৪ দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করে। সে সেমিনারে দেশি-বিদেশি বিদগ্ধজন মধুসূদন আলোচনায় অংশ নেন। সেখানে আলোচনার পাশাপাশি বিভিন্ন অধিবেশনে কিছু একাডেমিক প্রবন্ধও উপস্থাপিত হয়। প্রবন্ধগুলো নিয়ে তখন মূল্যবান অভিমত ও আলোচনার পরিসর তৈরি হয়। এখানে সেই সম্মেলনের লিখিত প্রবন্ধগুলো মুদ্রণের প্রয়াস পাওয়া গেল। (সম্পা.)

মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাব্যচিন্তা : সৃজনশীলতার সামগ্র্য

সৌভিক রেজা*

সারসংক্ষেপ

মাইকেলের সামগ্রিক কাব্য-ব্যক্তিত্বের বিষয়ে এইটি আজ মেনে নিতেই হয় যে, তিনি ছিলেন, যাঁকে বলা যায়, একজন আত্মসচেতন কবি। তিনি বাংলা কাব্যের ধমনীতে যে নতুন রক্ত প্রবাহের সৃষ্টি করতে চলেছেন, সে-বিষয়ে মাইকেল মধুসূদন ছিলেন আত্মবিশ্বাসী। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ঐতিহ্যের যৌথ ধারাকে আত্মস্থ করে যে নতুন ভঙ্গিতে কাব্যনির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, সে-ভঙ্গির বিষয়ে তিনি ছিলেন স্বচ্ছ দৃষ্টির অধিকারী। এককথায় বলা যায়, নিজের কাব্যবোধ ও কাব্যানুচিন্তন সম্পর্কে মধুসূদন ছিলেন সচেতন প্রতিভা ও কাব্য-দক্ষতার অধিকারী। আধুনিক বাংলা কবিতার ঐতিহ্যের ধারায় মাইকেলের অবদানের কথা নানাভাবে স্বীকার করা হয়ে থাকে ঠিকই, কিন্তু তাঁর কাব্যচিন্তা, কাব্যানুচিন্তন বিষয়ে কোনো বিস্তারিত আলোচনা, এখনও পর্যন্ত, খুব-একটা দেখা যায়নি। মাইকেলের কাব্যচিন্তার সামগ্রিক পরিচয়পর্বের পর্যালোচনা করাই আমাদের এই প্রবন্ধের অন্বিষ্ট।

---

১. পাঠকচিত্তপ্রভাবক শক্তি

মাইকেল মধুসূদন দত্ত আধুনিক বাংলা সাহিত্যের নির্মাতাদের একজন। শুধু এইটুকুতেই তাঁর গোটা অবদানকে চিহ্নিত করা অনুচিত। তিনি ছিলেন এমন একজন সাহিত্যিক, যিনি তাঁর উদ্ভাবনী সৃজনীশক্তি দিয়ে, বাংলা সাহিত্যে নতুন রূপান্তর ঘটাতে সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন। যে-কারণে মাইকেলের সামর্থ্য ও স্বাতন্ত্র্যকে গভীরভাবে গুরুত্ব দিতে রবীন্দ্রনাথ, তাঁর অনেক দ্বিধা নিয়েও, কখনো পিছপা হননি। তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন, 'একদিন বঙ্গসাহিত্যে একমাত্র মাইকেল মধুসূদনের মধ্যে সমস্ত বাংলা কাব্যসাহিত্যের সাধনা সিদ্ধ হইয়াছিল।' (রবীন্দ্রনাথ : নবম খণ্ড, ১৪২১ : ৫৯৬)। শুধুই একা রবীন্দ্রনাথ নন, উত্তরকালে মোহিতলাল মজুমদারের মতো প্রাজ্ঞ সমালোচকও কাব্যসৃষ্টিতে মধুসূদনের 'আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রসার'কে মোহিতলাল স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাঁর মতে, 'আধুনিক কালের...বাংলা সাহিত্যকে ভবিষ্যৎ মহাতীর্থের অভিমুখে পথ চিনাইয়া দেওয়ার ভাগবতী প্রেরণা পাইয়াছিলেন—যুগাবতার কবি শ্রীমধুসূদন।' (মোহিতলাল, ১৯৯৮: ২৪২-২৪৩)।

এসবের আরও অনেক পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো বিরাট প্রতিভাবান সাহিত্য-পুরুষ নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছিলেন, 'এই প্রাচীন দেশে, দুই সহস্র বৎসরের মধ্যে কবি একা জয়দেব গোস্বামী।...জয়দেব গোস্বামীর পর শ্রীমধুসূধন।' (বঙ্কিম, ১৪১৭ : ৮০৮)। আবার অন্যদিকে, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মতো মননশীল অভিজ্ঞানপ্রাপ্ত কবি স্বীকার করতে ভোলেননি যে, 'মাইকেল শুধু ম্রিয়মাণ বাংলা কাব্যকে জাগিয়ে তুলে, ঝিমিয়ে পড়েননি', সেইসঙ্গে

---

*প্রফেসর এ কে এম মাসুদ রাজা (সৌভিক রেজা), বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

তিনি, 'বাঙালী কবিকে তরজাওয়ালার দল থেকে বাঁচিয়েছিলেন।' (সুধীন্দ্রনাথ, ১৯৯৫: ২৪৪)। মাইকেলের কৃতিত্বকে 'ভুলভাবে' ব্যাখ্যা করা সত্ত্বেও বুদ্ধদেব বসু শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেছিলেন যে, 'মাইকেল পুরোমাত্রায় সচেতন শিল্পী। শুধু যে বাংলা ছন্দে যুক্তবর্ণের পরম রহস্যের তিনি আবিষ্কর্তা তা নয়; বাংলা স্বর-ব্যঞ্জনের ফলদ প্রয়োগ সম্বন্ধেও অবহিত ছিলেন।'(বুদ্ধদেব, ১৩৬১: ৪২-৪৩) আর এরই সূত্র ধরে বিষ্ণু দে-র মতো মার্কসীয় দর্শনে আস্থাশীল কবি এই ব্যাপারটিও উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, 'পশ্চিম ইওরোপের স্বপ্নে আমাদের মুক্তি নেই, না ভাড়া-করা পাপের সন্ধানে, না অস্মিতার জীবন্মৃত ক্লান্তিতে, না সাম্রাজ্যবাদের বা স্বাধীন সংস্কৃতির ছদ্মবেশী হাহাকারে।' (বিষ্ণু দে, ১৯৬৭ :১৬) যে-হাহাকারের প্রতিধ্বনি আমরা আজও শুনতে পাই মাইকেলের সৃষ্ট চরিত্রগুলোর প্রাত্যহিক জীবনের বিচিত্র বিন্যাসের এক কাব্যিক সূত্রে।

২. প্রতিভার পরাকাষ্ঠা

মাইকেলের সামগ্রিক কাব্য-ব্যক্তিত্বের বিষয়ে এইটি আজ মেনে নিতেই হয় যে, তিনি ছিলেন, যাঁকে বলা যায়, একজন আত্মসচেতন কবি। তিনি বাংলা কাব্যের ধমনীতে যে নতুন রক্ত প্রবাহের সৃষ্টি করতে চলেছেন, সে-বিষয়ে মাইকেল মধুসূদন ছিলেন আত্মবিশ্বাসী। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ঐতিহ্যের যৌথ ধারাকে আত্মস্থ করে যে নতুন ভঙ্গিতে কাব্যনির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, সে-ভঙ্গির বিষয়ে তিনি ছিলেন স্বচ্ছ দৃষ্টির অধিকারী। এককথায় বলা যায়, নিজের কাব্যবোধ ও কাব্যানুচিন্তন সম্পর্কে মধুসূদন ছিলেন সচেতন প্রতিভা ও কাব্য-দক্ষতার অধিকারী। আর তারই পরিণামে পশ্চিমা কাব্যসম্ভার থেকে দুহাতে ঋণ নিয়ে, নিজের কাব্যকে সৌকর্যমণ্ডিত করতে মধুসূদন কখনোই সম্মত ছিলেন না।আধুনিক বাংলা কবিতার ঐতিহ্যের ধারায় মাইকেলের অবদানের কথা নানাভাবে স্বীকার করা হয়ে থাকে ঠিকই, কিন্তু তাঁর কাব্যচিন্তা, কাব্যানুচিন্তন বিষয়ে কোনো বিস্তারিত আলোচনা, এখনও পর্যন্ত, খুব-একটা দেখা যায়নি। মাইকেলের কাব্যচিন্তার সামগ্রিক পরিচয়পর্বের পর্যালোচনা করাই আমাদের এই প্রবন্ধের অন্বিষ্ট।

তাঁর কাব্যচিন্তাকে মাইকেল শুধুমাত্র তাঁর কবিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি, এর বাইরেও সমাজ, ধর্ম, ভাষা-সংস্কৃতি সম্পর্কে বেশ কিছু মূল্যবান কথা তিনি তাঁর চিঠিপত্রে নানাভাবে বলে গিয়েছেন। আবারও বলি, শুধুই কাব্য নয়; সেইসঙ্গে নিজের সমাজ, সমাজের মানুষ, তাদের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি, সমাজের সাংস্কৃতিক পরিধি ও তার বিস্তার, বাংলার জনজীবনের পাশাপাশি, তার ভাষা, সাহিত্যরুচি—এইসব নিয়েও মাইকেলকে বিস্তর কথা বলতে হয়েছে। অধ্যাপক হানা পিখোভা (Hana Pichova) খুবই সঙ্গতভাবে বলেছিলেন, 'The writer who does succeed must first not only gain mastery over words and subject matter but also over cultural knowledge of the past and present.' (Pichova, 2002 : 87)। এই বিষয়টা নিয়ে মাইকেল মধুসূদনকে আলাদা করে ভাবতে

হয়নি, বরং নিজের লেখালেখির তাগিদ থেকেই চারপাশের বৃহত্তর জগৎ ও পরিবেশ তাঁর কাব্যচিন্তার অন্তর্গত হয়ে উঠেছিল।

৩. আপনসৃষ্ট কাব্যজগৎ

ব্রিটিশ কবি ও সমালোচক গ্রিগসন (Geoffrey Grigson : 1905 – 1985) বলেছিলেন, 'Poets are Proud people, who try to defeat time.' (Grigson, 1962 :11)। কবিস্বভাবের অন্তর্গত কাব্যিক বোধ, যাকে বলা যায় কাব্য-অহংকার, যা ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বেরও একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য, মধুসূদনের কাব্যচিন্তার মধ্যে স্পষ্টতই সেটি দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর কাব্যচিন্তাকে তিনি দুজন ব্যক্তির কাছে, যাঁরা ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু, অকপটে প্রকাশ করেছিলেন। এঁদের একজন হচ্ছেন—গৌরদাস বসাক (১৮২৬–১৮৯৯) আর অন্যজন রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬–১৮৯৯)। মধুসূদন-গবেষক ও জীবনীকার গোলাম মুরশিদ জানিয়েছেন, 'গৌরদাস ছিলেন মধুর [মধুসূদন দত্ত] সবচেয়ে প্রিয় এবং সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। যখন তাঁরা হিন্দু কলেজে পড়তেন, তখন তাঁরা দুজন পরস্পরকে রীতিমতো ভালোবাসতেন। কিন্তু হিন্দু কলেজ থেকে বেরিয়ে গৌড়দাস সাহিত্য এবং শিক্ষা সংক্রান্ত পেশা বেছে নেননি। বরং হয়েছিলেন শিক্ষা কর্মকর্তা।' জনাব মুরশিদ প্রাসঙ্গিকভাবেই বলেছেন, 'গৌরদাসের নাম যে বাংলা সাহিত্য ও বঙ্গীয় সংস্কৃতির ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, তার কারণ প্রধানত মাইকেল মধুসূদনের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব।' (মুরশিদ, ২০১৩ : ১৪)। গৌড়দাসকে মাইকেল কী চোখে দেখতেন, সেটি তিনি স্পষ্টভাবেই জানিয়েছিলেন, 'এই বিশাল দুনিয়ায় এমন আর কেউ নাই, যাকে আমি তোমার মতো গুরুত্ব দিই। তোমার মধ্যে একাধারে রয়েছে মহত্ত্ব, উদারতা, স্বার্থহীনতা, কোমলতা—কী নেই!' (গুপ্ত, ১৯৮৭ : ৫২৩। চিঠির তারিখ : ২৫ নভেম্বর ১৮৪২)। তার মানে হচ্ছে, শুধুমাত্র ঘনিষ্ট বন্ধু বলেই নয়, যোগ্য ব্যক্তি মনে করেছিলেন বিধায় মাইকেল তাঁর কাব্যচিন্তার গুরুত্বপূর্ণ সূত্রগুলো অকপটে গৌরদাস বসাকের কাছে চিঠির মাধ্যমে ব্যক্ত করেছিলেন। ইন্দিরা দেবীকে লেখা এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, 'আমাদের যা শ্রেষ্ঠ প্রকাশ সে আমরা কাউকে কেবল নিজের ইচ্ছা-অনুসারে দিতে পারি নে। সে আমাদের আয়ত্তের অতীত, তা আমাদের দানবিক্রয়ের ক্ষমতা নেই।' একইসঙ্গে তিনি এ-ও জানিয়েছিলেন, 'কারো কারো এমন একটি অকৃত্রিম স্বভাব আছে যে, অন্যের ভিতরকার সত্যটিকে সে অত্যন্ত সহজেই টেনে নিতে পারে। সে তার নিজের গুণে।' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৮ : ১২৬)। সেই গুণটি গৌড়দাস বসাকের ছিলো।

গোলাম মুরশিদ বলেছেন গৌরদাস বসাককে লেখা মাইকেলের চিঠিগুলো 'প্রধানত ব্যক্তিগত'। (মুরশিদ, ২০২৩ : ১৮)। কথাটি পুরোটা ঠিক নয়। আমরা দেখি যে এইসব চিঠিতে ব্যক্তিগত কথাবার্তা রয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেইসঙ্গে সাহিত্য ও ভাষা নিয়েও সেখানে কথা কম নেই। বিশেষ করে মাইকেল সাহিত্যচর্চার মধ্যে দিয়ে, প্রধানত কী হতে চাচ্ছেন, সাহিত্যে নতুন বিষয় ও ভঙ্গির মাধ্যমে ভাষার আদল কীভাবে পরিবর্তন করবেন, বাংলা

ভাষা সম্পর্কে তাঁর কী মনোভাব—এইসব নিয়েও সেই চিঠিগুলোতে অনেক আলোচনা রয়েছে।

মধুসূদন সর্বতোভাবে একজন কবি হতে চেয়েছিলেন, তাঁর বিদেশ গমনের যে-ইচ্ছা, সেটিও সেই প্রত্যাশারই একটি প্রতিফলন বলা যায়। কবিতার জন্যে তিনি সবকিছু, এমনকি নিজের পিতা-মাতাকেও, ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন। আর সেই বিষয়ে বন্ধু গৌড় বসাককে অনেকটা কৈফিয়তের সুরে বলেছেন, 'আমি আমার মা-বাবাকে ত্যাগ করছি, এই কারণে তুমি হয়ত আমাকে খুবই নিষ্ঠুর বলে মনে করছো। কিন্তু আলেকজান্ডার পোপের কথা মনে করো। তিনি বলেছিলেন, কবিতার জন্যে মা-বাবাকে পর্যন্ত পরিত্যাগ করতে হবে।' (গুপ্ত, ১৯৮৭ : ৫২৪। চিঠির তারিখ : ২৬ নভেম্বর ১৮৪২)

ব্রিটিশ কবি-সমালোচক আলেকজান্ডার পোপ সম্পর্কে অধ্যাপক প্যাট রজার্স (Pat Rogers) বলেছেন, 'Pope is a professional poet in a more obvious and directsense than the discussion so far reveals.'এসবের পাশাপাশি তিনি ছিলেন 'a highly allusive poet, and even with a number of self-denying ordinances.' (Rogers , 2006 : xi)। এখানে যে-বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, সেটি হচ্ছে, রজার্সের ভাষায়,'In the nineteenth century, Pope was especially fortunate in his admirers. Byron was a resolute defender of Pope's reputation, adducing his example in opposition to what he saw as the provincialism and self-indulgence of much Romantic poetry.' (Rogers , 2006 : xxi)

শুধুই আলেকজান্ডার পোপ (Alexander Pope : 1688–1744)একা নন, মাইকেলের কাব্যাদর্শে আমরা প্রাচ্যের বাল্মিকী, কালিদাস থেকে শুরু করে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর, রঙ্গলালকে যেমন পাচ্ছি; ঠিক তেমনই পাই প্রতীচ্যের হোমার (Homer : 8th century BC), ভার্জিল (Virgil : 70 BC–19 BC), পেত্রার্কা (Francis Petrarch : 1304–1374), ট্যাসো (Torquato Tasso : 1544 –1595) , মিলটন (John Milton : 1608–1674), বায়রন (George Gordon Byron : 1788–1824) প্রমুখ। এই নামগুলো মধুসূদন কিন্তু এমনি-এমনি উল্লেখ করেননি। তাঁর চিঠিপত্রের ধারা অনুসরণ করলে দেখা যাবে, এক বা একাধিক সুনির্দিষ্ট কার্যকারণসূত্রে এইসব কবির নাম তাঁর চিঠিপত্রে উঠে এসেছে। যেমন একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন, 'টমের লেখা বায়রনের জীবনীটি পড়ে শেষ করলাম। আমার প্রিয় কবির মৃত্যুর বিস্তারিত বিবরণ যে অধ্যায়ে আছে, সেই অধ্যায়টি পড়তে গিয়ে আমি চোখের জল বিসর্জন দিয়েছি। এমন পাষণ্ড কি কেউ আছে যে টমের লেখা এই অধ্যায়টি পাঠ করে চোখের জল না-ফেলে থাকতে পারে!' (গুপ্ত, ১৯৮৭ : ৫২৫। চিঠির তারিখ : ২৭ নভেম্বর ১৮৪২)। এখানে বায়রনের জীবনীকার আইরিশ সাহিত্যিক টমাস মুরের (Thomas Moore) লেখা দুখণ্ডের 'Life of Lord Byron: with His Letters and Journals' (1830, 1831) বইটির কথা মাইকেল বুঝিয়েছেন। বায়রন, যিনি কিনা গ্যেটের মতে, শেক্সপিয়রের পরে শ্রেষ্ঠ ইংরেজি কবি; তাঁর কবি-প্রতিভা মাইকেলকে মুগ্ধ

করেছিলো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই ব্রিটিশ কবির জীবন ও কাব্যপ্রতিভার সঙ্গে মাইকেলের কাব্যপ্রতিভা ও জীবনের আশ্চর্যজনক সাদৃশ্যও চোখে পড়ে। সমালোচক-সম্পাদক ওয়ামসলির(D. M. Walmsley) মতে, 'Byron the man and Byron the poet are not to be separated from each other, and some acquintance with his life and with the circumstances that helped to form his complex personality will enable the reader the better the better to appreciate his work.' (Walmsley, 1946 : 2)।মাইকেলের কবি-মানসে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের কবি-সমালোচকবৃন্দ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

৪. জলে ভাসমান নৌকা

মাদ্রাজ থেকে মাইকেল তাঁর সৃষ্টিকর্ম সম্পর্কে বন্ধু গৌড়দাসকে জানাচ্ছেন, 'তুমি জেনে অবাক হবে, নানা ধরনের বিপদ ও বিড়ম্বনার মধ্যে ঘুরপাক খেয়েও আমি এরই মধ্যে একটি বই প্রেসে ছাপাবার জন্যে তৈরি করে ফেলেছি। একজন লেখক হবার জন্যে এটিই আমার প্রথম পরিকল্পিত প্রয়াস। এটি হচ্ছে একটা বা দুটো সর্গে লেখা কাহিনি কবিতা।' (গুপ্ত, ১৯৮৭ : ৫৩১। চিঠির তারিখ : ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৯)। আমরা বুঝতে পারি যে মাইকেল এখানে দুই সর্গে রচিত তাঁর "Captive Ladie" কাব্যের কথা বুঝিয়েছেন। এই কাব্যের সফলতা নিয়ে মাইকেল খুব উঁচু ধারণা পোষণ করতেন। তাঁর চিঠিতেও সেই নমুনা দেখতে পাওয়া যায়। মাইকেল লিখছেন, 'আমি যদি এই কাব্যটার জন্য পাঠকদের কাছ থেকে অনুকূল সাড়া পাই, তাহলে পাঠকদের সমাদর শীতল হবার আগেই আবারও নতুন রচনা নিয়ে তাঁদের সামনে হাজির হবো।' আর সেইসঙ্গে তিনি তাঁর মনের আকাঙ্ক্ষার কথা বন্ধু গৌড়দাসকে খুলে বলতে গিয়ে জানিয়েছিলেন, 'আমি মনে-প্রাণে যা চাই, সেটি হচ্ছে, পাকাপোক্তভাবে একজন সাহিত্যসেবী হয়ে ওঠা। এর জন্যে আমার দরকার প্রতিমাসে কয়েকশ টাকা আর ভদ্রগোছের একটি জীবন। কিন্তু সেটাই-বা আমাকে দেবে কে? দিতে পারে এমন কেউ কি গোটা ভারতবর্ষে নেই? অবশ্য সময়ই সেটা বলে দেবে।' (গুপ্ত, ১৯৮৭ : ৫৩৩। চিঠির তারিখ : ১৯ মার্চ, ১৮৪৯)। কাব্যের পাশাপাশি নিজের উপরও মাইকেলের আত্মবিশ্বাস এই সময় থেকেই ধীরে-ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। কাব্য-রচনা সম্পর্কে নিজের প্রস্তুতির কথা জানাতে গিয়ে মাইকেল বলেছিলেন, 'ভূদেবকে বোলো যে, যখনই সে আমার কবিতা পাঠ করবে, হিন্দু পুরাণের উপর আমার দখল দেখে সে আশ্চর্য হয়ে যাবে। কেননা, এই রচনা [ক্যাপটিভ] পুরোপুরি ভারতীয় ঋষি, লক্ষ্মী, কামদেবতা, রুদ্রসহ যাবতীয় শয়তানে পরিপূর্ণ; যাদেরকে আমার রক্ষণশীল পূর্ব পুরুষেরা দেবতাজ্ঞানে পুজো করতেন।' (গুপ্ত, ১৯৮৭: ৫৩৩)। মধুসূদনের চিঠিতে উল্লিখিত 'ভূদেব' হলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭–১৮৯৪)। গোলাম মুরশিদ জানিয়েছেন, তিনি ছিলেন, 'মাইকেলের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন।' মুরশিদ আরও বলেছেন, 'ভূদেবের পরিবার ছিলো দরিদ্র এবং পুরোপুরি রক্ষণশীল। অপরপক্ষে, মধু ছিলেন ধনী এবং তুলনামূলকভাবে আধুনিক মনোভাবাপন্ন পরিবারের সন্তান।...দুজনের পটভূমিতে এই পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ভূদেব এবং মধু ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে ওঠেন।' (মুরশিদ, ২০২৩ : ১৭)।

মাইকেলের প্রত্যাশাকে ছিন্ন করে কলকাতার বেঙ্গল হরকরা (Bengal hurkaru)পত্রিকায় তাঁর এই কাব্যটির একটি বিরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। গোলাম মুরশিদের মতে, 'কোনো কোনো জায়গায় সমালোচনাটি কাব্য-সমালোচনা না-হয়ে ব্যক্তিগত আক্রমণে পরিণত হয়েছিলো। বলা বাহুল্য, মাইকেল এই সমালোচনা পড়ে মর্মাহত হয়েছিলেন।' (মুরশিদ, ২০২৩ : ৯১)। হরকরার বিরূপ সমালোচনায় মাইকেল খানিকটা ভেঙে পড়েছিলেন ঠিকই, তারপরও, বন্ধুকে লেখা এক চিঠিতে তিনি নিজেই গৌড়দাসকে আশ্বস্ত করেছিলেন এই বলে যে, 'আমি পৌরুষের সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছি। প্রয়োজনে বীর যোদ্ধার মতো লড়াই করতেও রাজি। কেননা, আমি চাই দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার—কবির লরেল পাতার মুকুট!' (গুপ্ত, ১৯৮৭ : ৫৩৫। চিঠির তারিখ : ৫ জুন, ১৮৪৯)। এর পাশাপাশি মাইকেল এটাও বলেছিলেন যে, এই কাব্যের জন্যে এমন কয়েকজনের প্রশংসা তিনি পেয়েছেন, যার ফলে হরকরার 'সামান্য গালমন্দ' সহ্য করতে পারবেন। সে-কারণেই মাইকেল বরং এটা জানার জন্যে উদগ্রীব ছিলেন, এই কাব্যটি তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছে কেমন লেগেছে? বিরূপ সমালোচনা নিয়ে, মাইকেল সাহিত্যে বোধ-বুদ্ধিসম্পন্ন এক প্রাজ্ঞজনের মতোই, নীরবে কষ্টটাকে আত্মস্থ করার চেষ্টা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সঙ্গতভাবেই বলেছিলেন, 'রুচির মার যখন খাই তখন চুপ করে সহ্য করাই ভালো, কেননা সাহিত্যরচয়িতার ভাগ্যচক্রের মধ্যেই রুচির কুগ্রহ-সুগ্রহের চিরনির্দিষ্ট স্থান। কিন্তু বাইরের থেকে যখন আসে উল্কাবৃষ্টি, সম্মার্জনী হাতে আসে ধূমকেতু, আসে উপগ্রহের উপসর্গ, তখন মাথা চাপড়ে বলি, এ যে মারের উপরি-পাওনা!' (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৪ : ৯৪)। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যে হাল্কা রসিকতার স্পর্শ থাকলেও রচয়িতার মনোবেদনা কিন্তু সেখানে ঢাকা পড়েনি, সেটি ঠিকই দেখতে পাওয়া যায়।

মাইকেল তাঁর মনোবেদনাকে সামলে নিয়ে বলেছেন, 'অনেক মাথাওয়ালাদের নিয়ে সাহিত্যসংক্রান্ত কিছু কাজ করা বেশ ঝামেলার বিষয়। কেননা, কোনো মানুষই নিতান্তই বাধ্য না-হলে অন্যকে উঁচু জায়গা ছেড়ে দিতে চায় না। যোগ্যতা বা গুণের সমাদর ও স্বীকৃতি পেতে হলে নীরবে ধৈর্য ধারণ করতে হয়।' (গুপ্ত, ১৯৮৭ : ৫৩৫। চিঠির তারিখ : ৫ জুন, ১৮৪৯)। শুধুই ধৈর্য ধারণ করা নয়, জীবনের এইসব অভিজ্ঞতা থেকে তিনি ধীরে-ধীরে শিখে নিচ্ছেন, 'I tell you that in this world we have all to cut out paths for ourselves.' ['আমি তোমাকে বলে রাখছি, এই দুনিয়ায় আমাদের প্রত্যেককেই নিজের-নিজের পথ নিজেকেই করে নিতে হবে।' (গুপ্ত, ১৯৮৭ : ৫৩৭। চিঠির তারিখ : ৬ জুলাই, ১৮৪৯)। 'ক্যাপটিভ'-এর বিরূপ সমালোচনায় তাঁর বন্ধুরাও হতাশ, সেটি বুঝতে পেরে, মাইকেল এই কাব্যটি প্রকাশের যৌক্তিকতা দেখিয়ে বলেন, 'আমি বুঝতে পারছি আমার কবিতা তোমাকে হতাশ করেছে। কিন্তু মনে রেখো, খ্যাতি বা যশের জন্যে নয়, এই বই আমি প্রকাশ করেছি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে, আমার ভবিষ্যতের পথকে সুগম করবার জন্যে। আমি দমবার পাত্র নই। তুমি জেনে রাখো, এখানে, মাদ্রাজে ক্যাপটিভ ভালোই সাড়া জাগিয়েছে।' (গুপ্ত, ১৯৮৭ : ৫৩৭)।

মাইকেলের জীবনীকার গোলাম মুরশিদ জানিয়েছিলেন, এতোকিছুর পরেও মাইকেল আশা করেছিলেন, ‘এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতি জন বেথুন হয়তো এ গ্রন্থের যথার্থ মূল্যায়ন করতে সমর্থ হবেন। তিনি আশায় বুক বেঁধে বেথুনকে বইয়ের একটি কপি পাঠালেন।’ মুরশিদের ভাষায়, ‘বেথুন কাব্যের গুণাগুণ সম্পর্কে কিছু না-লিখে দেশীয়দের মধ্যে যাঁরা ইংরেজিতে লিখতে চান, তাঁদের উপদেশ দিয়ে লেখেন যে, তাঁরা ইংরেজিতে না-লিখে তাঁদের মাতৃভাষায় লিখলে অধিকতর সাফল্য লাভ করবেন।’ (মুরশিদ, ২০২৩ : ৯১-৯২)। বেথুনের এই প্রতিক্রিয়ায় মাইকেল আবারও হতাশ হলেন ঠিকই, কিন্তু গোলাম মুরশিদের ভাষায়, ‘তাঁর উপদেশকে তিনি গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করলেন। এরপর তিনি ইংরেজিতে কবিতা লিখতে থাকলেন, কিন্তু কোনো ইংরেজি কাব্য প্রকাশ করতে চেষ্টা করেননি। বরং তিনি সংস্কৃতের মতো দেশীয় ধ্রুপদী ভাষাও সাহিত্য আরও যত্নের সঙ্গে শিখতে থাকেন, যাতে দেশীয় ভাষায় লিখে তাকে এক অসাধারণ উচ্চতায় তুলতে পারেন।’ (মুরশিদ, ২০২৩ : ৯২)। এই পর্বে এসে আমরা দেখতে পাই যে শুধুই সংস্কৃত নয়, এর পাশাপাশি মাইকেল, আরও কিছু ভাষা শেখার তীব্র আয়োজনে ব্যস্ত, ব্যগ্র। এর কারণ আর কিছুই নয়, বাংলা ভাষায় কাব্যচর্চার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করা। তাঁর নিজের সেই প্রস্তুতির একটা উদাহরণ দিতে গিয়ে বন্ধু গৌড়দাসকে মাইকেল লিখেছিলেন, ‘তুমি মনে করছো আমি ভাবনাহীন ও অবিবেচক একজন বাবা। কিন্তু তুমি হয়তো জানো না যে, আমি প্রত্যেকদিন কয় ঘণ্টা তামিল-ভাষাচর্চায় কাটাই। একটা স্কুলের ছাত্রের চেয়েও আমার জীবন ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে কাটে। আমার দৈনন্দিন রুটিন হচ্ছে—৬টা থেকে ৮টা হিব্রু ভাষা, ৮টা থেকে ১২টা স্কুল, ১২ টা থেকে ২টা পর্যন্ত গ্রিক, ২টা থেকে ৫টা পর্যন্ত তেলেগু ও সংস্কৃত, ৫টা থেকে ৭টা পর্যন্ত ল্যাটিন, ৭টা থেকে ১০টা পর্যন্ত ইংরেজি।’ আর এই ফিরিস্তির শেষে মাইকেল তাঁর বন্ধুকে প্রশ্ন করেন, ‘মাতৃভাষাকে সৌকর্যময় করে তোলার জন্যে আমি কি নিজেকে প্রস্তুত করছি না?’ (গুপ্ত, ১৯৮৭ : ৫৩৮। চিঠির তারিখ : ১৮ আগস্ট, ১৮৪৯)।

প্রকৃতপক্ষে এই প্রশ্নের উত্তর মাইকেলেরও জানা ছিলো। এতো সব ভাষা শেখার নেপথ্যের কারণ সম্পর্কে গৌড়দাসকেতিনি বলেছিলেন, ‘ভাষা যদি ব্যাকরণদুষ্ট না হয়, ভাব যদি হয় সুসংহত ও সমুজ্জ্বল, প্লট যদি হয় মনোগ্রাহী, চরিত্রচিত্রণ যদি হয় যথোপযুক্ত, তাহলে বিদেশী প্রভাব থাকলেই-বা কী এসে যায়? মুরের কবিতায় প্রাচ্যভাব রয়েছে বলে কি তুমি সেটা অপছন্দ করো? বায়রনের কবিতায় এশীয় আবহাওয়া আর কার্লাইলের গদ্যে জার্মানভঙ্গি আছে বলে কি সেসব তুমি অপছন্দ করো?’ (গুপ্ত, ১৯৮৭ : ৫৪১। চিঠির তারিখ : মধ্যজুলাই, ১৮৫৮)। এখানে আরও একটি বিষয় আমরা দেখতে পাই, সেটি হচ্ছে কাব্যের উপাদান সংগ্রহে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের কোন্ কোন্ উপাদানের দিকে তিনি হাত বাড়িয়ে দেবেন—এদিকে যেমন মাইকেলের দৃষ্টি সজাগ ছিলো, তেমনই কাদের জন্যে তিনি লিখছেন—সে-বিষয়েও মাইকেলের ধারণা ছিলো একেবারে পরিষ্কার। গৌড়দাসকে লেখা একটি চিঠিতে মাইকেল বলেছিলেন, ‘মনে রেখো, আমার দেশের সেইসব মানুষের জন্যেই

আমি লিখছি, যাদের চিন্তা- চেতনা আমারই মতোন, আর যাদের মন-মানসিকতা অল্পবিস্তর পশ্চিমা ধ্যান-ধারণা ও চিন্তাধারায় সিক্ত।' (গুপ্ত, ১৯৮৭ : ৫৪১)।

৫. নিরীহ আকাশের শ্রীসৌন্দর্য

এই যে মাইকেলের নিজের বয়ান থেকেই আমরা জানতে পারছি যে, তিনি সেইসব পাঠকের জন্যে লিখছেন 'যাদের মন-মানসিকতা অল্পবিস্তর পশ্চিমা ধ্যান-ধারণা ও চিন্তাধারায় সিক্ত।'—শুধু এইটুকুই নয়, এর পাশাপাশি আরেক দিকেও তিনি নজর দিয়েছিলেন। সেটি হচ্ছে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সংস্কৃত ভাষার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা। মাইকেলের ভাষায়, 'যা-কিছু সংস্কৃত তার প্রতি দাস্যমনোবৃত্তি নিয়ে প্রশংসামুখর হওয়ার যে-শৃঙ্খলে আমরা আবদ্ধ, সেসবের সবকিছুর শৃঙ্খল ভেঙে ফেলাই হচ্ছে আমার চেষ্টা।' (গুপ্ত, ১৯৮৭ : ৫৪১)। শুধুই সংস্কৃত নয়, যে-কোনো বিদেশি ভাষা থেকে শতভাগ ঋণ করে বাংলা কাব্য রচনার বিপক্ষে ছিলেন মাইকেল। এ-বিষয়ে তাঁর অভিমত হচ্ছে, 'In matters literary... I am too proud to stand before the world, in borrowed cloths. I may borrow a neck-tie, or even a waist coat, but not the whole suit.'অর্থাৎ কিনা সাহিত্য-সংক্রান্ত বিষয়ে বিদেশ থেকে ধার করা পোশাকে গোটা দুনিয়ার সামনে দাঁড়াতে তিনি রাজি নন। তাঁর ভাষায়, 'আমি একটা নেকটাই ধার করতে পারি, অথবা বড়ো জোর একটা ওয়েস্ট কোট, কিন্তু সম্পূর্ণ পোশাকটা ধার করা কখনোই নয়।' (গুপ্ত, ১৯৮৭ : ৫৪১)। মাইকেল যে-বিষয়টি তাঁর কাব্যচিন্তার গভীরতা দিয়ে ১৮৫৮ সালে সে-বিষয়টি বুঝতে পেরেছিলেন, আমাদের আধুনিকদের সেটি বুঝতে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে! কেন? না, এই সময়ে এসেই কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বলতে পেরেছিলেন, 'কবির ব্রত তার স্বকীয় চৈতন্যের রসায়নে শুদ্ধ চৈতন্যের উদ্‌ভাবন। বৈরাগ্যের দ্বারা, ত্যাগের সাহায্যে, আভিজাতিক মর্যাদাবোধের নির্দেশে এ- সাধনায় সিদ্ধি পাওয়া যায় না।' কেননা, 'কাব্যের মুক্তি পরিগ্রহণে; এবং কবি যদি মহাকালের প্রসাদ চায়, তবে শুচিবায়ু তার অবশ্যবর্জনীয়, তবে ভুক্তাবশিষ্টের সন্ধানে ভিক্ষাপাত্র হাতে নগরপরিক্রমা ভিন্ন তার গত্যন্তর নেই।' (সুধীন্দ্রনাথ, ১৯৯৫ : ১৫)। আবার এ-সবের পাশাপাশি কবি হিসেবে মাইকেল মধুসূদন দত্ত নিজেকে 'রোমান্টিক' হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। সুদূর ফ্রান্সের ভার্সাই থেকে লেখা এক চিঠিতে তিনি গৌরদাসকে জানাচ্ছেন, 'আমি অবশ্য এখনো সেই রোমান্টিকই আছি, তুমি তো জান আমার স্বভাবই ওইরকম। আমি একটু কবি-স্বভাবের। কবিদের অগাধ কল্পনা-প্রবণতা একজন মানুষকে বাস্তব জগতের উপযুক্ত হতে দেয় না। আমার চোখে আছে স্বপ্ন, মনে উচ্চাভিলাষ আর কিছুটা অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষা। তারপরও আমি ক্রমশ অভিজ্ঞ হয়ে উঠছি।' (গুপ্ত, ১৯৮৭ : ৫৯৯। চিঠির তারিখ : ২৬ জানুয়ারি, ১৮৬৫)। এই যে গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে তিনি বলছেন, 'Of course I am still romantic'—এর একটা সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য রয়েছে। রোমান্টিকতা কী? এই বিষয়ে বুদ্ধদেব বসুও অত্যন্ত স্পষ্ট করেই বলেছিলেন, 'আমি দুর্মরভাবে রোমান্টিকতার পক্ষপাতী।' এইটুকু বলেই নিজের দায়িত্ব সারেননি এই আধুনিক কবি। অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে জানিয়েছেন—'"রোমান্টিক" বলতে আমি

বুঝি—শুধু একটি ঐতিহাসিক আন্দোলন নয়, মানুষের একটি মৌলিক, স্থায়ী ও অবিচ্ছেদ্য চিত্তবৃত্তি।' সেইসঙ্গে তাঁর বক্তব্যটিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বুদ্ধদেব বলছেন, 'তারই নাম রোমান্টিকতা, যা ব্যক্তি-মানুষকে মুক্তি দান করে, স্বীকার করে নেয়—শুধুমাত্র ইস্ত্রি-করা, এটিকেট-মানা সামাজিক জীবটিকে নয়, নির্ভয়ে মানুষের অবিকল ও সমগ্র ব্যক্তিত্বকে; তার মধ্যে যা কিছু অযৌক্তিক বা যুক্তির অতীত, অনিশ্চিত, অবৈধ, অন্ধকার ও রহস্যময়, যা-কিছু গোপন, পাপোন্মুখ ও অকথ্য, যা-কিছু গোপন, ঐশ্বরিক ও অনির্বচনীয়—সেই বিশাল ও স্বতোবিরোধময় বিস্ময়ের সামনে, সন্দেহ নেই, মুখোমুখি দাঁড়াবার শক্তির নামই রোমান্টিকতা।' (বুদ্ধদেব, ১৯৯১ : ১৮২)। এখানে সময়ের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও মাইকেল ও বুদ্ধদেব বসুর চিন্তার সাধর্ম্য আমাদে কে খুব-একটা অবাক করে না। কারণ প্রকৃত কবিদের কাব্যচিন্তা যুগ-যুগ ধরে একই পরিধির মধ্যে ঘুরপাক খায়। তবে পরিধি এক হলেও তার বৈচিত্র্য কিন্তু নানারকম। আর কবিতাও সে-কারণেই যুগে-যুগে বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে পাঠকের কাছে।

অন্যদিকে, নিজের ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্যের প্রসঙ্গে রাশ টেনে নিয়ে সাহিত্য বিষয়ে, নিজের আরও বড়ো একটি প্রস্তুতির কথা বলতে গিয়ে গৌড়দাসকে লিখেছিলেন, 'একটা সহায় সম্বলহীন জাহাজের মত আমি মাসের পর মাস ফ্রান্সে পড়েছিলাম, কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে সেই দুঃসময়টাকে কাজে লাগাবার মতো মনের জোর ও প্রতিজ্ঞা আমার ছিলো। এই মহাদেশের তিনটা ভাষা আমি শিখতে পেরেছি—এগুলো হলো ইতালীয়, জার্মান ও ফরাসি।' (গুপ্ত, ১৯৮৭ : ৫৯৯। চিঠির তারিখ : ২৬ জানুয়ারি, ১৮৬৫)। কেন এই ইউরোপীয় ভাষা শেখার এতো আয়োজন। এসবের নিহিত তাৎপর্য বিষয়ে বলতে গিয়ে মাইকেল তার বন্ধু গৌড়দাসকে জানিয়েছিলেন, 'ইউরোপীয় একটি ভাষায় জ্ঞান অর্জন করা মানে উৎকৃষ্টরূপে চাষ করা বিশাল ভূ-সম্পত্তির মালিক হওয়া—আমি অবশ্য জ্ঞানবুদ্ধি সংক্রান্ত সম্পদের কথাই বলছি।' শুধু এইটুকুতেই মাইকেল তাঁর ইচ্ছাকে বৃত্তাবদ্ধ রাখেননি। তিনি আরও বলেছিলেন, 'যদি বেঁচে থাকি, যদি দেশে ফেরার সুযোগ পাই, তবে আমার শিক্ষিত বন্ধুদের আমি আমাদের ভাষার মাধ্যমে এসব ভাষার সঙ্গে পরিচয় করাবো।' কেন তিনি এসব করবেন? তার কারণ হচ্ছে, ততোদিনে মাইকেল জেনে-বুঝে গিয়েছেন যে, 'নিজের-নিজের মাতৃভাষায় [সাহিত্য] চর্চা করা ও তার মাধ্যমে সেই ভাষাকে ঐশ্বর্যময় করে তোলার চেয়ে বড়ো কাজ আর কিছুই নেই।' (গুপ্ত, ১৯৮৭ : ৫৯৯)। শুধু এইটুকু বলেই তিনি ক্ষান্ত হননি। তাঁর অন্যতম প্রিয় কবি জন মিলটনের উদাহরণ টেনে বলেছিলেন, 'নিজের মাতৃভাষা ও স্বদেশের জন্যে হিতকর কিছু করার মহৎ উচ্চাশা ছিলো মিলটনের। আমাদের দেশে যাঁরা প্রতিভাবান আছেন, তাঁরা যেন মিলটনের ঐ ইচ্ছার মধ্যে দিয়ে অনুপ্রাণিত হন এই প্রার্থনা করি।' (গুপ্ত, ১৯৮৭ : ৫৯৯)। মিলটনের প্রতি মাইকেলের এই যে শ্রদ্ধাবনত হওয়া, এর নেপথ্যের প্রধান কারণ হচ্ছে, মিলটন ছিলেন, 'the last great liberal intelligence of the English Renaissance. The values expressed in all his works are the values of tolerance, feedom and self-determination.' (*Carter and MacRae,* 2009 : 122)।একইভাবে নিজের ভাষা ও

সংস্কৃতির প্রতি শর্তহীন আনুগত্য ছিলো বলেই মাইকেল বলতে পেরেছিলেন, ‘আমাদের মধ্যে এমন যদি কেউ থাকে, যে নাকি তাঁর নামটা রেখে যেতে চায়, যাতে করে নামটা কালের প্রবাহে একটা পশুর মতো তলিয়ে না-যায়, তাহলে তাঁকে মাতৃভাষা চর্চায় আত্মনিয়োগ করতেই হবে। সেটাই তো তাঁর কাজের প্রকৃত ও উপযুক্ত জায়গা।’ এই যে বিভিন্ন দেশের ভাষাচর্চা, সেই বিষয়ে সাহিত্যের একজন প্রবাদপ্রতিম অধ্যাপক গণেশ দেবী (Ganesh *Narayandas* Devy)বলেন, ‘সাহিত্যরস আস্বাদনের বৌদ্ধিক কাঠামোর একটি একভাষিক পদ্ধতি হিসেবে কখনোই সমালোচনার পরম্পরাকে সীমায়িত করা হয়নি। বরং এটি একটি বহুসাংস্কৃতিক ও বহুভাষিক উদ্যোগ হিসেবে পরিচিত লাভ করেছিল। বহুসংস্কৃতিবাদ ও বহুভাষিকতাকে কখনো সাংস্কৃতিক বিপর্যয় হিসেবে দেখা উচিত নয়। পাশ্চাত্য সাহিত্যের ইতিহাসে এই ধরনের কোনো নজির না থাকাকেই এই সংস্কৃতির ব্যর্থতা হিসেবে তুলে ধরা ঠিক নয়।’ (গণেশ, ২০১৭ : ১০৭)। মাইকেল মধুসূদন দত্ত একই ভাবনায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন বলেইউরোপীয় ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সেগুলোর চর্চা করতে চেয়েছেন। এর বিপরীত ব্যাপারটি নিয়ে কখনোই তিনি সেরকম ভাবেননি। মোটামুটিভাবে তাঁর বলার কথাটি ছিলো এই যে, ‘ইউরোপীয় ভাষায় জ্ঞানার্জন [European scholarship] করা ভালো কিন্তু আমরা যখন দুনিয়ার মুখোমুখি হবো তখন যেন নিজের ভাষায় কথা বলি। যাঁরা মনে করেন, তাঁদের মধ্যে নতুন চিন্তা-ভাবনার উৎস রয়েছে, তাঁরা যেন মাতৃভাষার শরণাপন্ন হন।’ (গুপ্ত, ১৯৮৭ : ৫৯৯)। বন্ধু গৌড়দাসকে লেখা এই কথাগুলো মাতৃভাষায় যাঁদের কোনো অধিকার জন্মায়নি, সেইসব শিক্ষিত মানুষের উদ্দেশেও যে বলা হয়েছে, মাইকেল সেইটি জানাতেও কসুর করেননি। এইভাবেই নিজের কাব্যচিন্তাকে একটা ‘বহুসাংস্কৃতিক ও বহুভাষিক উদ্যোগ’ হিসেবে নির্মাণ করতে খানিকটা হলেও সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন মাইকেল। নিজের ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি দেশের শিক্ষিত মানুষের চরম ঔদাসীন্য, তাঁর পক্ষে সহ্য করাটা ছিলো একটা দুঃসহ অভিজ্ঞতা। সে-কারণেই গৌড়দাসকে লেখা পত্রে তিনি বলেছিলেন,[আমি] ‘এতোক্ষণ তোমাকে একটা ছোটখাটো বক্তৃতা দিলাম, কিন্তু এইটা তাঁদের উদ্দেশেও বলা, যাঁরা নাকি নিজেদের কালো মেকলে [Swarthy Macaulays], কালো কার্লাইল [Swarthy Carlyles], ও কালো থ্যাকারে [Swarthy Thackerays] বলে মনে করে। আমি নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি, তাঁরা ওসব কিছুই নয়।’ শুধু তা-ই নয়; একেবারে চরম কথাটি বলতেও তিনি সেদিন একটুও দ্বিধা করেননি। অকপটে মাইকেল জানিয়েছিলেন, ‘মাতৃভাষায় যাদের নাকি কোনো কোনো অধিকারই জন্মায়নি, সেসব মানুষের নিজের ‘শিক্ষিত’ হিসেবে পরিচয় দেয়াটাকে আমি ঘৃণা করি।’ (গুপ্ত, ১৯৮৭ : ৫৯৯-৬০০)।

নিজের ভাষাকে তিনি ভালোবেসেছিলেন, কিন্তু তাই বলে অন্যদেশের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি মাইকেলের কোনো বিরাগ ছিলো না। বরং বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য ও সংস্কৃতি থেকে তিনি কাব্যিক উপাদান সংগ্রহের চেষ্টা করে গিয়েছেন আমৃত্যু। বন্ধু গৌড়দাস বসাককে লেখা চিঠিতে মাইকেল জানিয়েছিলেন, ‘অতি সম্প্রতি আমি ইতালিয় কবি পেত্রার্কার কবিতা পড়েছি, আর তাঁর মতো করে সনেট লেখার জন্যে কাগজে হিজিবিজি আঁকছি।’

শুধুই হিজিবিজি আঁকা নয়, তিনি যে সার্থক সনেট লিখেও ফেলেছেন, সেই আনন্দের সংবাদটিও বন্ধুকে নমুনাসহ পাঠিয়েছেন। মাইকেল তাঁর চিঠিতে লিখেছেন, এই সনেটগুলোর 'একটি হচ্ছে ঐ কপোতাক্ষ নদকে নিয়ে লেখা। এটি তোমাকে পাঠালাম। সেইসঙ্গে আরেকটি, যেটি আমি অনুবাদ করে আমার এখানকার ইউরোপীয় বন্ধুদেরকে শুনিয়েছি। তাঁদের সেটা খুবই পছন্দ হয়েছে। আমার ধারণা তোমারও ভালো লাগবে।' (গুপ্ত, ১৯৮৭ : ৬০০)। শুধু এইটুকু লিখেই তিনি ক্ষান্ত হননি, বাংলা ভাষা যে সনেট রচনার জন্যে উপযোগী, সেই বিষয়টিও বন্ধুকে জানিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমি জোর গলায় বলতে পারি এই সনেট, চতুর্দশপদী' আমাদের বাংলা ভাষায় চমৎকার লেখা যাবে। কিছুদিনের মধ্যেই আমি একটা ছোট বই বের করে ফেলতে পারি।... অনেক জিনিস তোমাকে পাঠাচ্ছি, আমার ইচ্ছে রাজেন্দ্রকে তুমি এগুলো দেখাও। কেননা, আমার মতে সে একজন সুবিচারক।' (গুপ্ত, ১৯৮৭ : ৬০০)। একজন সাহিত্য-সমালোচক হিসেবে রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে মাইকেল সবসময়ই শ্রদ্ধা করতেন, সে-কারণেই তাঁর মতামতও মাইকেলের কাছে ছিলো গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের অনেকেরই জানা আছে যে, মাইকেলের 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' প্রকাশের পরে রাজেন্দ্রলাল মিত্র কাব্যটির একটি প্রাঞ্জল ও ইতিবাচক সমালোচনা করেছিলেন। এটি ১৮৫৯ সালে 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' পত্রিকার অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সেখানে রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেছিলেন, 'তিলোত্তমার যে কোন স্থানে নয়ন নিক্ষেপ করা যায়, তাহাতেই প্রকৃত কবির লক্ষণ বিলক্ষণ প্রতীত হয়। সর্ব্বত্রই সুচারু-রসাত্মক ভাব অতি প্রোজ্জ্বল বাক্যে বিভূষিত হইয়াছে। ঐ ভাবসকল দত্তজ কবি ভুবনবিখ্যাত কালিদাস, ভবভূতি, হোমর, মিলটন প্রভৃতি কবিকুল কেশরদিগের রচনা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গভাষায় তাহার বিভাষণে দত্তজ কেবল অনুবাদ করিয়া নিরস্ত হয়েন নাই।...তাঁহার স্বাভাবিক কল্পনাবৃত্তির কৌশলে নূতন অবয়ব ধারণ করিয়াছে।' (রাজেন্দ্রলাল, ২০২৩ : ৫২)। রাজেন্দ্রলালের কথার সূত্র ধরে আমরা যদি খেয়াল করি, তাহলে দেখবো যে, নিজের ভাষা ও সাহিত্যের জন্যে যা-কিছু ভালো, উঁচু মানের উপাদান বলে তাঁর কাছে মনে হয়েছে, মাইকেল সেগুলো শুধু নিজের কাছেই লুকিয়ে-ছাপিয়ে রাখেননি, শিক্ষিত ও ভাষা-সচেতন বন্ধুদের সঙ্গেও তা নিয়ে আলোচনা করেছেন, তাঁদের মতামত জানতে তিনি উৎসাহী থাকতেন সবসময়ই। এইভাবেই মাইকেল মধুসূদন দত্ত একটা সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তৈরির চেষ্টা করে গিয়েছেন। কেননা, তিনি জানতেন এবং বুঝতেন যে একা-একা একটা ভাষাকে আধুনিক আকৃতি দেয়া কঠিন আর দেশীয় সাংস্কৃতিক পরিসরের সীমানাএকজন ব্যক্তির পক্ষে একা-একা বাড়িয়ে তোলা অসম্ভব-প্রায়। সে-কারণেই সমবেতভাবে তিনি একটি সচেতন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়বার কথা ভেবেছিলেন। সেইটি হয়তো ঘোষণা দিয়ে করেননি, কিন্তু ব্যক্তিগত পরিসর থেকে যতোটা সম্ভব, তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের, তৎকালীন প্রেক্ষাপটে, একটা আধুনিক চেহারা দেবার জন্যে পরিশ্রম করে গিয়েছেন। সাহিত্যের পাশাপাশি মাইকেলের এই অবদানের কথাও আমাদের আজ স্বীকার করা উচিত। তিনি শুধুই একজন কবি বা নাট্যকার বা

গদ্যলেখক ছিলেন না, বরং সেইসঙ্গে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির একজন অগ্রণী নির্মাতা ছিলেন।

ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ও ভালোবাসা থেকেই তিনি বলেছিলেন, 'বিশ্বাস করো বন্ধু, আমাদের বাংলা খুবই চমৎকার একটি ভাষা। শুধু এটাকে একটু মার্জিত করে তোলার জন্যে চাই কিছু প্রতিভাবান মানুষ।' ভাষার প্রতি আমাদের অবজ্ঞার একটা যৌক্তিক কারণও তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন। সেটি হচ্ছে, তাঁর মতে, 'শৈশবের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষার কারণে আমাদের অনেকেই এই ভাষার কিছুই জানে না, শুধুমাত্র ভাষাকে অবজ্ঞা করতে জানে।' (গুপ্ত, ১৯৮৭ : ৬০০। চিঠির তারিখ : ২৬ জানুয়ারি, ১৮৬৫)। এখানে তাঁর নিজেরও যে বেশ করণীয় কিছু রয়েছে, সেটিকে মাইকেল কখনোই অস্বীকার করেননি। অন্যদিকে, নিজের সক্ষমতার পাশাপাশি তাঁর সীমাবদ্ধতার বিষয়েও তিনি সচেতন ছিলেন। সেই কারণেই বন্ধু গৌড়দাসকে আক্ষেপের সুরে মাইকেল বলেছিলেন, 'এই ভাষাচর্চায় যদি আমি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করতে পারতাম, তাহলে আনন্দ পেতাম। কিন্তু তুমি তো জানো যে সাহিত্যিক-জীবন যাপনের মতো সংগতি আমার নেই।' কোথায় এবং কী কারণে তাঁর এই সীমাবদ্ধতা সেটিও তিনি বন্ধুকে খোলাখুলি বলতে পিছপা হননি। নিজের বিষয়ে মাইকেল বলেছিলেন, 'আমি নিতান্ত দরিদ্র একজন মানুষ। আর দরিদ্র মানুষ হিসেবে আমি গর্বিত।' আর তারপরই তাঁর সেই আক্ষেপ, 'আমাদের দেশে যার টাকা নেই, তার সম্মানও নেই। তোমার যদি টাকা থাকে, তুমি বড়ো মানুষ, যদি না থাকে কেউ তোমাকে তোয়াক্কা করবে না। এখনো আমরা একটি অধঃপতিত জাতি।' (গুপ্ত, ১৯৮৭ : ৬০০)। মাইকেলের এই আক্ষেপ শুধুমাত্র তাঁর একার আক্ষেপ নয়, সমস্ত সচেতন ও শিক্ষিত বাঙালির আক্ষেপ। এই আক্ষেপে আজও আমরা ভুগছি। এইভাবেই তিনি সাহিত্যে ও বাস্তবে জাতির কণ্ঠস্বরকে ধারণ করতে পেরেছিলেন। তাঁর কাব্যচিন্তার এটিও একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য। যা শুধুমাত্র কাব্য-প্রতিভা দিয়ে নির্মাণ করা সম্ভব নয়, তেমন একটি সমৃদ্ধ কাব্যচিন্তার নেপথ্যে কবির মনন ও সাধনার বড়ো ভূমিকা রয়েছে; সেসব মাইকেলের আয়ত্তে ছিলো।

৬. মানুষে-মানুষে কাব্যের যোগ

গৌড়দাস বসাকের চাইতেও রাজনারায়ণ বসুকে লেখা চিঠিতে মাইকেলের কাব্যচিন্তার আদল আরও বেশি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। গোলাম মুরশিদ জানিয়েছেন, 'এই চিঠিগুলোতে মাইকেল আলোচনা করেছেন প্রধানত তাঁর সাহিত্য বিষয়ে। কী লিখছেন, কী লিখবেন, কোনো একটা রচনায় কতোটা লিখেছেন, সেই লেখার সাহিত্যিক গুণাবলী কেমন ইত্যাদি হচ্ছে রাজনারায়ণকে লেখা চিঠিপত্রের বিষয়বস্তু।' (মুরশিদ, ২০২৩ : ১৮)। কে এই রাজনারায়ণ বসু? তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে মাইকেল জীবনীকার গোলাম মুরশিদ লিখেছেন, 'রাজনারায়ণের জন্ম ১৮২৬ সালে।... তিনি অধ্যয়ন করেন কলকাতার দুটি সবচেয়ে নাম-করা বিদ্যালয়—হেয়ার স্কুলে এবং হিন্দু কলেজে।' ছাত্রাবস্থায় মাইকেল ও রাজনারায়ণ ঠিক বন্ধু ছিলেন না। ১৮৫৯ সালে মাইকেলের 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'-র প্রথম সর্গ সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হবার পরে 'রাজনারায়ণ অযাচিতভাবে কাব্যটির প্রশংসা করে

একটি প্রবন্ধ লেখেন। মাইকেল তখন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং তাঁরা ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হন।' (মুরশিদ, ২০২৩ : ২১)। গোলাম মুরশিদ আরও জানিয়েছেন, রাজনারায়ণ বসু ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে সংগঠিত বিধবাবিবাহ আন্দোলনের একজন 'সক্রিয় সদস্য'। এছাড়াও তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো 'হিন্দু জাতীয়তাবাদে'র পক্ষে। রাজনারায়ণ বসুর গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে—'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' (১৮৭৩), 'সেকাল আর একাল' (১৮৭৪), 'হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত' (১৮৭৬),'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা' (১৮৭৮), 'আত্মচরিত' (১৩১৫ বঙ্গাব্দ) প্রভৃতি। 'রাজনারায়ণ বসু ১৮৯৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন।' (বারিদবরণ ঘোষ, ১৪০২: IX)।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'ছিন্নপত্রে' বলেছিলেন, 'যদি কোনো লেখকের সবচেয়ে অন্তরের কথা তার চিঠিতে প্রকাশ পাচ্ছে তা হলে এই বুঝতে হবে যে, যাকে চিঠি লেখা হচ্ছে তারও একটি চিঠি লেখাবার ক্ষমতা আছে।' (রবীন্দ্র, ১৪১৮ : ১২৬)। 'লেখাবারসেই ক্ষমতা'টি রাজনারায়ণ বসুরও ছিলো বলা যায়। রাজনারায়ণ সম্পর্কে মাইকেল বলেছিলেন, তিনি তাঁদের সময়ের একজন 'প্রতিনিধি-স্থানীয় ব্যক্তি'। মাইকেলের ভাষায়, 'You are, decidedly, one of the, one of the "Representative men" of the day, and your opinion may be fairly looked upon as an earnest of the future.' (গুপ্ত, ১৯৮৭ : ৫৪৫। এই চিঠির তারিখ : ২৪ এপ্রিল, ১৮৬০)। সেইরাজনারায়ণকে তাঁর 'তিলোত্তমা' প্রকাশের বিষয়ে খবর জানিয়ে মাইকেল লিখেছিলেন, 'অল্পদিনের মধ্যেই তিলোত্তমা প্রকাশিত হবে।' বইটি যে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় ছাপা হচ্ছে, সেটি জানিয়ে মাইকেল বলেন, 'বইটি খুব দ্রুত বের হতে যাচ্ছে, কিন্তু এখন প্রশ্ন হলো, এই বইটা ক'জন পড়বেন?'(গুপ্ত, ১৯৮৭ : ৫৪৫)। বোঝাই যাচ্ছে বাংলা বইয়ের পাঠকের সংখ্যার কথা ভেবে মাইকেলকে তখনকার দিনেও দুশ্চিন্তা করতে হয়েছে। সেই পরিস্থিতির উন্নতি আজকের দিনেও খুব বেশি-একটা ঘটেনি। এরপরেই মাইকেল লিখছেন, 'আমার কাব্যরীতি (style) তুমি সম্ভবত জটিল বলে মনে করো। কিন্তু, বিশ্বাস করো, আজকালকার যেসব সাহিত্যিক নিছক উত্তেজনা সৃষ্টির জন্যে লেখে, আমি সে-সব বেশিরভাগ "অন্তঃসারশূন্য ইতর"-দের মতো শব্দাড়ম্বতার (grandiloquent) সামান্যতম চেষ্টাও করি না।' (গুপ্ত, ১৯৮৭ : ৫৪৫)। তার কারণ হিসেবে মাইকেল জানিয়েছিলেন যে তাঁর কাব্যে 'শব্দগুলো আপনা-আপনি নিজে থেকে এসে কবিকে ধরা দেয়, এটিকে বলতে পারি অনুপ্রেরণা!' শুধু তা-ই নয়, মাইকেল তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিষয়ে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলেছিলেন, এই 'ছন্দকে ধ্বনিব্যঞ্জক হতেই হবে।' উদাহরণ হিসেবে তিনি ইংরেজি সাহিত্যের অমিত্রাক্ষর ছন্দের শ্রেষ্ঠ কবি জন মিলটনের নাম উচ্চারণ করেছিলেন। সেইসঙ্গে ভার্জিল ও হোমারের প্রসঙ্গ টেনে এনে বলেছিলেন, কবি হিসেবে তাঁরাও ঠিক 'সহজ'-কিছু নন। (গুপ্ত, ১৯৮৭:৫৪৫)। কবিতা আমাদের কাছে কঠিন লাগে কেন? কেন নতুন যুগের কবিতা সবসময়ই কোনো-না-কোনোভাবে দুর্বোধ্য বলে মনে হয়? কবিতা কেন আমরা বুঝতে পারি না? এর উত্তরে বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন, 'কবিতা সম্বন্ধে "বোঝা" কথাটাই অপ্রাসঙ্গিক। কবিতা আমরা বুঝিনে, কবিতা আমরা "অনুভব" করি।

কবিতা আমাদের কিছু "বোঝায়" না; স্পর্শ করে, স্থাপন করে সংযোগ।' (বুদ্ধদেব, ২০১২ : ২)। এই কথাটি মাইকেলের কবিতার বেলায়ও সত্যি।

'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' বাংলা ভাষায় মাইকেলের প্রথম রচনাকর্ম। কাজেই এই কাব্যে অনেক ভুল-ত্রুটি থাকাই স্বাভাবিক। *সঞ্চয়িতা*র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, 'সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাতসংগীত ও ছবি ও গান এখনো যে বই আকারে চলছে, একে বলা যেতে পারে কালাতিক্রমণ-দোষ। বালক যদি প্রধানদের সভায় গিয়ে ছেলেমানুষি করে তবে সেটা সহ্য করা বালকদের পক্ষেও ভালো নয়, প্রধানদের পক্ষেও নয়। এও সেইরকম। ওই তিনটি কবিতাগ্রন্থের আর কোনো অপরাধ নেই, কেবল একটি অপরাধ, লেখাগুলি কবিতার রূপ পায় নি। ডিমের মধ্যে যে শাবক আছে সে যেমন পাখি হয়ে ওঠে নি এটাতে কেউ দোষ দেবে না, কিন্তু তাকে পাখি বললে দোষ দিতেই হবে।' (রবীন্দ্রনাথ , ১৩৬২ : ভূমিকা)। সে-কারণেই মাইকেলেরও ভরসা ছিলো যে, রাজনারায়ণসহ বাঙালি সচেতন পাঠক তাঁর ঐ ত্রুটিগুলো অন্তত মার্জনা করবেন। খুবই স্বাভাবিক একটি প্রত্যাশা। সেইসঙ্গে এটিও জাহির করতে কার্পণ্য করেননি যে, 'আমি আমার কাব্যে সত্যিকার অর্থে এমন-একটা কিছু করে ফেলেছি, যা নাকি আমাদের "জাতীয় কাব্য"কে (national poetry) যথাযথভাবেই উন্নীত করতে সক্ষম হবে। বিশেষ করে, ভবিষতের কবিদের এমন একটা ভিন্ন রীতিতে লেখার জন্যে উৎসাহ জোগাবে, যা কিনা কৃষ্ণনগরের ইতরশ্রেণির কবিদের জনকের (the man of Krishnagar—the father of a very vile school of poetry) রীতি থেকে একেবারেই আলাদা।' এখানে মাইকেল 'কৃষ্ণনগরের কবি' বলতে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর (১৭১২-১৭৬০)-কেই বুঝিয়েছেন। 'ইতরশ্রেণির কবিদের জনক' হলেও ভারতচন্দ্র নিজে যে মার্জিত প্রতিভার অধিকারী (a man of elegant genius)ছিলেন, সেটি অকপটে মাইকেল স্বীকার করেছিলেন। তাঁর নিজস্ব কাব্যবোধ ও অভিজ্ঞতা থেকে তিনি এটিও বুঝতে পেরেছিলেন কবিতা রচনার জন্যে মার্জিত প্রতিভার অধিকারী হওয়া খুবই জরুরি। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ কবি হপকিন্স (Gerard Manley *Hopkins* : 1844 – 1889) বিশ্বাস করতেন যে, 'Every true poet, I thought, must be orginal and orginality a condition of poetic genius.' (Hopkins, 1967 : 165)। এইক্ষেত্রে ইংরেজ কবির সঙ্গে আমাদের বাংলার কবির কাব্যচিন্তার সাদৃশ্য, নিশ্চিতভাবেই আমাদের আনন্দের ও চিন্তার খোরাক জোটায়।

৭. শান্তির ইচ্ছে যখন সুখী হওয়া কাব্য

নিজের কাব্য-প্রতিভা সম্পর্কে মাইকেল মধুসূদন ছিলেন ভীষণভাবে সচেতন। সে-কারণে রাজনারায়ণ বসু তাঁকে 'জাতীয় মহাকাব্য' (national epic) রচনার প্রস্তাব দিলেও মাইকেল সরাসারি সেটি গ্রহণ করেননি। তিনি বরং রাজনারায়ণকে জানিয়েছিলেন, 'একটা জাতীয় মহাকাব্য রচনার যে প্রস্তাব তুমি করেছো, সেটি খুবই ভালো, চমৎকার। কিন্তু ওই বিষয়টিকে সার্থকভাবে মর্যাদা দেবার মতো কাব্যজ্ঞান ও দক্ষতা আমি এখনও অর্জন করতে পেরেছি বলে মনে হয় না। কাজেই তোমাকে আরও কয়েকটা বছর অপেক্ষা করতে হবে।' (গুপ্ত, ১৯৮৭ : ৫৪৬। এই চিঠির তারিখ : ২৪ এপ্রিল, ১৮৬০)। এরপরই বলেছেন,

'আমি বীররসের মাধ্যমে আমার পাঠকদের এখনই উত্যক্ত করতে চাই না। আগে কয়েকটা ছোট-ছোট মহাকাব্য (Epiclings) লিখে আমাকে হাতটা পাকাতে দাও।' (গুপ্ত, ১৯৮৭ : ৫৪৬) এখানে নিছক একজন কবি হিসেবে শুধু নয়, একজন প্রতিভাধর মানুষকে যেন আমরা দেখতে পাই, যিনি নিজের সামর্থ্য ও সীমাবদ্ধতা বিষয়ে ভীষণভাবে সচেতন। এই সচেতনতাই কবি মধুসূদনের নিজস্ব আধুনিকতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, যা সেই সময়ের নিরিখে তাঁর নিরন্তর অগ্রসর কাব্য-চেতনাকে চিহ্নিত করেছে। এই যে জাতীয় মহাকাব্য লিখতে অস্বীকৃতি জানানো—এতে রাজনারায়ণ যেন তাঁকে ভুল-না-বোঝেন, সেই কারণেই অনেকটা কৈফিয়তের সুরে মিলটনের 'Paradise Lost'-এর তৃতীয় সর্গের ঊনত্রিশতম পঙ্‌ক্তিটি উদ্ধৃত করেমধুসূদন বলেছিলেন, 'if I were not truly "smit with the love of sacred song" I should throw poetry to the dogs!'মধুসূদন এটি বলেছিলেন এই কারণে যে, একদিকে তাঁকে প্রয়োজনের তাগিদে আইনের বই পড়তে হচ্ছে, অন্যদিকে, তাঁকে টানছে পবিত্র-কাব্যপ্রেম। বলা যায়, সমগ্র জীবন ধরেই তাঁকে কাব্য ও জীবিকা—এই দুই বিপরীত মেরুর টানাপোড়নের মধ্যে দিয়ে চলতে হয়েছে, তারপরও কবিতাকে তিনি ছাড়েননি। ছাড়েননি ওই পবিত্র কাব্যের প্রতি তাঁর প্রেমের কারণেই। এ- থেকেই কবিতা তথা সাহিত্যের প্রতি মধুসূদনের গভীর অনুরাগের বিষয়টি আমরা অনুধাবন করতে পারি। আইন ও কবিতার এই টানাপোড়েনের মধ্যেও মধুসূদন তাঁর লড়াই থামাতে চাননি, কবিতার জন্যে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার দৃঢ়প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁর ভাষায়, 'রাশিয়ানদের রাজকীয় শিরোভূষণ অর্জন করার চাইতে স্বদেশের কাব্যের সংস্কার সাধনেই আমি বেশি আগ্রহী।' (গুপ্ত, ১৯৮৭ : ৫৪৬)

৮.যথার্থ উপভোগ

রাজনারায়ণকে লেখা এই চিঠিতেই মধুসূদন নম্রভাবে স্বীকার করেছিলেন যে 'বাংলা ভাষার প্রতি একসময় তিনি তীব্র ঘৃণা পোষণ (a great contempt) করতেন। কিন্তু বর্তমানে সেই জায়গা থেকে তিনি সরে এসেছেন।' শুধু তা-ই নয়, এখন তিনি এতোদূর পর্যন্ত বিশ্বাস করেন যে, 'আমাদের ভাষার অমিত্রাক্ষর ছন্দ "ইংরেজিকে পিষে ফেলবে" ("thrashes the Englishers")। আর এই অমিত্রাক্ষর ছন্দ দুনিয়ার যে- কোনো দেশের ছন্দের মতোই অপরূপ!' তাঁর এই কথার প্রমাণ হিসেবে রাজনারায়ণকে তিনি 'মেঘনাদবধ কাব্যে'-র সূচনাপর্বের প্রশস্তিমূলক সর্গটি পাঠিয়ে, এ-বিষয়ে বন্ধুর মতামত জানতে চেয়েছিলেন। তাঁর অন্য-একজন বন্ধু, যিনি কবিতারও সমঝদার, এই অংশটুকু পাঠ করে একে অপূর্ব বলেছেন, সেটিও রাজনারায়ণকে জানাচ্ছেন। নিজের গীতি-কবিতার একটি ছোট্ট বই যে তিনি প্রকাশ করতে যাচ্ছেন, বন্ধুকে সেই খবরটিও জানাতে ভোলেননি। কীসের উপর লেখা সেই কাব্য? মধুসূদনের ভাষায়, এটি হচ্ছে, 'They are all about poor old Radha and herবিরহ।' (গুপ্ত, ১৯৮৭ : ৫৪৬)।

কবিদের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে, তাঁদের বেশিরভাগই শুধু নিজেদের লেখালেখি, পছন্দ-অপছন্দের বিষয়গুলো নিয়ে মশগুল থাকেন। মাইকেল মধুসূদন এই দিক থেকেও ছিলেন ব্যতিক্রম। রাজনারায়ণকে লেখা এক চিঠিতে কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭–১৮৮৭) সম্পর্কে মাইকেলের মূল্যায়ন ছিলো এইরকম—'তিনি [রঙ্গলাল] খানিকটা স্পর্শকাতর মানুষ, কিন্তু এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে কাব্য-রচয়িতা হিসেবে আমি যদি আমার টুপি এক বা দুই ধাপ উঁচু পেরেকে ঝুলিয়ে রাখি তাতে তিনি সম্মতি দেবেন। তাঁর সম্বন্ধে আমার অভিমত এই যে, কবিজনোচিত অনুভূতি ও আবেগ তাঁর মধ্যে আছে, সেইসঙ্গে আছে খানিকটা কল্পনা ও উদ্ভাবনীশক্তিও। কিন্তু তাঁর কাব্য-রচনাশৈলী কিছুটা বিকৃত, কাজেই তা প্রশংসার যোগ্য নয় ('his style is affected and consequently execrable')।' কিন্তু এখানেই থামেননি মাইকেল, বরং রঙ্গলাল সম্পর্কে একেবারে চরম কথা না-বলে তিনিআশা প্রকাশ করছেন যে, রঙ্গলাল হয়তো ধীরে-ধীরে এই ত্রুটি শুধরে নিতে পারবেন। তিনি এ-রকমও মনে করেছেন যে, তাঁর তিলোত্তমা কাব্যটি রঙ্গলালের উপর কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছে। এসবের ইতিবাচক ফলাফল হয়তো কবির পরবর্তী রচনাকর্মে দেখা যেতেও পারে। (গুপ্ত, ১৯৮৭ : ৫৪৭। এই চিঠির তারিখ : ১৫ মে, ১৮৬০)। অন্যদিকে, আবার নিজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সম্ভাবনা সম্পর্কে জানিয়েছিলেন, 'সাহিত্য বিষয়ে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের জন্যে আমাদের ভাষায় বিশাল ক্ষেত্র ছড়িয়ে আছে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা এই যে আমি যদি হাতে সময় পাই তাহলে, কবিতা, নাটক সমালোচনা, উপন্যাস নিয়ে নিরন্তর কাজ করে যাবো। এমন সব কাজ যাতে একজন মানুষ 'সমস্ত গ্রিক ও যাবতীয় রোমান কীর্তির উপরে' নিজের কৃতিত্বের ছাপ ও খ্যাতি রেখে যেতে পারবে।' রাজনারায়ণকে তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন সাহিত্যের সমালোচনার দিকটি যেন তিনি দেখভাল করেন।' আর সেজেন্য তাঁকে অ্যারিস্টটল, লঙ্গিনাস, কুইনটিলিয়ন থেকে শুরু করে সাহিত্য-দর্পণ, বার্ক, ড্রাইডেন, শ্লেগাল প্রভৃতি সমালোচকদের বই পাঠ করতে বলেছেন। প্রাচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব বোঝার জন্যে 'সংস্কৃতি' ভাষা-শিক্ষা করবার জন্যে বন্ধুকে তাগিদ দিয়েছেন। এমন কথাও বলছেন যে, রাজনারায়ণ যদি স্বচ্ছন্দে সংস্কৃত পাঠ করতে না-পারেন, তাহলে তিনি যেন এই ভাষায় অভিজ্ঞ কোনো পণ্ডিতের সহায়তা নেন। যিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে একসময় সংস্কৃতির নিগড় থেকে মুক্ত করবার অভিলাষ ব্যক্ত করেছিলেন, সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে, অভিজ্ঞতা দিয়ে সংস্কৃত ভাষায় রচিত সাহিত্যতত্ত্বের বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠের জন্যে সেই ভাষার দ্বারস্থ হতেও দ্বিধাবোধ করেননি। এই হচ্ছে মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাব্যাদর্শের আরেকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দ বিষয়ে পাঠকদের অস্বস্তির কথা মাইকেল অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। সে-কারণেই তিনি রাজনারায়ণকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, 'এই দেশের সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রচলিত হওয়াটা খানিকটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।' তিনি রাজনারায়ণকে আরও বলেছেন, 'তোমার বন্ধুরা যদি ইংরেজি জানেন, তাহলে তাঁরা যেন

প্যারাডাইস লস্ট পড়েন, তাহলে তাঁরা বুঝতে পারবেন বঙ্গের এই সামান্য কবি কীভাবে তাঁর কবিতার পঙ্‌ক্তি-বিন্যাস করেছেন। তাঁরা যদি সেটি করতে পারেন, তাহলে বাধ্য হয়েই তাঁদের স্বীকার করতে হবে যে এটি আমাদের ভাষার সর্বোৎকৃষ্ট ছন্দ।' এই ছন্দের পাঠ বিষয়ে রাজনারায়ণকেও মাইকেল উপদেশ দিয়ে বলেছেন, 'My advice is Read, Read, Read. Tech your ears the new tune and then you will find what it is.'(গুপ্ত, ১৯৮৭ : ৫৪৮-৫৪৯। এই চিঠির তারিখ : ১ জুলাই, ১৮৬০)। সেই একই চিঠিতে নিজের পাঠ-পরিক্রমা সম্পর্কে মাইকেল নিজের পাঠ-রুটি সম্পর্কে রাজনারায়ণকে জানিয়েছিলেন, 'আমি নিজের কথা এইটুকু বলতে পারি যে, বাল্মীকি, হোমার, ব্যাস, ভার্জিল, কালিদাস, দান্তে (অনুবাদে), তাসো (অনুবাদে) এবং মিলটন ছাড়া আমি অন্য কারও কবিতা পড়িনে। কেননা এই কবিগণ একজন উৎসাহী তরুণকে প্রথম শ্রেণির কবি হিসেবে উযুক্ত করে তুলতে পারেন, অবশ্য প্রকৃতি যদি তাঁর প্রতি সদয় হোন।' (গুপ্ত, ১৯৮৭ : ৫৪৯)। আজ থেকেএতো বছর আগে মাইকেল ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন যে, কবি হতে গেলে প্রচুর কবিতা পাঠ করতে হয়, বিশেষ করে যাঁরা সত্যিকার অর্থেই শক্তিশালী ও মৌলিক কবি, তাঁদের কাব্য।

৯. ধূমকেতু যুগে-যুগে আসে আবার আসে না

তিলোত্তমা থেকে *মেঘনাদবধ*, *ব্রজাঙ্গনা*, *বীরাঙ্গনা*, *চতুর্দশপদী কবিতা*—মাইকেলের এই কাব্য-পরিক্রমা শেষে আমরা দেখতে পাই যে, তিনি তাঁর সাহিত্য-প্রচেষ্টায় সফলতা পেয়েছেন। পেয়েছেন পাঠক-সমালোচকের কাছে স্বীকৃতি। অবশ্য এরপরেও তাঁর বিরোধী পক্ষের লোকজনও তাঁকে হেনস্থা করতে কসুর করেনি। কিন্তু সেইসব মাইকেল গ্রাহ্য করেননি। নিজেকে তিনি আর কিছুই না-হোক, অন্তত একটা 'পরিশ্রমী কুকুর' (industrious dog) হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। কারণ, তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, কাব্যিক-প্রতিভা ও কলাকৌশলের পাশাপাশি নিরন্তর সাধনা ও পরিশ্রমই তাঁকে সাহিত্যের দিগন্তে সফলতা এনে দিয়েছে। সেইসঙ্গে এ-ও বুঝতে পেরেছিলেন যে বাংলা সাহিত্যে তিনি অগ্নিশিখার মতো জ্বলে ওঠেছেন। (গুপ্ত, ১৯৮৭ : ৫৬২। এই চিঠির তারিখ জানা যায় না। তবে অনুমান করা যায় যে এটি ১৮৬১ সালে লেখা।)। সেই জ্বলে ওঠার কারণটা প্রকাশ করতে গিয়ে ওই একই চিঠিতে রাজনারায়ণ বসুকে তিনিবলেছিলেন, বাংলা সাহিত্যের আকাশে তাঁর আবির্ভাব হচ্ছে প্রচণ্ড একটা ধূমকেতুর ('tremendous Comet') মতো। (গুপ্ত, ১৯৮৭ : ৫৬২)। এখানে এসে খুব স্বাভাবিক আর সঙ্গত কারণেই আমাদের কাজী নজরুল ইসলামের কথা মনে পড়ে যায়। বাংলা সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাবের ঘটনাও অনেকটা ধূমকেতুর মতো।

এখানে আরেকটি বিষয়ে কথা বলতেই হয়, সেটি এই যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতাকেন্দ্রিক কবি-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বাংলার মুসলমান সমাজ নিয়ে তেমন কোনো আগ্রহ বা ঔৎসুক্য আমরা দেখতে পাই না। এটি একটা নিদারুণ সত্যি।

সেখানে রাজনারায়ণকে লেখা একটি চিঠিকে মাইকেল বলেছিলেন, 'আমি এ কথা তোমাকে বলতে পারি যে, ভারতবর্ষের মুসলমানদের ভেতর যদি প্রতিভাসম্পন্ন বড়ো কোনো একজন কবির জন্ম হতো, তাহলে তিনি হোসেন ও তাঁর ভাইয়ের মৃত্যু ঘটনা নিয়ে একটি অপূর্ব মহাকাব্য লিখতে পারতেন। সমগ্র জাতির মর্মবেদনা সেই কবি তাঁর রচনাকের্মে ফুটিয়ে তুলতেন। এ-কথা তুমি কি বিশ্বাস করো যে আমাদের এই ধরনের কোনো বিষয় নেই।' (গুপ্ত, ১৯৮৭ : ৫৬২)। কবি হিসেবে এইটি মাইকেলের রুচির সামগ্রিকতারই প্রকাশ। শুধু তা-ই নয়, 'একপেশেমির সংকট' থেকে তিনি যেমন অনেকটাই মুক্ত ছিলেন, তেমনই তিনি অর্জন করতে পেরেছিলেন ভিন্ন ধর্মের 'ভিন্ন রুচির অধিকার'।

আর এরপরেই বাংলা দেশ থেকে মাইকেলের আপতত একটা বিদায়-পর্ব। বলা যায়, এই বিদায় যাত্রা অনেকটা বাংলা সাহিত্য থেকেও। কেননা পরবর্তী সময়ে, প্রবাসে, মাইকেল 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' ছাড়া তেমন উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই লেখেননি। একেবারেই যে কিছু লেখেননি তা নয়, লিখেছিলেন অনুবাদধর্মী গদ্য রচনা 'হেক্‌টর-বধ' (১৮৭১) আর 'মায়া-কানন' (১৮৭৪ সালে প্রকাশিত) নামে একটি নাটক, যার কোনোটিই মাইকেলের কাব্য-প্রতিভার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ১৮৬২ সালের ৪ জুন তারিখে তাঁর বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লেখা শেষ চিঠিতে মাইকেল বলেছিলেন, 'আমি চললাম। আবার আমাদের মধ্যে দেখা হবে কিনা তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। তোমার এই বন্ধুকে তুমি কিন্তু কখনো ভুলো না।' এই চিঠিতেই মাইকেল বলেছিলেন, 'সামান্য হলেও আমি তো একজন কবি, সুতরাং কাব্যচর্চা না-করে আমি থাকতে পারিনে।' তারপর তিনি রাজনারায়ণকে সেই অমর কবিতাটি উপহার দিয়েছিলেন, যার নাম 'বঙ্গভূমির প্রতি'। যার প্রথম পঙ্‌ক্তি হচ্ছে—'রেখো মা, দাসেরে মনে'(গুপ্ত, ১৯৮৭ : ৫৬২)।

মাইকেলের সেই বিদায় মুহূর্তের কথা বলতে গিয়ে গোলাম মুরশিদ লিখেছিলেন, 'দেশ ছেড়ে চলে যেতে... মনে কেমন একটা বিষাদ বোধ করছিলেন, তাঁর সেই দেশকে পূর্ববর্তী পাঁচ বছরে তাঁর সাহিত্য সাধনার মাধ্যমে তিনি নতুন করে আবিষ্কার করেছিলেন। এই সময়ে তিনি তাঁর মাতৃভাষাকেও আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন, যে-মাতৃভাষাকে তিনি চরম অবহেলা করে প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন।' অধ্যাপক মুরশিদ সেইসঙ্গে এই কথাও বলেছিলেন যে, 'তিনি বিশ্বাস করতেন যে, অন্তহীন উন্নতি করার মতো সম্ভাবনা বাংলা ভাষার আছে। তাঁর সাহিত্যকর্মের মধ্যে দিয়ে তিনি যে-স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন, তা থেকে তাঁর ধারণা হয়েছিলো যে, দেশবাসী তাঁকে সত্যি ভালোবাসে।'(মুরশিদ, ২০২৩ : ১৪১)। এখানে বলে রাখা দরকার যে, মাইকেলের কাব্যচিন্তায় 'দেশপ্রেম' যতোটা-না-ছিলো, তারচেয়ে বেশি ছিলো 'দেশজ্ঞান'। দেশপ্রেম কখনো-কখনো বিপদসীমা অতিক্রম করে মানুষকে উগ্র জাতীয়তাবাদের দিকে নিয়ে যায়। যা শেষ পর্যন্ত অন্য দেশের প্রতি আক্রমণাত্মক ও ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতি ঘৃণার সঞ্চার করে থাকে। যুদ্ধের সময় আমরা দেখতে পাই, ভিন্ন-ভিন্ন দেশ থেকে ক্ষমতাসীনদের পালিত সেনাদের 'দেশপ্রেম' নিয়ে

নানাবিধ প্রচার চলে। অন্যদিকে, যাঁরা প্রচলিত সমাজকাঠামোর বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন, তাঁদের মধ্যে দেখা যায় 'দেশজ্ঞান'। 'দেশজ্ঞান' একজন মানুষের চিন্তার প্রসার ও যৌক্তিকতাকেই প্রকাশ করে। দেশজ্ঞান মানুষে-মানুষে যুক্ততার বন্ধন তৈরি করে আর দেশপ্রেম সৃষ্টি করে বিদ্বেষ। সেই কারণেই সমাজবিজ্ঞানী পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'দেশপ্রেম তো অনেক হলো, এবার দেশজ্ঞান খানিকটা বাড়াতে পারলে ভালো হয়।' (পার্থ, ২০২১ : ১৭৬)। এই দেশজ্ঞান, সাহিত্যের প্রতি এই ভালোবাসা মাইকেল অর্জন করেছিলেন তাঁর কাব্য-সৌধ নির্মাণের প্রতিভা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে।

১০. মাইকেলের কাব্যচিন্তার জঙ্গমতা

মাইকেল মধুসূদনের কবি-মানসে আমরা তাঁর কাব্যচিন্তার যে-অনিবার্যতা দেখতে পাই, তাঁর মধ্যে দুটি দিকের কথা বলেছিলেন শিশিরকুমার দাশ—'একটিতে সে অতীতের মহত্ত্বকে অনুভব করতে চায়—আর-একটিতে নিজেকে নতুন করে সৃষ্টি করতে চায়।' এখানেও তিনি মূলত সেই রেনেসাঁসের কথাই বলতে চেয়েছিলেন। আবার 'সাহিত্যে যাকে রোমান্টিক আন্দোলন বলা হয় তা এক অর্থে রেনেসাঁস ও রিফর্মেসানের ফসল। মানবসত্তার মহিমা, নিসর্গ সৌন্দর্যের মধ্যে তার জন্ম।' মধুসূদন রোমান্টিক ছিলেন বলেই তিনি... 'শান্তি' চাননি, চেয়েছেন 'প্রচণ্ড দুর্বার ব্যক্তিত্বের শক্তি'। (শিশিরকুমার, ১৯৫৯ : ৯৩)। আবার এ-সবের পাশাপাশি আমরা দেখি যে, ধর্মীয় ও সামাজিক বিধান ও নীতি থেকে মধুসূদন মুক্তি চেয়েছিলেন। মুক্তি চেয়েছিলেন ব্যক্তি ও বিধানের দ্বন্দ্ব থেকে। 'তিনি যদিও গভীরতর অর্থে পরম আস্তিক, তবু প্রচলিত অর্থে তিনি ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন না।... 'ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্বকে তিনি শেষ পর্যন্ত মুক্তি দিয়েছেন—সুবিস্তৃত মানবতা বোধের মধ্যে।' (শিশিরকুমার, ১৯৫৯ : ৯৪)। পাশাপাশি, মাইকেলের কাব্য-প্রবণতার বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করতে গিয়ে শিশিরকুমার দাশের যথার্থভাবেই মনে হয়েছে যে, 'তাঁর কাব্যে নিসর্গ অপ্রধান, ঐশ্বরিক অনুভূতির স্থান সংক্ষিপ্ত—প্রধান হয়ে উঠেছে মানুষ। দোষে-গুণে, বিবেকে-বুদ্ধিতে, ভালোবাসায়, ভীরুতায়, বীরত্বে-কাপুরুষতায়।' এই যে এভাবে 'ব্যক্তি, দেশ ও বিশ্বকে মিলিয়ে দেবার সাধনায় তিনি রামমোহনের উত্তর সাধক ও রবীন্দ্রনাথের অগ্রবর্তী কবি।' (শিশিরকুমার, ১৯৫৯ : ৯৫)। আর তাঁর সেই সাধনার, সেই-কাব্যসৌধের শক্ত পাটাতন মাইকেলের প্রাগ্রসর কাব্যবোধ ও কাবচিন্তার মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছিলো ।

মোহিতলাল মজুমদারের বক্তব্য দিয়েই আমাদের আলোচনা শেষ করছি। মাইকেল মধুসূদন সম্পর্কে মোহিতলাল বলেছিলেন, 'তিনিই সর্ব্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যে বাঙালীর ভাবজীবনের জাড্য মোচন করিয়াছিলেন—কবি-মানসে মুক্তিসাধনে তিনিই প্রথম বিজয়ী বীর। মধুসূদনের চরিত্রে যে আত্মপ্রত্যয় ও অসমসাহসিকতা ছিল, তাহারই বলে তিনি বাংলা কাব্যে অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন।' (মোহিতলাল, ২০১০ : ৩৫)। আর সেই অসাধ্যকে, 'অপ্রত্যাশাকে কাজে লাগানোর নাটকীয় দক্ষতায় মধুসূদন মহাকবিদের মধ্যে

আধুনিক।' (জগন্নাথ, ২০২৩ : ১২)। এরপর সেই আধুনিকের দেখানো সাহিত্যের রাস্তা দিয়ে অগ্রসর হওয়া ছাড়া আমাদের অন্য কোনো গত্যন্তর নেই।

আকারগ্রন্থ

ডক্টর ক্ষেত্র গুপ্ত (সম্পাদিত), ১৯৮৭। *মধুসূদন রচনাবলী* (প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৫), সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

গণেশ দেবী, ২০১৭। *স্মৃতিবিলোপের পরে* (অনুবাদ : শংকরপ্রসাদ সিংহ ও ইন্দ্রনীল আচার্য), ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, হায়দ্রাবাদ

গোলাম মুরশিদ, ২০২৩। *মাইকেলের জীবন ও পত্রাবলী*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা।

জগন্নাথ চক্রবর্তী, ২০২৩। মেঘনাদবধ কাব্যে চিত্রকল্প (প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৭), প্রতিভাস, কলকাতা।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ২০২১। *নাগরিক*, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, কলকাতা।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১৪১৭। *বঙ্কিম রচনাবলী : দ্বিতীয় খণ্ড* (যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত), সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা।

বারিদবরণ ঘোষ (সম্পাদিত), ১৪০২। *রাজনারায়ণ বসু : নির্বাচিত রচনাসংগ্রহ*, কলেজস্ট্রীট পাবলিকেশন প্রা. লি., কলিকাতা।

বিষ্ণু দে, ১৯৬৭। *মাইকেল রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা*, মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

বুদ্ধদেব বসু, ১৩৬১। *সাহিত্যচর্চা*, সিগনেট প্রেস, কলকাতা।

বুদ্ধদেব বসু, ১৯৯১। *প্রবন্ধ-সংকলন* (প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৬), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

বুদ্ধদেব বসু, ২০১২। *অগ্রন্থিত গদ্য : তৃতীয় খণ্ড*, বিকল্প প্রকাশনী, কলকাতা।

মোহিতলাল মজুমদার, ১৯৯৮। *আধুনিক বাংলা সাহিত্য*, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা।

মোহিতলাল মজুমদার, ২০১০। *কবি শ্রীমধুসূদন* (প্রথম বিদ্যোদয় সংস্করণ : ১৯৬৫), করুণা প্রকাশনী, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩৬২। *সঞ্চয়িতা* (প্রথম প্রকাশ : ১৩৩৮), বিশ্বভারতী, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩৯৪ । *সাহিত্যের পথে* (প্রথম প্রকাশ : ১৩৪৩), বিশ্বভারতী, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৪১৮। *ছিন্নপত্র* (প্রথম প্রকাশ : ১৩১৯), বিশ্বভারতী, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৪২১। *রবীন্দ্র-রচনাবলী : নবম খণ্ড*, বিশ্বভারতী, কলকাতা।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ২০২৩। *সাহিত্য সমালোচনা সঙ্গ্রহ* (সংকলন ও সম্পাদনা : অরুণকুমার সাঁফুই), পত্রলেখা, কলকাতা।

শিশিরকুমার দাশ, ১৯৫৯। *মধুসূদনের কবিমানস*, বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, ১৯৯৫। *সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধসংগ্রহ* (সম্পাদক : অমিয় দেব), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

Alexanfer Pope, 2006.*The Major Works* (Edited by Pat Rogers), Oxford University Press Inc., New York.

D. M. Walmsley (Edited), 1946. Selections from Byron, Methuen & co. LTD., London.

Gerard Manley Hopkins, 1967. *Selections* (Edited by Graham Storey), Oxford University Press, London.

Hana Pichova, 2002. *The Art of Memory in Exile : Vladimir Nabokov and Milan kundera*, Southern Illinois University Press,Carbondale.
Ronald Carter and John McRae, 2009.*The Routledge History of Literature in English*, Routledge, New York.

মেঘনাদবধ কাব্য : কবিমানস ও রাষ্ট্রচিন্তা

সুমাইয়া খানম*

সারসংক্ষেপ

বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) মহৎ ও বিরাট ঐশ্বর্য-সমৃদ্ধ স্থপতি। বলা যায় সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি প্রথম আধুনিক ও বিদ্রোহী কবি। তাঁর সম্পর্কে একথা বলার অভিপ্রায়ও অদম্য যে, তিনি যুগ অপেক্ষাও আধুনিক ছিলেন। মধুসূদন অভূতপূর্ব মেধা-মননের সম্মিলনে তাঁর লেখায় যে appropriate style ব্যবহার করেছেন তা দ্বারা তিনি গড়ে তুলেছিলেন আধুনিক শিল্প-পরিমণ্ডল। মূলত তাঁর মানস গঠনে যে দেশপ্রেম, আদর্শ, ঐতিহ্য, রাষ্ট্রিক ও পারিবেশিক-চেতনা প্রভাব ফেলেছিল তারই স্ফুরণে *মেঘনাদবধ* প্রজ্জ্বলিত। বিপন্ন লঙ্কাকে স্বাধীন ও মুক্ত করার লক্ষে রাবণ-পরিবারের আত্মাহুতি, রাবণের বীরত্ব, তার অপ্রতিহত উদ্দাম, ক্ষিপ্রতা আমাদের সম্মুখে ব্যক্তি মধুসূদনের দেশভক্তির পট উন্মোচন করে। সেই সাথে এ যুদ্ধে মেঘনাদ, রাবণের যুদ্ধকৌশল অথবা 'আমি কি ডরাই সখী ভিখারি রাঘবে' এই উক্তির মধ্য দিয়ে নিজ অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম সত্যি মধুসূদনকে সফল রাষ্ট্রচিন্তক হিসেবে সর্ব্ববাদীসম্মত করে তোলে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে মাইকেল মধুসূদন দত্তের *মেঘনাদবধ* কাব্যে যে কবিমানস ও রাষ্ট্রচিন্তার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন তা বিস্তৃত আলোচনা করা হবে। প্রকটিত হবে মানুষ ও মানুষের জন্য শত্রুমুক্ত আবাসভূমি গড়ার আকাঙ্ক্ষা।

---

১. বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) পণ্ডিত কবি। তাঁর জীবন ও কর্ম দু-ই বর্ণময়। তাঁর সবচেয়ে ঐশ্বর্যমণ্ডিত ও গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি *মেঘনাদবধ* (১৮৬১) কাব্য। এই কাব্যে রাবণের দেশপ্রেম, মেঘনাদের আত্মত্যাগ ও উভয়ের বীরত্বের ভেতর দিয়ে মধুসূদন মূলত নিজের রাষ্ট্রচিন্তার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। তিনি সীতাহরণকে গৌণ করে দেখেছেন। বিপরীতে রাম-লক্ষণ বাহিনীর সঙ্গে রাবণ-মেঘনাদ বাহিনীর যুদ্ধকে রাবণ-মেঘনাদের দেশমাতৃকার মর্যাদা রক্ষার লড়াই হিসেবে দেখেছেন। ধর্মের গৌরব বা মর্যাদার বিষয়ে মধুসূদন নীরবতা পালন করে রাবণ-মেঘনাদকে দেশপ্রেমিক ও রামকে পরদেশ আক্রমণকারী হিসেবে দেখিয়েছেন।

২. কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে উপন্যাসে যেমন কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা জাতির জীবনের বৃহত্তর অংশ বা খণ্ডিত কোনো অংশে সামাগ্রিকতা তুলে ধরা হয়, তেমনি মহাকাব্যও দীর্ঘ আখ্যানমূলক কবিতা। কবিতার এই প্রকরণের আদি, মধ্য ও শেষে বিশিষ্ট কোনো নায়কের জীবনকাহিনি অখণ্ডভাবেই বর্ণনা করা হয়। এতে মূলত ওই নায়কের বীরোচিত কর্মজীবনের আখ্যান বর্ণনা করা হয়। বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মহাকাব্যের

---

*ড. সুমাইয়া খানম : সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ছন্দও নির্বাচিত হয়। অর্থাৎ মহাকাব্যের বিষয়ের সঙ্গে এর ভাষা, ভাষার সঙ্গে এর রস, রসের সঙ্গে এর ছন্দের সামঞ্জস্যও রক্ষিত হয়। এছাড়া মহাকাব্যে সাধারণত আলোকপাত করা হয় কোনো একজন নায়কের দুঃসাহসিক কাজকে। একইসঙ্গে তার অতিমানবীয় গুণাবলিরও পরিচয় দেওয়া হয়। যেমন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের *মহাভারত*, বাল্মিকীর *রামায়ণ*,হোমারের *ইলিয়ড* ও *ওডিসি*, মিল্টনের *প্যারাডাইস লস্ট*, সেইসঙ্গে *য়াৎকার-ই-জরিয়ানা*, *কারনামাস-ই-আর্তখসির*, *শাহনামা* প্রভৃতি। 'Epic', গ্রিক শব্দ 'epos' বা 'epikos' থেকে মহাকাব্য কথাটির উদ্ভব। 'যার অর্থ- শব্দ, গান, আখ্যান তার থেকে বীররস পূর্ণ কাহিনি।'[১]

মহাকাব্যের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আলঙ্কারিকদের মতে, মহাকাব্যে অষ্টাধিক সর্গবিভাগ থাকবে। একটি সর্গ একটি ছন্দেই রচিত হবে। মহাকাব্যের বিষয়বস্তু হতে হবে পুরাণ, ইতিহাস ছাড়াও কোনো সত্য ঘটনা। মূল কাহিনির পাশাপাশি শাখাকাহিনি থাকতে পারে। এসব কাহিনিতে নাটকীয়তা থাকাও আবশ্যক। মহাকাব্যের ভাষা হবে প্রসাদগুণসম্পন্ন, ওজস্বী এবং অলঙ্কারসমৃদ্ধ। সর্বজ্ঞ বর্ণনাকারীর সঙ্গে তৃতীয় ব্যক্তির বর্ণনাও থাকতে হবে। একজন কেন্দ্রীয় নায়ক থাকবেন যিনি অবিশ্বাস্যভাবে সাহসী এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হবেন। নায়কের বিরুদ্ধে প্রায় অসম্ভব প্রতিকূলতা তৈরি করার জন্য অতিপ্রাকৃত বা অন্য জাগতিক বাধা থাকবে এবং একটি সভ্যতা বা সংস্কৃতির ভবিষ্যত সম্পর্কে উদ্বেগ প্রতিফলিত হবে। নায়কের জয়ের মধ্য দিয়ে মহাকাব্যের সমাপ্তি ঘটবে। সমালোচকের মতে :

> বস্তুত মধুসূদনের ব্যক্তি জীবনেই মহাকাব্যিক মহিমা ছিল এবং তা সমকালীন জীবনের ঘনীভূতরূপ বলে, সে জীবনের ভাষ্য *মেঘনাদবধ* কাব্য আধুনিক বাংলা কাব্যের একমাত্র মহাকাব্য। জীবনের সঙ্গে জীবন এবং তার সঙ্গে সাহিত্যের এই অপূর্ব যোগাযোগ বিরল দর্শন সন্দেহ নেই।[২]

২.১ যুগপ্রভাব সাহিত্যে অনিবার্য। সাহিত্য যতই লেখকের স্বতঃস্ফূর্ত আত্মচেতনাপ্রসূত অক্ষরবিন্যাসে সজ্জিত হোক না কেন যুগকথা বা যুগপ্রভাব তাতে ভাস্বর হয়ে ওঠে। মধুসূদনকে আমরা আত্মসচেতন লেখক হিসেবে যেমন পেয়েছি তেমনি রাষ্ট্রসচেতন ব্যক্তিত্বের পরিচয়ও তিনি দিয়েছেন। তাই যুগপ্রভাবকে তিনি অস্বীকার করেননি। বরং যুগের প্রভাব স্বীকার করে লেখনীর মাধ্যমে সে যুগকেও তিনি প্রভাবিত করেছেন। মধুসূদন যুগ-সন্ধিক্ষণের কবি। সমাজ সংস্কারক রামমোহন রায়ের (১৭৭২-১৮৩৩) মৃত্যুর পূর্বে তাঁর জন্ম। সমসাময়িক লেখক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯), ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪) প্রমুখ। এ সময় ছিল বিপ্লবমুখর সময়। সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম প্রভৃতি সবখানে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। সেখানে মিশেল ঘটেছিলো 'অখ্যাত অসংস্কৃত' পল্লির সাথে শহরের 'উদ্ধত রূপের'। সংমিশ্রণ ঘটেছিলো প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের। চেতনায় উৎসারণ ঘটেছিলো নববিপ্লবের। বিমিশ্র চেতনা, স্বাতন্ত্র্য প্রকরণ-প্রয়োগ, প্রাগ্রসর ঘটনাপ্রবাহ-তীক্ষ্ণ এতদসঙ্গে সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে অভিজ্ঞান প্রভৃতির সমন্বয়ে মাইকেল-মানস আধুনিকতায় সমৃদ্ধ হলো। সমালোচকের ভাষ্যে :

> অসাধারণ প্রতিভা লইয়া মাইকেল মধুসূদন বাংলা সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হন। প্রকৃতিদত্ত শক্তি, প্রতিভা এবং অসাধারণ আত্মপ্রত্যয়ের সাহায্যে বাংলার এই নবীন কবি পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে নানা উপকরণ সংগ্রহ করিয়া মাতৃভাষাকে পরিপুষ্ট করিলেন, গাম্ভীর্য ও ভাববৈচিত্র্যে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিলেন।[৩]

২.২ জ্ঞানৈশ্বর্যে ভরপুর মধুসূদন পাশ্চাত্যরীতিকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। ইউরোপীয় রেঁনেসাঁস থেকে মাইকেল 'মানবতাবাদ' ও 'যুক্তিবাদ' গ্রহণ করেছিলেন। পলাশী-যুদ্ধের পরাজয়ের পর ৬৬ বছর ইংরেজ-শাসনামলে মানুষ ইংরেজিকে গ্রহণ করতে শিখেছে। পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাব-ভাষা-প্রকরণ প্রভৃতিকে প্রাধান্য দিয়ে তার আদলকে মধুসূদন গ্রহণ করলেন সাহিত্যে। বিশেষ করে *মেঘনাদবধ* কাব্যের শরীর জুড়ে এই পাশ্চাত্য-চেতনার বসতি লক্ষনীয়। মধুসূদনের কবিমানসের উৎকর্ষতা এবং সুগভীর স্বাজাত্যবোধের আকর পাশ্চাত্য-সাহিত্য। হোমার, মিল্টন, ভার্জিল, দান্তে, ত্যাসো, শেক্সপিয়র প্রমুখ মাইকেলের শিল্পনির্মিতির উপাদান আহরণের ক্ষেত্রভূমি। মাইকেলের কবিমানসে তাই দেশ ও রাষ্ট্রচেতনা নতুনরূপে ধরা দিল। কাব্যশরীর থেকে মধুসূদনের সর্বশিল্পগ্রাসী দৃষ্টি আঁকশি দিয়ে টেনে বের করলেন নিজ চেতনা ও রাবণ-ভাবনার একাত্মতা। এক্ষেত্রে সমালোচকের মন্তব্যে পাই :

> অখণ্ড সৌন্দর্যসচেতন মানবরসসিক্ত সকল পূর্বসংস্কারমুক্ত মধুসূদন জীবনকে যেমন গ্রীকসুলভ ঋজু দৃষ্টিতে দেখেছেন তেমনি গ্রীক কবির রচনার মতই তার সৃষ্টিতে আত্মউপলব্ধিশুদ্ধ সমকালীন জীবন রাবণ চরিত্ররূপে বিকশিত হয়ে উঠেছে।[৪]

২.৩ মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলার প্রাচীন ছন্দ অক্ষরবৃত্তের সমীল রূপকে বদলে দিয়ে অমিত্রাক্ষর ছন্দে *মেঘনাদবধ* কাব্য রচনা করেন। 'বলা যায় কাব্যের বক্তব্যকে ভাষার জড়ধর্ম থেকে মুক্তি দিলেন।'[৫] এই মহাকাব্য বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম মহাকাব্য। সমালোচকদের মতে, বাংলা ভাষায় রচিত এখন পর্যন্ত একমাত্র সার্থক মহাকাব্য। যদিও মধুসূদন দত্তের পর আরও অনেকে মহাকাব্য লেখার চেষ্টা করেছেন, কিন্তুসেগুলোর কোনোটিতেই মহাকাব্যের প্রকৃত লক্ষণ ও গুণাবলির আবিষ্কার করতে পারেননি সমালোচকগণ। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৯০৩) *বৃত্রসংহার* মহাকাব্যে পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে হিন্দু জাতীয়তাবোধ প্রকাশ পেলেও তা সার্থকরূপ পায়নি। মাইকেলের মতো সার্থকতা লাভ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। মূলত ভাষা, ভাবপ্রকাশ, কল্পনা ও ছন্দের সমন্বয়হীনতা কাব্যটিকে পর্যুদস্ত করেছে। অন্যদিকে মাইকেলের ধারাবাহিকতায় নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯) রচনা করেন *রৈবতক* (১৮৮৩), *কুরুক্ষেত্র* (১৮৯৩), *প্রভাস* (১৮৯৬) এই তিনটি ত্রয়ী কাব্য। এছাড়া রয়েছে কায়কোবাদের (১৮৫৭-১৯৫১) *মহাশশ্মান* (১৯০৪), সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর (১৮৮০-১৯৩১) *স্পেন বিজয়* (১৯১৪), হামিদ আলীর *কাসেমবধ কাব্য* প্রভৃতি। এত রচনার ভীড়ে শুধু শিল্পসফলতার তকমাধারী মাইকেলের *মেঘনাদবধ* কাব্য।

৩. মাইকেল মধুসূদন দত্তের রচিত *মেঘনাদবধ কাব্য* প্রকাশিত হয় ১৮৬১ সালে। প্রথম অবস্থায় মহাকাব্যটি দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম খণ্ড বেরিয়েছিল ১৮৬১ সালের জানুয়ারি মাসে। এই খণ্ডে ছিল প্রথম থেকে পঞ্চম সর্গ। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল একই বছরের প্রথমার্ধে। দ্বিতীয় খণ্ডে ছিল ষষ্ঠ থেকে নবম সর্গ। মহাকাব্যিক অবয়বে নয় সর্গে বিভাজিত মেঘনাদবধ কাব্যে সর্গভিত্তিক কাহিনি-বর্ণনার অভিনবত্ব কাব্যগাত্রে ভিন্ন ভিন্ন দ্যোতনার সৃষ্টি করে। প্রথম সর্গে মিল্টন, ত্যাসোর প্রভাব লক্ষ করা যায়। দ্বিতীয় সর্গ হোমার, মিল্টন, শেক্সপিয়রের প্রভাবপুষ্ট। তৃতীয় সর্গে ক্লোরিডা, এ্যান্ড্রোম্যাকি, আর্মিডার সঙ্গে সাযুজ্য মেলে প্রমীলার। চতুর্থ সর্গ র্ভাজিলের *ঈনীদ* কাব্যের প্রভাবসঞ্জাত। পঞ্চম সর্গ হোমার প্রভাবজ। ষষ্ঠ সর্গে হোমারের কাব্যপ্রভাব রূপায়ত। সপ্তম সর্গ মাইকেলের স্বতন্ত্রতায় সুবিন্যস্ত। অষ্টম সর্গ ভার্জিল ও দান্তে প্রভাবিত। নবম সর্গে মেঘনাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বর্ণনায় হোমারের *ইলিয়ড* কাব্যের পাত্রক্লস ও হেক্টরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সাদৃশ্য রয়েছে। তাই মধুসূদনের *মেঘনাদবধ* কাব্য পাশ্চাত্য-প্রভাবসঞ্জাত তাতে সন্দেহের অবকাশ কম। তথাপি এ কাব্যের কাব্যপ্রসাদগুণ মৌলিকত্বের দাবি রাখে।

৩.১ *মেঘনাদবধ* কাব্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত মানবচরিত্রের বীরত্বের জয়গান গেয়েছেন। একইসঙ্গে পিতৃহৃদয়ের মহিমাকীর্তন করেছেন। দেখিয়েছেন দেব-দেবীর চেয়ে মানবহৃদয়ের শক্তি বেশি। ঐশীধর্মের নামে পরদেশ আক্রমণকারীর চেয়ে স্বদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষায় প্রাণদানকারীই শ্রেষ্ঠ বীর। এ কারণে মেঘনাদবধ কাব্যে সীতার অপহরণকে তিনি গৌণ করে দেখেছেন। বিষ্ণুর অবতার রামকে বীরের পরিবর্তে পরদেশ আক্রমণকারী হিসেবে দেখেছেন। বিপরীতে রাক্ষসরাজ রাবণ ও তার পুত্র ইন্দ্রজিৎ অর্থাৎ মেঘনাদের বীরত্বকে দিয়েছেন মহিমা। এই কাব্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের যে-কবিমানস ও রাষ্ট্রচিন্তার তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য উন্মোচিত হয়েছে সেগুলো হলো :

১. অলৌকিকতার পরিবর্তে লৌকিকতার জয়
২. দেব-দেবীর পরিবর্তে মানুষের বীরত্বগাথা
৩. ধর্মচিন্তার বিপরীতে রাষ্ট্রচিন্তা

মাইকেল তাঁর *মেঘনাদবধ* কাব্যের কাহিনি বাল্মিকীর *রামায়ণ* থেকে গ্রহণ করলেও তার গতিপথ ঘুরিয়ে দিয়েছেন। বাল্মিকী যেখানে ধর্ম ও ধর্মাবতারের জয়গান গেয়েছেন, মধুসূদন সেখানে মানবতার জয়গান গেয়েছেন। ফলে রামায়ণে যেখানে সীতা উদ্ধারের জন্য রাম-লক্ষ্মণ বাহিনীর সঙ্গে রাবণ-মেঘনাদ বাহিনীর যুদ্ধে রাম-লক্ষ্মণ বাহিনীর জয়কে ধর্মের জয় হিসেবে দেখিয়েছেন, সেখানে মধুসূদন দেখিয়েছেন ভিন্ন রূপ। তিনি দেখিয়েছেন, যুদ্ধে রাবণপুত্র বীরবাহুর পরাজয়ের অর্থই হলো দেশপ্রেমিক বীরের পরাজয়। তাই এই যুদ্ধে রাম-লক্ষ্মণকে সেতু তৈরি করে সহযোগিতা করার কারণে

সমুদ্রকে ধিক্কার জানান লঙ্কাধিপতি রাবণ। শোকাকুল রাবণের মুখ দিয়ে মধুসূদন উচ্চারণ করালেন :

কী সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ! হা ধিক্, ওহে জলদলপতি!
এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য, অজেয়
তুমি?হায়, এই কি হে তোমার ভূষণ,
রত্নাকর? কোন্ গুণে, কহ, দেব, শুনি,
কোন গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে?[৬]

বীরপুত্র বীরবাহুবধের পর দেশপ্রেমিক রাজা রাবণ শোকাকুল হলেও নিজের ও দেশের এই করুণ পরিণতির জন্য সমুদ্রকেই তিনি ধিক্কার জানালেন। সমুদ্র তার বুকে পথ তৈরি করে না দিলে রাম-লক্ষ্মণ বা তার বাহিনী লঙ্কায় পৌঁছুতে পারতো না, আর যুদ্ধও হতো না। যুদ্ধ না হলে বীরবাহুও বীরগতিপ্রাপ্ত হতো না। এ কারণে লঙ্কাপতি সমুদ্রকে আত্মবিক্রিতদের দলভুক্ত মনে করেছেন। সঙ্গতকারণেই তার প্রশ্ন ছিল, 'কোন্ গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে?' রাবণের মুখে এই প্রশ্ন উচ্চারিত হলেও মূলত এই প্রশ্ন মাইকেল মধুসূদন দত্তেরই। ধর্মের নামে, ধর্মরক্ষার নামে পরদেশ আক্রমণকারী রামকে যখন লঙ্কা আক্রমণের পথ করে দেয় সমুদ্র, সেই সমুদ্রে আর হৃদয়ের গভীরতা ও বিশালতা দেখেন না কবি। বিপরীতে দেখেন শঠতা, ছলনা। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন :

১.ধর্মনিরপেক্ষতা
২.নিয়মতান্ত্রিকতা
৩. ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ
৫. উপযোগবাদ
৬. বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র
৮.সার্বভৌমত্ববাদ
৯. উপনিবেশবাদ বা আধিপত্যবাদ
১০. প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক কাঠামো।

বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে আমরা আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তায় প্রথমেই লক্ষ করি ধর্মনিরপেক্ষতা। অতএব বলাই যাই এখানে রাবণের চেতনায় ধর্মনিরপেক্ষতা প্রাঞ্জল যা মধুসূদন-চেতনাপ্রসূত। দেখা যাচ্ছে আধুনিক রাষ্ট্রচেতনায় মধুসূদন বিজ্ঞ ও সচেতন, *মেঘনাদবধ* তারই প্রভাবপুষ্ট। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের উক্তি স্মরণযোগ্য :

> মেঘনাদবধ-কাব্যের মূল কাহিনীতে কবি রাবণের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে পাপ বা দুরাচারের উল্লেখ নাই; রাবণের ব্যবহারে, আচারে ও কার্য্যে নায়কোচিত গুণের অসদ্ভাব কোথাও নাই। কেবল, "অশোক কানন" নামক সর্গে সীতা-সরমা-সংবাদে, পূর্ব্বাপর ঘটনা বিবৃত করিবার প্রয়োজনে, মূল রামায়ণের অনুসরণ করিয়া কবিকে রাবণের দুষ্কৃতির উল্লেখ করিতে হইয়াছে।[৭]

মেঘনাদবধ কাব্যে মাইকেল এক নতুনতর চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছেন। রাক্ষসেরা এখানে সুসভ্য মানুষের মতো। তাদের দেশপ্রেম, সন্তানের প্রতি ভালোবাসা, হিংসা-বিদ্বেষ-সংকট ঘোরতর দানা বেঁধেছে। বীরত্বে, গৌরবে তারা সাধারণ মানুষের মতো হয়ে উঠেছে। গোলাম মুরশিদ মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী *আশার ছলনে ভুলি* গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, 'মাইকেল বারবার পৌরাণিক কাহিনি বেছে নিয়েছেন। এ থেকে মনে হতে পারে যে, তিনি পৌরাণিক জগতে ফিরে যেতে চেয়েছেন। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, সেটি মোটেই ঠিক নয়।'[৮]

বাল্মিকীর *রামায়ণ* অনুসারে লঙ্কা আক্রমণে দেব-দেবীও অংশ নেয়। সেখানে রামকে বিজয়ী করার জন্য দুর্গার কৌশলও কার্যকর ছিল। এমনকি স্বয়ং রামও দেবতার অবতার ছিলেন। অর্থাৎ রামও বিষ্ণুরই অংশ ছিলেন। রাম-লক্ষ্মণ ও রাবণ-মেঘনাদ বাহিনীর যুদ্ধে দেব-দেবীরই জয় হয়। সুতরাং বাল্মিকীর রামায়ণ জুড়ে দেবদেবী, ঐশ্বরিক শক্তি ও ধর্মেরই জয়গান গাওয়া হয়। জাঁ বোডেন তাঁর তত্ত্বে আধুনিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ধর্মকে স্বীকৃতি দিলেও ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাবের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেন '...রাষ্ট্র কোনো একটি নির্দিষ্ট ধর্মমতকে রাষ্ট্রধর্মে পরিণত করে সকলের উপরে জবরদস্তিমূলকভাবে তা চাপিয়ে দিতে পারবে না।'[৯] জাঁ বোডেনের আধুনিক রাষ্ট্রের তত্ত্বই *মেঘনাদবধ* কাব্যে প্রতিফলিত। *মেঘনাদবধ* কাব্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত দেব-দেবীর মহিমাকীর্তনের পথ থেকে দূরে সরে এলেন। জয়গান গাইলেন দেশপ্রেম ও দেশপ্রেমিক মানুষের। বীরবাহুর মৃত্যুর পর রাবণের মুখ দিয়ে মাইকেল উচ্চারণ করালেন :

মহাশোকে শোকাকুল কহিলা রাবণ;
যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ, কুমার
প্রিয়তম, বীরকুলসাধ এ শয়নে
সদা! রিপুদলবলে দলিয়া সমরে,
জন্মভূমি-রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ়; শত ধিক্ তারে![১০]

উল্লিখিত কথাগুলো রাবণের সংলাপ হলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে এসবই মাইকেল মধুসূদনের কবিমানসপ্রসূত উক্তি। মাইকেল মধুসূদন দত্ত দেখাতে চেয়েছেন, রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে রাবণকুলের যুদ্ধে সন্তানের বীরগতিতে রাবণ শোকাকুল হলেও ভীত নন, পুত্রের নিহত হওয়ার খবরেও হাল ছাড়তে রাজি নন। বরং জন্মভূমির রক্ষার স্বার্থে প্রাণ বিসর্জনকে সম্মানের চোখে দেখেন। এখানেই অন্যান্য কবিদের থেকে মাইকেলের দৃষ্টি অনন্য। তিনি রঙ্গলালের মত স্বাধীনতা হীনতায় ভীত হয়ে মরতে চাননি বরং বীরদর্পে মৃত্যুকে বরণ করতে চেয়েছেন যা আধুনিক রাষ্ট্রচেতনার জাতীয়তাবাদেরই পরিচায়ক। তিনি উচ্চারণ করেছেন, 'জন্মভূমি-রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?/ যে ডরে, ভীরু সে মূঢ়; শত ধিক্ তারে!' এই ধিক্কারের ভেতর দিয়ে রাবণের ভাই বিভীষণকেও তিরস্কৃত করা হলো। বিভীষণ পক্ষ ত্যাগ করে রামের পক্ষাবলম্বন করে স্বদেশের বিরুদ্ধে অবস্থান

নিয়েছে। রামায়ণে এই ঘটনা ধর্ম ও পুণ্যের পক্ষে গেলেও *মেঘনাদবধ* কাব্যে বিভীষণের ভূমিকা দেশদ্রোহীর। আধুনিক রাষ্ট্র প্রসারের একটি দিক হলো সাম্রাজ্যবাদী চেতনা বা আধিপত্যবাদ। একে উপনিবেশায়নের অন্যতম অস্ত্র বলা যায়। এটি লক্ষনীয় রাম ও বিভীষণ চরিত্রে। সমালোচকের ভাষায় :

> এই কাব্যে রাম-লক্ষণের চেয়ে রাবণ-ইন্দ্রজিৎ বড় হইয়া উঠিয়াছে। যে ধর্মভীরুতা সর্বদাই কোনটা কতটুকু ভালো ও কতটুকু মন্দ তাহা কেবলই অতি সূক্ষ্মভাবে ওজন করিয়া চলে, তাহার ত্যাগ দৈন্য আত্মনিগ্রহ আধুনিক কবির হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে নাই।[১১]

আমাদের মনে রাখতে হবে, মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্ম সনাতন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ে। পরবর্তী সময়ে তিনি সনাতন ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। ফলে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের দেবদেবীর প্রতি তাঁর ভক্তি-বিশ্বাস কোনোটাই থাকার কথা নয়। আবার তাঁর পূর্বপুরুষরা যেহেতু সনাতন ধর্মের অনুসারী ছিলেন, সেহেতু তিনি ওই ধর্মের দেব-দেবীকে তাচ্ছিল্য করার মতো সাহসও দেখাননি। কারণ তিনি নিজে যতই খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হোন, তাঁর সমাজ, তাঁর বাবা-মা, তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও সমাজের সবাই সনাতনধর্মাবলম্বী। সুতরাং সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর বিশ্বাসকে তিরস্কার করার দুঃসাহস তিনি দেখাতে চাননি। আবার বাল্মিকী যেখানে রামের প্রতি ভক্তিরসে অবনত ছিলেন, মাইকেল সেখানে নিস্পৃহ ছিলেন। বিপরীতে তিনি রাবণ-মেঘনাদকেই বীরের বরমাল্য পরাতে চেয়েছেন। এই কারণে বাল্মিকী যেখানে রামকে অবতার জ্ঞানে সম্মান জানিয়েছেন, সেখানে মাইকেল ধরেছেন ভিন্নপথ। 'ভগবানের অবতার বলে রাম যে শ্রদ্ধা পেয়েছেন, তা কবি তাকে দেবেন না।'[১২] অর্থাৎ মধুসূদন ধর্মের ভিত্তিতে চরিত্রের মূল্যায়ন করতে চাননি, মানুষকে তার কর্মের ভেতর দিয়ে আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। মানুষকে তার মানবতা, বীরত্ব ও দেশপ্রেমে এবং সর্বোপরি দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় মানুষের কর্তব্যবোধ ও কর্তব্যজ্ঞানকে মর্যাদাপূর্ণ করে তুলেছেন। তাই যে রামকে ভগবানের অবতাররূপে বাল্মিকী উপস্থাপন করেছেন, সেই অবতারের ঐশীশক্তির প্রতি নিস্পৃহভাব দেখিয়ে দেশপ্রেমিক রাবণ ও মেঘনাদকে বীরের বরমাল্য পরিয়েছেন। রাষ্ট্রচিন্তার 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ', 'সাম্যবাদ' প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য এখানে লক্ষনীয়।

বাল্মিকীর রামায়ণে যেখানে ধর্মচিন্তার জয়ধ্বনী ছিল, মাইকেল সেখানে ধর্মের অবতারকে ভিখারী বলেই তিরস্কার করালেন মেঘনাদপত্নী প্রমীলার কণ্ঠে :

> দানব-নন্দিনী আমি,রক্ষ-কুল-বধূ;
> রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,
> আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে?[১৩]

মেঘনাদপত্নী প্রমীলার এই উক্তির মধ্য দিয়ে ধর্ম-ধর্মাবতার-দেব-দেবীর রাষ্ট্রধারণার বিপরীতে মানবরাষ্ট্রচিন্তার ঘোষণা দিলেন মাইকেল। প্রমীলা কেবল ইন্দ্রজিতের পত্নী নয়, লঙ্কার বীরও বটে। যে রামের নামের ভয়ে লঙ্কাবাসী কম্পমান, যে রামকে ভগবানের অবতার মেনে খোদ রাবণেরই ভাই বিভীষণ স্বপক্ষ ত্যাগ করেছেন, সেই রামকে ভিখারী বলার সাহস দেখিয়েছেন প্রমীলা। নারী-চরিত্র চিত্রণে আধুনিক

দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন মধুসূদন। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে নারীদের 'সর্বংসহা', 'সম্ভোগবাদী' প্রভৃতি যে সকল অভিধার আবরণে মুড়িয়ে রাখা হতো, মধুসূদন তাদের সেই আবরণের বেড়াজাল থেকে টেনে বের করলেন। *মেঘনাদবদ* কাব্যে শুধু প্রমীলা নয় সীতা, মন্দোদরী প্রত্যেকে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়েছে। তবে বিশেষত প্রমীলার কথাই সর্বাগ্রে উচ্চারিত। আমরা উল্লেখ করতে পারি এই উক্তিটি, 'প্রমীলা চরিত্রই *মেঘনাদবধের* মধ্যে নূতন এবং মধুসূদনের কল্পনাকাননের সর্বোৎকৃষ্ট কুসুম। যে বঙ্গভূমি, সাতশত বৎসরেরও অধিককাল পরাধীনতায় নিষ্পেষিত হইতেছে, তাহার কোন কবির কল্পনা হইতে প্রমীলার ন্যায় বীরাঙ্গনার উদ্ভব নিরতিশয় বিস্ময়কর।'[১৪] দেশপ্রেমে তেজীয়ান প্রমীলা ভার্জিলের Camilla, ত্যাসোর Clorinda, Guildippe, Erminie এবং বাইরনের Maid of Saragosa থেকে স্বতন্ত্র হয়ে উঠলো। কুলবধূর কোমলতা পতিপ্রাণার আত্মবিসর্জনে নিমগ্নচিত্তকে ছাড়িয়ে প্রমিলা চরিত্রে বীরাঙ্গনার শৌর্যই প্রধান হয়ে উঠলো। রাষ্ট্রচেতনে মাইকেল ও প্রমীলা হয়ে উঠলো অভিন্ন সত্তা :

> রোষে, লাজ ভয় ত্যাজি, সাজে তেজস্বিনী
> প্রমীলা। কিরিটি-ছটা কবরী উপরি,
> হায়রে শোভিল যথা কাদম্বিনী পরে
> ইন্দ্রচাপ। লেখা ভালে অঞ্জনের রেখা,
> ... ...
> সাজিলো দানব বালা হৈমবতি যথা।
> নাশিতে মহিষাসুরে ঘোরতর রণে।[১৫]

ভগবানের অবতারের মহিমাকে অস্বীকার করে মানুষের কর্মের জয়গান গাওয়ার মতো বিদ্রোহীসত্তা মাইকেল তাঁর সৃষ্টির ভেতর দিয়ে নিজের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছেন। সমালোচকের ভাষায় :

> ন্যায়নীতির অনুসরণে পাঁজিপুঁথি মিলিয়ে এবং দেবাদেশ শিরোধার্য করে যে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সংস্কার আমাদের দেশে এতদিন শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল বাণীর বিদ্রোহী সন্তান মধুসূদন তাকে অবহেলা ও উপেক্ষা করে, সে দুর্মত, উশৃঙ্খল, প্রচণ্ড প্রাণশক্তি কোন নিয়ম-সংযম মানে না। তাকে বরমালা দিয়েছিল। উনবিংশ শতকের নবজাগ্রত বাঙালি পুরোনো বাঁধাবাঁধি সংস্কারের সীমায়িত সংকুচিত গণ্ডীর মধ্যে আর তৃপ্তি পাচ্ছিল না। তাই রাবণের বন্ধনহীন প্রাণের অসহবেদনার মধ্যে গোটা জাতি যেন নিজেকেই প্রত্যক্ষ করলো।[১৬]

রাম-লক্ষ্মণের বিরুদ্ধে রণসাজে সেজে ইন্দ্রজিৎ যখন যুদ্ধে যেতে উদ্যত, তখন তার সেই উদ্যোগে মাইকেল নিজেই উদ্বেল। রামের বিরুদ্ধে মেঘনাদের যোদ্ধাসাজকে মহিমান্বিতরূপে দেখে মাইকেল একদিকে দেশপ্রেমিকের রাষ্ট্রচিন্তা ও রাষ্ট্ররক্ষার ভূমিকাকে উজ্জ্বল করে তুলেছেন, অন্যদিকে মেঘনাদের জন্মদাত্রী মন্দোদরীর স্তব করেছেন। এই স্তবগাথার উদ্দেশ্য একটি বাণী– মন্দোদরীর গর্ভজাতপুত্র ইন্দ্রজিৎ প্রস্তুত হচ্ছেন ভগবানের অবতার রামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে। ভগবানের অবতারের বিরুদ্ধে

ইন্দ্রজিতের যুদ্ধযাত্রার ভেতর দিয়ে কেবল রাবণের সম্মান রক্ষার বিষয়ই জড়িত নয়, মাতৃভূমি লঙ্কার স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার বিষয়ও নিহিত রয়েছে। বিষয়টি মাইকেল এভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন :

ধন্য রাণী মন্দোদরী! ধন্য রক্ষঃ-পতি
নৈকষেয়! ধন্য লঙ্কা, বীরধাত্রী তুমি!
আকাশ-দুহিতা ওগো শুন প্রতিধ্বনি,
কহ সবে মুক্তকণ্ঠে, সাজে অরিন্দম
ইন্দ্রজিৎ। ভয়াকুল কাঁপুক শিবিরে
রঘুপতি, বিভীষণ, রক্ষঃ-কুল-কালি,
দণ্ডক-অরণ্যচর ক্ষুদ্র প্রাণী যত।"
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য, নাদিল রাক্ষস;—
পুরিল কনক-লঙ্কা জয় জয় রবে।[১৭]

মানবসভ্যতার বাসিন্দাদের স্বাধীনভাবে চলাফেরার জন্য প্রয়োজন স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র। সেই রাষ্ট্র যে বহিঃশত্রুর শাসনমুক্ত হয়, আক্রমণমুক্ত হয়, সেই স্বপ্ন ও দৃঢ়তা থাকে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের। আর শাসকদের থাকে সে দায়িত্ব ও কর্তব্যজ্ঞান। মধুসূদন দায়িত্ব-কর্তব্যকে শিরোধার্য মেনে *মেঘনাদবধ* কাব্যের কাহিনিবিন্যাস ও চরিত্রনির্মাণ করেছেন। শাসকবর্গের জন্য তিনি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষাকে করে তুলেছেন অনিবার্য। তাই ভগবানের অবতার রামের পক্ষ না নিয়ে সীতাহরণকারী রাবণের পক্ষ নিয়েছেন। এমনকি রাবণের সীতাহরণকে দেখেছেন গৌণ করে, বড় করে দেখেছেন রামের লঙ্কা আক্রমণকে। এক্ষেত্রে তিনি রামকে ভগবানের অবতার নয়, পরদেশআক্রমণকারী তস্কর হিসেবেই দেখেছেন। এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর উক্তি প্রণিধানযোগ্য, 'মিলটন সম্বন্ধে একটা কথা আছে যে মনে মনে তিনি শয়তানেরই স্বপক্ষে ছিলেন; বোধহয় সেই জন্যই মাইকেল স্থির করেছিলেন যে রাবণের প্রতি পক্ষপাত করা তার কর্তব্য।'[১৮]

রাবণ-মেঘনাদের প্রতি মাইকেলের পক্ষপাতের সুস্পষ্ট কারণ রয়েছে। প্রথমত মাইকেলের ধর্মান্তরিত হওয়া, দ্বিতীয়ত আধুনিক জীবনবীক্ষায় নিজেকে দীক্ষিত করে তোলা। ধর্মান্তরিত হওয়ার পর মাইকেলের ভেতর নতুন ধর্মের আচরণীয় বিষয়গুলোর প্রভাব দৃশ্যমান যেমন হয়নি, তেমনি অন্তরেও যে খুব বেশি ঠাঁই পেয়েছিল, তারও প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং দেব-দেবী-ঈশ্বর-গডের চেয়ে মানুষকে বড় করে দেখার চোখ তাঁর দিনে দিনে বিকশিত হয়ে চলেছিল। তাই ভগবানের অবতারের সম্মানার্থে রামের লঙ্কা আক্রমণকে তিনি সমর্থন করতে পারেননি। মানুষের বসবাসের জন্য যে নিরাপদ ও স্বাধীন মাতৃভূমি অর্থাৎ রাষ্ট্রভাবনাই মাইকেলের মনে স্থান পেয়েছিল। রাষ্ট্রভাবনাকে তিনি বড় করে দেখেছেন বলে কোনো মানুষের বিশেষ কোনো দিককে তিনি বিশিষ্টরূপে দেখেননি। এই প্রসঙ্গে সৈয়দ আলী আহসানের মূল্যায়ন প্রণিধানযোগ্য :

> *মেঘনাদবধ* কাব্যে আমরা মানবজীবনের বিশিষ্ট কোন একটি দিকের পরিচর্যা পায় না। কিন্তু মানুষের সম্পন্ন ব্যক্তিত্বকে কর্মচঞ্চল অবস্থায় দেখি। *মেঘনাদবধ* কাব্যের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হচ্ছে কবির জীবনোপলব্ধির পরিপূর্ণতা।[১৯]

কাহিনি-বিচারে *মেঘনাদবধ* কাব্য জুড়ে রয়েছে মূলত রাবণের পুত্রহারানোর শোক। রাবণ পুত্রহারানোর শোক প্রকাশ করলেও তার পুত্র ইন্দ্রজিতের দেশমাতৃকার জন্য আত্মত্যাগের ভেতর দিয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর রাষ্ট্রভাবনা ও মানবদরদি কবিমানসের পরিচয় দিয়েছেন। মোহিতলাল মজুমদারের মতে, 'এই কাব্যের মূল প্রেরণা ছিল ইহা-ই রাম-লক্ষণ-ইন্দ্রজিতের প্রতি পক্ষপাত এই কারণেই ঘটিয়াছে।'[২০]

৪. পরিশেষে একথা বলা অসঙ্গত হবে না যে, 'মধুসূদন আধুনিক ছিলেন তাঁর যুগ অপেক্ষাও।'[২১] *মেঘনাদবধ* কাব্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর রাজনৈতিক চেতনা, রাষ্ট্রভাবনা ও কবিমানসের এমন এক দিক ফুটিয়ে তুলেছেন, যা একজন দেশপ্রেমিকের হৃদয় থেকে উৎসারিত। সেখানে অলৌকিকতা, দেব-দেবীর মাহাত্ম্য গৌণ হয়ে পড়েছে। বিপরীতে মানুষ ও মানুষের জন্য শত্রুমুক্ত আবাসভূমির আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়ে উঠেছে। রাবণের দেশপ্রেমে, রাষ্ট্রচিন্তায় যে অভিনবত্ব সৃজিত হয়েছে তা মাইকেল-কবিমানসপ্রসূত অসমসাহসিকতার ফসল। মধুসূদন দার্ঢ্য চিত্তে আধুনিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় মানবকল্যাণের উজ্জীবন ঘটিয়েছেন। বলা যায় *মেঘনাদবধ* কাব্য আধুনিক বাংলা কাব্যের ধারায় মহাকাব্য ও মহৎকাব্য। *মেঘনাদবধ* কাব্যপ্রসূত মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিমানস ও রাষ্ট্রচিন্তার নির্যাস প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তর বহন করে সুপ্রতিষ্ঠিত করুক উন্নত রাষ্ট্র।

তথ্যনির্দেশ

১. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *সমালোচনার কথা* (কলিকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সি, পুনর্মুদ্রণ, ২০০২-২০০৩), পৃ. ২২৮
২. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, *মধুসূদন* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩), পৃ. ১৮
৩. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা., *মেঘনাদবধ কাব্য* (কলিকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সি, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৩), পৃ. ৩
৪. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮
৫. হাবিব রহমান, *বাংলা ছন্দ ও অলঙ্কার* (খুলনা : মডার্ন বুক ডিপো, ১৯৯৫), পৃ. ৩
৬. মাইকেল মধুসূদন দত্ত, *মেঘনাদবধ কাব্য* (ঢাকা : সালমা বুক ডিপো, ২০১২), পৃ. ৪৪
৭. মোহিতলাল মজুমদার, *কবিশ্রীমধুসূদন দত্ত* (কলকাতা : বিদ্যোদয় লাইব্রেরী লিমিটেড, সপ্তম সং., ১৯৯৮), পৃ. ৪৭
৮. তদেব
৯. মুহাম্মদ আয়েশ উদ্দীন, *রাষ্ট্রচিন্তা পরিচিতি* (ঢাকা : আইডিয়াল বুকস, ১৭ সং., ২০১৮), পৃ. ৩৫৫
১০. মাইকেল মধুসূদন দত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩
১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *প্রবন্ধ সমগ্র* (ঢাকা : 'সাহিত্যসৃষ্টি', সময় প্রকাশন, ২০১৫), পৃ. ৪৫৪
১২. ক্ষেত্র গুপ্ত, *মধুসূদন: কবিআত্মা ও কাব্যশিল্প* (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৮), পৃ. ১৪৭
১৩. মাইকেল মধুসূদন দত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬
১৪. যোগীন্দ্রনাথ বসু, *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত* (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৩), পৃ. ২৫১
১৫. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭

১৬. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, (কলিকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সি, পুনর্মুদ্রন, ২০০১), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩২
১৭. মাইকেল মধুসূদন দত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯
১৮. বুদ্ধদেব বসু, '*মাইকেল*', *নির্বাচিত প্রবন্ধ সমগ্র*, বেগম আকতার সম্পা. (ঢাকা : অবসর, ২০১৪), পৃ. ২১৩
১৯. মোঃ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ), পৃ. ২৪৭
২০. মোহিতলাল মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩
২১. প্রণব চৌধুরী সম্পা., *আলোচনা ও নির্বাচিত কবিতা ঈশ্বর গুপ্ত, বিহারীলাল, মধুসূদন, কায়কোবাদ* (ঢাকা : বাংলাদেশ বইঘর, ২০০০), পৃ. ৪৩৩

উনিশ শতকে অন্তঃপুরের নারী : মধুসূদনের প্রহসন

তানিয়া তহমিনা সরকার*

সারসংক্ষেপ

আধুনিকতার আলোকবর্তিকা হিসেবে মাইকেলের কাব্যে নারীর আত্মমর্যাদা ও ব্যক্তিত্বের বিষয়টি প্রথম থেকেই স্পষ্টভাবে প্রতিভাত। অন্তঃপুরের নারীদের ভাবনাও যে সাহিত্যে বিবৃত হতে পারে তা মাইকেল মধুসূদন করে দেখিয়েছেন তাঁর রচিত প্রহসন *একেই কি বলে সভ্যতা* ও *বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ* প্রহসনে। বাঙালি অন্তঃপুরের নারীদের মনোজাগতিক ভাবনা, পারিপার্শ্বিক প্রেক্ষাপটে তাদের অবস্থান, কর্মসম্পাদনে তাদের উদ্যোগ বা ভূমিকা; সর্বোপরি নারীও যে আলাদা সত্তার অধিকারী, তাদের কর্ম ও চিন্তায় যে স্বাতন্ত্র্য থাকতে পারে সে ব্যাপারে মাইকেল মধুসদন দত্ত প্রথম আলোকবিন্দু ফেলেছেন প্রহসন দুটিতে। পুরুষ সমাজের পোষ্য নারীরা মানসিক দাসত্ব মেনে নিয়েই অন্তঃপুরে দিনযাপনে অভ্যস্ত ছিল। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো ব্যক্তিদের সামাজিক সংস্কার ও স্ত্রী শিক্ষা প্রচলনের ব্যাপক প্রসার সত্ত্বেও ভারতীয় নারীদের অধিকাংশই শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত ছিল। বঞ্চিত অংশের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রহসন দুটিতে। এই প্রবন্ধে পাঠ বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে উনিশ শতকের প্রেক্ষাপটে মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রহসনে তৎকালীন অন্তঃপুরের নারীদের অবস্থান, কর্ম, মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব ও ব্যক্তিগত জীবনের স্বরূপ অন্বেষণের চেষ্টা করা হবে।

১

সোমপুর বিহার, নালন্দা, পুষ্পগিরি ইত্যাদি প্রাচীন বিদ্যাপীঠের জন্য ভারতবর্ষ প্রসিদ্ধ। শিক্ষার প্রচলন প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় সমাজে থাকলেও তা থেকে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বঞ্চিত ছিল নারীরা। ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি নারীর প্রতিকূলে কাজ করেছে বরাবর। নারীরা পুরুষের অনুগামী বলে স্বীকৃত। নারীরাও এ 'মানসিক দাসত্বে' ছিল অভ্যস্ত। পুরুষের ভাবনায় হেলান দেওয়া নারীর কর্ম-ভাবনা ও চিন্তার দৃঢ়তা পুঁইলতার মতোই ছিল পুরুষের চিন্তার সমান্তরাল। পুরুষের ভাবনার বিপরীতে পথচলার মতো চিন্তা ও সাহস কোনটাই ছিল না উনিশ শতকের নারীর। সমাজের এ চিত্র স্বাভাবিকভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে সমসাময়িক সাহিত্যে। নারীর ব্যক্তিগত ও সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে প্রথম সোচ্চার হন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)। সতীদাহপ্রথা রদ করার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা চালান। স্বামীর মৃত্যুর পরে নারীর অস্তিত্বকে অস্বীকার করা এ সমাজের জন্য রামমোহনের এই সাহসী উদ্যোগ ছিল অভাবিত। যথেষ্ট বিরুদ্ধাচার ও অপপ্রচার সত্ত্বেও ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা রদ করে আইন পাশ করেন

*ড. তানিয়া তহমিনা সরকার : সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

লর্ড বেন্টিঙ্ক। এর পরপরই বিধবাবিবাহ প্রচলন করার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) সর্বোচ্চ চেষ্টা চালান। এ নিয়ে তাঁকে সামাজিক নানান বাধার সম্মুখীন হতে হয়। তারপরও বিদ্যাসাগর এ আন্দোলন চালিয়ে যান। পাশাপাশি নারীশিক্ষার জন্য ব্যক্তিগত ও সরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন স্থানে স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে থাকেন। নারী-অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিদ্যাসাগরের এই সাহসী উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বিপরীত চিন্তার প্রাবল্যে বাঙালি সমাজকে নানান উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে। একদিকে আধুনিকতার ডাক অন্যদিকে প্রচলিত সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পিছুটান। এ দুয়ের দোদুল্যমানতায় উনিশ শতকের বাঙালি-মানসের দ্বিধা ও দৈর্বল্য লক্ষ করা যায়। ঈশ্বরগুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪) মতো বিদ্বান ও সৃজনশীল সাহিত্যিকগণও তাঁদের লেখায় নারীর শিক্ষা, বিধবাবিবাহ ও স্বাধীনতা সম্পর্কে কটাক্ষ করেছেন। উনিশ শতকে নারীর স্বতন্ত্র কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। পিতা বা স্বামীর অধীন বাঙালি নারী তখন ধর্মীয় ও সামাজিক রোষ সহ্য করতে ব্যস্ত। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ব্রাহ্মধর্ম, ঠাকুর পরিবার, ইয়ংবেঙ্গল প্রমুখের চেষ্টায় নারীদের জন্য তৈরি অচলায়তন আস্তে আস্তে ভেঙে যাচ্ছে। তবে এর বিরুদ্ধমতও যথেষ্ট সক্রিয় বলে অবাধে নারীরা এর ফলভোগ করা শুরু করেনি। ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্মীয় গোঁড়ামী, সংস্কারপন্থী উদার ব্রাহ্মসমাজ ও যুক্তিবাদী ইয়ংবেঙ্গলের ত্রিমুখী দ্বন্দ্ব ও আদর্শের মাঝে দিশেহারা বাঙালি নারী সময় নিয়েছে নিজের আত্মপরিচয় অনুসন্ধান করে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য। উপরন্তু উনিশ শতকের গোড়ায় নারীদের জন্য শিক্ষার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন ছিল না। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ইয়ংবেঙ্গল সোসাইটির ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিধবাবিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ রোধকরণের পাশাপাশি নারীশিক্ষার প্রচলন শুরু হয়।

খ্রিস্টান মিশনারিদের হাতেই ভারতীয় বাঙালি নারীর শিক্ষার সূচনা। ১৮১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত 'The Female Juvenile Society for the Establishment and Support of Bengalee Female Schools' সমিতি কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। অবশ্য মিশনারিদের উদ্যোগ ও আন্তরিক প্রচেষ্টা ধর্মীয় অবিশ্বাসের কারণে ব্যর্থ হয়। এই কর্মযজ্ঞ খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করার নতুন কৌশল বলে পরিগণিত হয়। ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার এবং বাঙালির চিরন্তন জীবনযাপন পদ্ধতিও নারীশিক্ষার অন্যতম অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। বিশেষত তৎকালীন পুরুষসমাজ শিক্ষানুরাগী হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। ফলে নারীদের শিক্ষিত হয়ে ওঠার আগ্রহও তীব্র হয়ে ওঠেনি। পর্দাপ্রথা ও প্রাচীন মনোভঙ্গিও তাদের শিক্ষার প্রতি বিমুখ করে তোলে। ইয়ংবেঙ্গলের প্রচলিত সামাজিক ও ধর্মীয় রীতির বিপরীতে জীবনযাপনও নারীশিক্ষা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে অনাগ্রহ তৈরি করে। উনিশ শতকের এই সামাজিক, ধর্মীয় ও ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপটে নারীর অন্তঃপুরই ছিল তার চারণক্ষেত্র।

বন্দি বাঙালি নারীর মুক্তি-অভীপ্সায় উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিলেন ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য আদর্শ ও রীতিনীতিতে অভ্যস্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)।

উনিশ শতকের সূচনাপর্বে ইংরেজদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে পাশ্চাত্য শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ভাবসম্পদের সাথে নিবিড় পরিচয় গড়ে ওঠে ভারতবাসীর। ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ [প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি] প্রতিষ্ঠিত হলে পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বার ভারতবাসীর জন্য উন্মোচিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৮৪৯ সালে স্থাপিত হয় মেয়েদের জন্য বেথুন স্কুল।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ডিরোজিওর ভাবশিষ্য ছিলেন। হিন্দু কলেজে পড়াকালীন পাশ্চাত্যের শিক্ষা, সাহিত্য ও রীতিনীতি দ্বারা এতটাই প্রভাবিত হয়েছিলেন যে, তিনি হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন। এমনকি বাঙালি নারীকে উপেক্ষা করে জীবনসঙ্গী হিসেবে খুঁজে নেন পাশ্চাত্যেরই একজনকে। তবে এই পাশ্চাত্যপ্রেম ও প্রগতিশীলতা নিয়ে তিনি নিজেকে নবনির্মিত করে ফিরে এসেছিলেন বাঙালির জড়চৈতন্যে আঘাত করে নতুনের কেতন ওড়াতে। আধুনিক চেতনায় উজ্জীবিত মাইকেল বাংলা সাহিত্যকে গতানুগতিক মধ্যযুগ থেকে মুক্ত করেন। শুরু হয় আধুনিক যুগ। তবে এ পর্যায়ে নারীদের নিয়ে মধুসূদনের সাহিত্যকর্মে যে ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে তার প্রস্তুতি চলেতে থাকে বেশআগে থেকেই। ১৮৪২ সালে হিন্দু কলেজ আয়োজিত এক প্রতিযোগিতায় মাইকেল মধুসূদন 'স্ত্রীশিক্ষা' বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে স্বর্ণপদকে ভূষিত হন। ১৯৪৯ সালে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় যার নাম *Captive Ladie*। ইউরেশিয়ান পত্রিকায় *Rizia-Empress of Inde* এই কাব্যনাট্যটি ১৮৪৯-১৯৫০ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় :

> হিন্দু কলেজে প্রদত্ত শিক্ষা গ্রহণের ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সমাজে ও বাঙ্গালীর মনে যে আলোড়নের সৃষ্টি হ'ল তারই ফলে বাঙ্গালীর সাহিত্য, ধর্ম, কৃষ্টি, শিক্ষা, সংস্কৃতি সর্বত্রই এক নব জাগ্রত চিত্ততার আবির্ভাব হ'ল। এই নতুন পরিবেশে, নব ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ সমাজে জন্ম নিল নতুন দর্শন, নতুন সাহিত্য ও নব জীবন-বোধ।[১]

ইউরোপীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে মাইকেলের মনেও পাশ্চাত্যপ্রীতি, মানবিকবোধ ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের উন্মেষ ঘটে। অন্তঃপুরের অন্ধকোণের নারীদের পাশ্চাত্যের মতো দৃঢ়চেতা, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও স্বনির্ভর করে না তুললেও নারীর অন্তর্দহন ও মর্মজ্বালা প্রকাশিত হতে শুরু করে তাঁর সাহিত্যকর্মে। নারীর মনস্তত্ত্বে ও আচরণে আগুনের স্ফুলিঙ্গের উপস্থিতি দেখাতে ভুল করেননি তিনি। এরই প্রভাবে একে একে জন্ম নেয় তাঁর মানসকন্যারা– 'প্রমীলা', 'জনা', 'কৈকেয়ী', 'চিত্রাঙ্গদা', 'তারা'। আসলে মাইকেল 'বাংলার নব-জাগৃতির মর্মসত্যকে... আপন ব্যক্তিত্বের মধ্যে, উপলব্ধির সমগ্রতা দিয়ে'[২] উপলব্ধি করেছিলেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের সাহিত্যকর্মের নাম ও বিষয়বস্তুতে নারীচরিত্রের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। তাঁর তিনটি নাটকের নামকরণ করা হয়েছে কেন্দ্রীয় নারীচরিত্রের নামে।

মেঘনাদবধ কাব্য নামকরণের দিক থেকে ব্যতিক্রম, তা ছাড়া *শর্মিষ্ঠা*, *পদ্মাবতী*, *কৃষ্ণকুমারী*, *ব্রজাঙ্গনা*, *বীরাঙ্গনা* সর্বক্ষেত্রেই আমরা অঙ্গনাস্তুতিই দেখতে পাই।'[৩] মাইকেল *শর্মিষ্ঠা* নাটক লেখার পরপরই রচনা করেন দুটি প্রহসন *একেই কি বলে সভ্যতা?* (১৮৬০) ও *বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ* (১৮৬০)।

মাইকেলের অন্যান্য সাহিত্যকর্মে যে নারীদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, তাদের প্রায় প্রত্যেকেরই পৌরাণিক অস্তিত্ব রয়েছে। তাঁর আধুনিক মানসের প্রতিফলনে তাদের নবনির্মিতি ঘটেছে। কিন্তু এ দু'টি প্রহসনের নারী চরিত্রগুলো একান্তই বাস্তবানুগ, মাটিগন্ধী। বাঙালি সমাজভুক্ত সাধারণ অন্তঃপুরের নারী তারা, যাদের বিচরণক্ষেত্র একান্তই গৃহের অভ্যন্তরে। যদিও :

> নারীচরিত্র-চিত্রণের ক্ষেত্রে প্রহসনকার তাদের অবশ্য মোটামুটিভাবে একই শ্রেণিভুক্ত করে দেখেছেন- ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত করেননি।... কিন্তু তুলির সামান্য আঁচড়ে প্রহসনকার তাদের এমন জীবন্ত ক'রে তুলেছেন যে, একটি চরিত্র অনায়াসেই সমশ্রেণির আর একটি চরিত্র থেকে আপন স্বাতন্ত্র্য অনেকখানি অর্জন করে নিতে পেরেছে।[৪]

মাইকেলের কাব্যরচনার হাতেখড়ি ইংরেজি সাহিত্যকে ভালোবেসে। নাটক সৃজনের নেপথ্যে রয়েছে ভাল বাংলা নাটকের অভাববোধ। কিন্তু প্রহসন দুটি লিখেছেন তাঁর অন্তরের তাগিদ থেকে। বলা যেতে পারে, মধুসূদন প্রহসন দুটি লিখে স্বস্তি পেয়েছেন। এতে তাঁর অভিজ্ঞতাজাত সমাজ, ইয়ংবেঙ্গলের উচ্ছৃঙ্খলতা, পারিপার্শ্বিক কদর্য জীবন ও মানবেতর জীবনযাপনে অভ্যস্ত নারীদের তিনি উপস্থাপন করতে পেরেছেন শিল্পসত্যের বাস্তবতায়। কবির এই প্রকাশে অন্তর্নিহিত প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে তাঁর নিরপেক্ষ জীবনদৃষ্টি :

> একেই কি বলে সভ্যতা এবং বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ খুব স্বল্পকালের জন্য হলেও কবিকে তাঁর সমগ্র নাট্যসত্তা ধরে নাড়া দিল। এর মধ্যে আবার দ্বিতীয়টিতে নাট্যোৎকর্ষ খুবই উচ্চস্তরে উঠেছিল।... কবিচিত্তের একপ্রান্তে নিরপেক্ষ জীবনদৃষ্টির যে বীজটি বর্তমান ছিল, যাকে আমি অন্যত্র Absolute vision নামে অভিহিত করেছি তার সক্রিয়তা এই সাফল্যের ভিত্তি নির্মাণ করেছে।[৫]

মূলত প্রহসন দুটিতে মাইকেলের সমকালীন জীবনদৃষ্টির পরিচয় মেলে। উনিশ শতকের নারী সম্পর্কে একটি বাস্তবমুখী ধারণাও পাওয়া যায়। সমকালীন জীবন, প্রতিবেশ, পরিস্থিতি ও সমস্যার প্রকাশও ঘটেছে একমাত্র এই প্রহসন দুটিতে। কারণ :

> পৌরাণিক যুগ-পরিক্রমায় তাঁর আনন্দ *শর্মিষ্ঠা* এবং *পদ্মাবতী* (গ্রীক পুরাণ) নাটকে, তিলোত্তমা-*মেঘনাদবধ-বীরাঙ্গনা* কাব্যে শতধারায় বর্ষিত হয়েছে। *ব্রজাঙ্গনার* কল্পনারাজ্য অতীতের বর্ণাঢ্য দূরত্বের মায়াকে আশ্রয় করেছে, *মায়াকাননের* অপরিচিত রাজ্যও বর্তমান থেকে বহু দূরবর্তী *কৃষ্ণকুমারী*তে অবশ্য কবি নির্দিষ্ট ইতিহাসের যুগে নমে এসেছেন, কিন্তু বর্তমানের সঙ্গে তারও ব্যবধান অল্প নয়। ... বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার আমন্ত্রণে তিনি পথিকৃৎ। অথচ তিনি সদা অতীতচারী। একালের কণ্ঠে তিনি প্রাচীনের স্বর শুনিয়ে আস্বাদে আশ্চর্য বৈচিত্র্য এনেছেন।[৬]

ফলে শুধু বিষয়গত বৈচিত্র্য নয়, চারিত্র্যগত দিক থেকেও অভিনবত্ব খুঁজে পাওয়া যায় মাইকেলের প্রহসনে।

২.

এই প্রবন্ধের শিরোনামে বিবৃত উনিশ শতকের অন্তঃপুরের নারীদের দেখা মেলে একমাত্র এই প্রহসনদুটিতে। *একেই কি বলে সভ্যতা?* প্রহসনে গৃহিণী, হরকামিনী, প্রসন্নময়ী, নৃত্যকালী, কমলা, বারবিলাসিনী এবং *বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ* প্রহসনে পুঁটি ও ফতেমা এ কয়েকটি নারীচরিত্রের দেখা মেলে। বাঙালির সমাজজীবন ও জীবনদর্শন মূলত আদর্শভিত্তিক। নারীদের আদর্শ রমণী 'সীতা' এবং আদর্শ সতী 'সাবিত্রী'। সুখে-দুঃখে-আত্মত্যাগে-স্বামীসেবায় 'সীতা' ও 'সাবিত্রী' হয়ে ওঠাই ছিল বাঙালি রমণীর একান্ত চাওয়া। এই প্রচেষ্টার বিপরীতে হাঁটতে দেখা গেছে হরকামিনীকে। হরকামিনীর স্বামী নবকুমার ইয়ংবেঙ্গল প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান-তরঙ্গিণী সভার সভ্য। সভায় গিয়ে নববাবু বলেন :

> জেন্টেলম্যান, তোমাদের মেয়েদের এজুকেট কর- তাদের স্বাধীনতা দেও– জাতভেদ তফাৎ কর– আর বিধবাদের বিবাহ দেও– তা হলে এবং কেবল তা হলেই, আমাদের প্রিয় ভারতভূমি ইংলন্ড প্রভৃতি সভ্য দেশের সাথে টক্কর দিতে পারবে–।[৭]

বিদ্রূপের ছলে বলা নববাবুর এ সংলাপে তৎকালীন শিক্ষিত গণমানুষের মনের ভাব বিবৃত হয়েছে। ইংরেজি শিক্ষার আলোকে তারা অন্ধকুসংস্কার থেকে মুক্তি পেতে চায়। কেশবচন্দ্র, রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, ডিরোজিওর ঐকান্তিক কর্মগুণ ও প্রচেষ্টাতেও এ শিক্ষিতশ্রেণির ব্যর্থতা আটকানো যায়নি। এর অন্যতম কারণ ইয়ংবেঙ্গলের রীতি বহির্ভূত আচরণ ও অন্তঃপুরের নারীদের বন্দিদশা।

অন্তঃপুরের মেয়েদের নিয়ে নববাবুদের ভাবনা ও সামাজিক বাস্তবতার মধ্যে দুস্তর পার্থক্য লক্ষ করা যায়। মেয়েদের স্বাধীনতা, শিক্ষা, বিধবাদের বিয়ে এই তিন প্রসঙ্গের প্রথম দুটি একেবারেই অনুপস্থিত হরকামিনীদের জীবনে। এই প্রহসনের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে নববাবুর পরিবারের চারজন নারী প্রসন্নময়ী, নৃত্যকালী, কমলা ও হরকামিনীর পরিচয় পাই। তারা নববাবুর একান্ত কক্ষে বসে তাস খেলে ও হাসি-তামাশা-গল্পে সময় কাটিয়ে দেয়। মেয়েদের 'এজুকেট' করার কোন ইঙ্গিতও এ পরিবারে মেলেনি। বরং কলকাতার বর্ধিষ্ণু পরিবারের মেয়েদের মতোই তারা আলস্য ও রঙ্গ-তামাশায় জীবন কাটায়। তৎকালীন মেয়েদের মধ্যে তাসখেলা ছিল জনপ্রিয়। নববাবুর অন্তঃপুরের নারীরাও এ খেলায় আসক্ত। গৃহিণী তাদের কাজের তাগিদ দিলেও তারা সময়ক্ষেপণ করত। কারণ :

> এই কুঁড়েমি ছাড়া তাদের কোনও উপায় ছিল না। কারণ নাগরিক জীবনের বিলাসিতা ও আভিজাত্য বোধের জন্যে তারা সাংসারিক কাজ করতেন না। শিক্ষা ও তদ্‌প্রসূত সুরুচির বালাইও এদের খুব বেশী ছিল না। স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবনের সুখ, স্বস্তি থেকে তারা ছিল বঞ্চিত।[৮]

উনিশ শতকের বাবু কালচারের যূপকাষ্ঠে বলি হয়েছে উনিশ শতকের নারীরা। উপরন্তু কৌলিন্যপ্রথাসহ নারীকে অবদমিত করে রাখার অন্যান্য সামাজিক ও ধর্মীয় রীতি-নীতিও অবলুপ্ত হয়নি। হরকামিনীর সংলাপের মাধ্যমে জানা যায়, নববাবুর বোন প্রসন্নময়ীকে তার স্বামী গ্রহণ করেনি। বাবার বাড়িতে সে বাধ্য হয়ে অবস্থান করে।

মদ্যপ ভাই পাশ্চাত্যরীতির অনুকরণে তার গালে চুম্বন করলে সে লজ্জা পায়। অনন্যোপায় প্রসন্নকে তা মেনে নিয়েই বাবার গৃহে অন্তরীণ থাকতে হয়। যদিও অনেক সমালোচকই মাইকেলের এ বিষয়ে অশ্লীলতার অভিযোগ এনে তাঁকে তৎকালীন পারিবারিক ও সামাজিক জীবন সম্পর্কে অজ্ঞ বলে অভিহিত করেছেন।

মাইকেলের শৈশব কেটেছে বাংলাদেশের যশোরের সাগরদাঁড়ী গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। মায়ের ভীষণ ঘনিষ্ঠ ছিলেন তিনি। অবাধ বিচরণ ছিল তাঁর তদ্অঞ্চলে। পিতার কার্য্যোপলক্ষে ও শিক্ষার তাগিদে তাঁকে অল্পবয়সে কলকাতা চলে যেতে হয়। পরিবারচ্যুত মাইকেল এরপর আর বাঙালি সংসার বা সমাজজীবনে তেমনভাবে প্রবেশের সুযোগ পাননি। শৈশব থেকেই মাইকেল ছিলেন তীক্ষ্ণধী ও মেধাবী। ফলে সাগরদাঁড়ী গ্রাম বা বাংলার দাম্পত্য জীবন, বাঙালির জীবন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে তাঁকে জীবনঘনিষ্ঠ হতে হয়নি। শৈশবের অভিজ্ঞতা ও পারিপার্শ্বিক উপলব্ধি তাঁকে সুঁচতুর করে তুলেছিল। তাছাড়া গোপনীয়তায় অনিচ্ছুক বাঙালি জীবনের দাম্পত্য কলহ বা সাংসারিক কোন্দল প্রাচীনকাল থেকে পাড়া-প্রতিবেশির উপভোগের বিষয়। ফলে তাঁর দূর প্রবাসে বসবাস বা বিলেতি জীবনযাপন বাংলার যাপিতজীবন সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে উঠতে অন্তরায় হয়নি। পারেনি যে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ মধুসূদন সৃষ্ট প্রহসন দুটি। মধুসূদনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বাইরে অনুভূতির প্রাবল্য যে কতটা তীক্ষ্ণ ছিল তা নববাবুর পারিবারিক ও তৎকালীন সমাজচিত্রের দিকে তাকালেই প্রমাণিত হয়। পুত্রের জ্ঞান, জীবনযাপন ও সৌহার্দ্যের প্রতি ভরসা ছিল বৃদ্ধ কর্তা মহাশয়ের।

কিন্তু মদ্যপানে আসক্ত অজ্ঞান নববাবুকে দেখে তার বাবা বিচলিত হয়। যদিও নববাবুর মা বাংলার চিরায়ত মায়ের মতো একই রকম স্নেহপ্রবণ ও দয়ার্দ্র। পুত্রের মদ্যপান, কুসঙ্গ দেখেও না দেখার ভান করে অন্যের উপর দোষ চাপিয়ে নিজের যন্ত্রণা হালকা করতে চান। কুসন্তান হলেও মা যে তার প্রতি বিমুখ হয় না– মধুসূদনের ব্যক্তিগত এ উপলব্ধির পরিচায়ক গৃহিণী চরিত্র। সন্তানের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষাই তাদের একমাত্র চাওয়া। মদ্যপ সন্তানের অসুস্থতায় স্বামীর নির্দেশে তাকে একা ফেলে গেলেও কমলা ও প্রসন্নকে নববাবুর সেবায় নিযুক্ত করে যান তিনি। তবে নববাবুর এ ধরনের জীবনযাপনে বিরক্তি প্রকাশ করে হরকামিনী। মধুসূদন অন্যান্য বাঙালি আটপৌরে নারীর মতো করে তাকে সর্বংসহারূপে গড়ে তোলেননি। সতীর মতো স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠও থাকেনি হরকামিনী। বরং 'আমার আর ওসব ভালো লাগে না'[৯] বলে উষ্মা প্রকাশ করে। স্বামীর বিরুদ্ধে দ্রোহের প্রকাশ ভারতীয় রীতির বিপরীত। অসহায়, নিপীড়িত ও প্রতিকারহীন বলে নারী সব মেনে নেয়। প্রচলিত এ কাঠামোর বিপরীতে হরকামিনীকে তৈরি করেছেন মাইকেল। 'মধুসূদন পাশ্চাত্য নারীর সংস্পর্শে এসে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের সঙ্গে সুপরিচিত হয়েছিলেন।'[১০] এর প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে হরকামিনী চরিত্রে। ঊনিশ শতকের অন্তঃপুরের নারীদের জীবনচিত্র বাংলার রঙ্গমঞ্চে তুলে ধরার মানসে মাইকেলের হাতে প্রহসন রচিত হয়েছে। 'একদিকে বৃদ্ধ পিতার...

মানসিক অবস্থা অন্য দিকে গৃহে দেহে উপবাসী যুবতী স্ত্রী।'[১১] কলকাতার শিক্ষিত বাঙালি ইয়ংবেঙ্গলের ঘরে ঘরে দগ্ধীভূত হরকামিনীর সন্ধান মেলে। এমন শত শত হরকামিনীর পক্ষ থেকে নববাবুর হরকামিনী প্রশ্নবিদ্ধ করে নিজের ভাগ্যকে :

> হায়, এই কল্‌কেতায় যে আজকাল কত অভাগা স্ত্রী আমার মতন এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করে তার সীমা নাই। হে বিধাতা! তুমি আমাদের উপর এত বাম হলে কেন?[১২]

হিন্দুধর্মে স্বামী দেবতা বলে অর্চিত। হরকামিনীর এই প্রশ্ন প্রমাণ করে যে, সে সীতা বা সতীর মতো স্বামীর সকল ইচ্ছাকে অবশ্য পালনীয় বলে মনে করতে পারেনি বরং প্রশ্নবিদ্ধ করে স্বামীকে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। বিধাতার বিধিলিপি তো মেনে নেয়ইনি, উপরন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার এ অপপ্রয়োগ নিয়েও হরকামিনী সন্দিহান :

> আজকাল কল্‌কেতায় যাঁরা লেখা পড়া শেখেন, তাঁরে মধ্যে অনেকেরই কেবল এই জ্ঞানটি ভাল জন্মে।... এমন স্বামী থাকলিই বা কি আর না থাকলিই বা কি। ... বেহায়ারা আবার বলে কি, যে আমরা সায়েবদের মতন সভ্য হয়েছি।... মদ্ মাস খ্যেয়ে ঢলাঢলি কল্লেই কি সভ্য হয়?– একেই কি বলে সভ্যতা?[১৩]

এ উক্তির মাধ্যমে তৎকালীন সমাজবাস্তবতার পরিচয় মেলে। ইয়ংবেঙ্গলসহ অন্যান্যদের সামাজিক সচেতনতার কারণে মধুসূদন আর সকলের প্রীতিভাজন থাকেন না। সামাজিক জীবনের বিশেষ প্রচলিত ত্রুটি নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করার ফলে প্রহসনকাররা জীবদ্দশায় সমাজবাসীর কাছে যে উপেক্ষার শিকার হন, তা মাইকেলের ভাগ্যেও জুটেছিল :

> ফরাসী নাট্যকার মলিয়েরের মত মধুসূদনের ভাগ্যেও এ প্রহসন রচনার উপযুক্ত পুরস্কার জোটেনি।... তাঁর একান্ত আগ্রহ ও চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও বেলগাছিয়া নাট্যশালায় তাঁর প্রহসন দু'খানা অভিনীত হ'তে পারেনি। কারণ সেকালের ইয়ং বেঙ্গলরা মধুসূদনের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন।[১৪]

তবে আমাদের ধারণা, ইয়ং বেঙ্গলদের রোষ মদ্যপানের প্রতি আসক্তি দেখানোর জন্য হলেও জনসাধারণের রোষের মূল কারণ উনিশ শতকের অন্তঃপুরকে সকলের সামনে উন্মুক্ত করায়। বাঙালি অন্তঃপুরের শিষ্টতা ও গোপনীয়তা রক্ষা করেননি মধুসূদন। যেখানে নারীদের এ অন্তর্যাতনা নারীরা নিজেরাও মেনে নিয়েছিল, সেখানে মধুসূদনের এ নিয়ে তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ মেনে নিতে পারেনি অনেকেই। তবে সরল হরকামিনীর খেদোক্তি ও দীর্ঘশ্বাস অনেককেই স্পর্শ করেছিল। *পরবর্তী সময়ে একেই কি বলে সভ্যতা?*-র অনুসরণে রচিত বেশ কিছু প্রহসনে এ উক্তির সত্যতা মেলে।

অন্তঃপুরের নারীদের প্রতি মধুসূদনের প্রগাঢ় মমত্ববোধের অকাট্য প্রমাণ এ প্রহসনটি। 'নবকুমারদের পরিবারের মেয়েদের যৌথজীবনের এক টুকরো এই প্রহসনে রূপ লাভ করেছে।'[১৫] স্বল্প অবকাশে বাঙালির অন্তঃপুরের চিরকালীন বৈশিষ্ট্যও তুলে ধরেছেন মধুসূদন। 'আশঙ্কাতুর অবুঝ মাতৃহৃদয়ের' সমান্তরালে কলিকালের মেয়েদের 'অলসতা, কর্তব্যবিমুখতা ও আদিরসাত্মক রসিকতা' উপস্থাপন করেছেন তিনি। নবকুমারের মায়ের চিন্তার পরিসীমা সন্তান ও সংসার। বাংলা মায়ের শাশ্বত প্রতিনিধি তিনি। সন্তানের মুখে পাওয়া বদগন্ধের প্রকৃত অর্থ তিনি বুঝতে পারেন না। বরং 'সোনার

চাঁদকে’ কেউ বিষ খাইয়ে দিয়েছে বলে সন্দেহ প্রকাশ করেন। এ কারণে তাকে উনিশ শতকের অন্তঃপুরের নারীর প্রতিনিধি না বলে চিরকালীন মাতৃত্বের প্রতিমূর্তি বললে ভুল হবে না।

এর বিপরীতে প্রহসনে তরুণী মেয়েদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়– যাদের ব্যক্তিমানুষ হিসেবে পৃথক সত্তায় নয় বরং সমষ্টি হিসেবে উপস্থাপন করেছেন মধুসূদন। এর মধ্যে হরকামিনী তার প্রতিবাদী সত্তার জন্য স্বতন্ত্রসত্তায় অস্তিত্ববান হয়ে ওঠে। বঞ্চিত নারীর শূন্যতা মূর্ত হয়ে উঠেছে তার সংলাপে। তাসখেলা, হাসি-কৌতুকে জীবন কাটানো এসব নারীর হৃদয়ের হাহাকারে আর্ত হয়ে উঠেছে প্রহসনটি। স্বামী পরিত্যক্ত প্রসন্ন নিরূপায় হয়ে পিত্রালয়ে বসবাস করে। তাস লুকানো, চাদর বিছানোর অজুহাত এবং মত্ত নবকুমারের অসংলগ্ন কথাবার্তার অর্থ বুঝেও সরলতার মাধ্যমে অন্য ইঙ্গিত করার মধ্যে প্রসন্নের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু শিক্ষার অভাব, ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিবন্ধনে আবদ্ধ প্রসন্নের দিন কাটে নিতান্তই এলেবেলে কাজ করে। সম্মানপ্রাপ্তি তো দূরের কথা, মানুষ হিসেবে আলাদা সত্তার অধিকারীও তাকে কেউ মনে করে না। উনিশ শতকীয় সামাজিক আখ্যানে সে একান্তই নিস্তরঙ্গ এক স্রোতপ্রবাহের মতো স্থির ও মনোযোগ আকর্ষণে ব্যর্থ। তুলনামূলকভাবে হরকামিনী অনেকটাই উজ্জ্বল। প্রহসনকার তাঁর দেখা পাশ্চাত্যের নারীদের কিছু বৈশিষ্ট্য তার উপর প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছেন। স্বামীর প্রতি আজ্ঞাবাহী থেকেও অন্তরের বিবমিষা সে প্রকাশ না করে পারে না। অন্তঃপুরের আরেক নারী ননদ প্রসন্নের কাছে তার মনের অপ্রসন্নতা ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ের কথা আর্ত হাহাকারের সাথে প্রকাশ করেছে সে। উনিশ শতকের অন্তঃপুরে থাকা হরকামিনীদের স্ফুলিঙ্গ একত্রিত হয়েই পর্দাপ্রথাসহ যাবতীয় কুসংস্কারের বেড়ি ভেঙে নারীরা তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও আত্মসম্মানবোধ নিয়ে বর্তমান পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে আছে। এ প্রহসনের আলোকে নারীমুক্তির শুভ উদ্বোধক বলে মধুসূদনকে তাই আমরা বাহবা দিতেই পারি। এক্ষেত্রে *বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ* এই প্রহসনের পুঁটি ও ফতেমা চরিত্রের কথা না বললেই নয়। পুঁটি ঠিক অন্তঃপুরের নারী নয়। সাত ঘাটে চরে খাওয়া পুঁটি আসলে জমিদারের দূতী বা কুটনি। টাকার বিনিময়ে নিত্যনতুন নারীকে সে ছলে-বলে-কৌশলে জমিদার ভক্তপ্রসাদের মনোরঞ্জনের জন্য যোগান দেয়।

ফতেমা হানিফ গাজীর স্ত্রী। ভক্তপ্রসাদের কুপ্রস্তাব ও টাকা পাওয়ামাত্র সে স্বামীর গোচরে আনে। স্বামীর পরামর্শে মধ্যরাতে পুঁটির সাথে ভাঙা মন্দিরে যেতে রাজি হয় সে। যদিও এ প্রস্তাব বাস্তবায়নে তার ভীতসন্ত্রস্ত মনের পরিচয় পাওয়া যায়। স্বামীর প্রতি সে বিশ্বস্ত, তবে কিছুটা ভীতিও কাজ করে। হানিফের মাত্রাতিরিক্ত রাগ এ ঘটনার অনুঘটক। মুসলমান সমাজ সম্পর্কে মাইকেল যে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল তা ফতেমা ও হানিফের সংলাপ ও আচরণে প্রকাশ পায়। বয়স ও সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ফতেমা চরিত্রের মধ্যে দ্রোহের স্ফুলিঙ্গ দেখা যায়। ভক্তপ্রসাদের অনৈতিক প্রস্তাব

ও আঁচল চেপে ধরা সত্ত্বেও তার বুদ্ধি লোপ পায়নি। নিম্নবিত্ত বা আতরাফ মুসলমান সমাজে মুর্খ নারী হিসেবে তার ব্যক্তিত্বের প্রতিবাদী সত্তা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এমনকি হিন্দুপ্রধান সমাজে ব্রাত্য মুসলমান নারী হিসেবে ভক্তপ্রসাদকে ব্যঙ্গ করে যে সংলাপ দিয়েছে তাতে করে তাকে তীক্ষ্নবুদ্ধিসম্পন্ন নারী বলেই প্রতিভাত হয়। পঞ্চানন বাচস্পতি ও হানিফের সামনে ধরা পড়ে বিব্রত ভক্তপ্রসাদ ফতেমাকে তার এ দুর্দশার জন্য দায়ী করলে ফতেমা তাকে বিদ্রূপ করে বলে, 'সে কি, কত্তাবাবু?– এই, মুই আপনার কল্‌জে হচ্ছেলাম, আরো কি কি হচ্ছেলাম; আবার এখন মোরে দূর কত্তি চাও।'[১৬]

ফতেমা চরিত্রটি মাইকেল মধুসূদন দত্তের সৃষ্টি-কুশলতার অনন্য নিদর্শন। জমিদারপুত্র হয়েও মুসলমান অন্তঃপুরের খোঁজ রাখা ও ফতেমার মতো প্রতিবাদী নারীচরিত্র নির্মাণ তাঁর সমসাময়িক সমাজ সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণাকে মূর্ত করে তোলে। গল্পের স্বল্প পরিসরে ফতেমা চরিত্রের বিনির্মাণেও তাঁর সযত্ন প্রয়াস সমালোচকের চোখে ধরা পড়ে :

> প্রথমে যে ছিল এক শান্তস্বভাবের ঘরোয়া গৃহবধূ, ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে ক্রমশ সে-ই ভক্তপ্রসাদের বিরুদ্ধে এক গভীর চক্রান্তে অংশগ্রহণ করেছে এবং সুচারুভাবে কার্যসিদ্ধির পর তারই কণ্ঠে ঝরে পড়েছে যেন ব্যঙ্গবিদ্রূপের বাঁধ-ভাঙা স্রোত।[১৭]

শর্মিষ্ঠা থেকে শুরু করে চিরাচরিত পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে নাটক ও কাব্য সৃষ্টির মুখরতায় একান্তই লঘু হাস্যরসাত্মক *একেই কি বলে সভ্যতা?* ও *বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ* প্রহসন দুটি রচনা করে মাইকেল স্বস্তি পেয়েছেন। পৌরাণিক চরিত্রের আভিজাত্য ও গাম্ভীর্য ভেঙে সমকালীন সমাজ বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে বিনির্মাণ করেছেন তিনি। নবনির্মিতির আনন্দ সেখানে থাকলেও মৌলিকত্বের জায়গায় কিছুটা অপূর্ণতা থেকেই যায়। এদিক থেকে প্রহসন দুটি তাঁর একান্ত নিজস্ব নির্মাণকলার অপূর্ব নিদর্শনরূপে বাংলা সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে। বিশেষত উনিশ শতকে বাঙালি অন্তঃপুরের নারীদের সম্পর্কে সম্যক ধারণা তৈরি হয় প্রহসনের নারী চরিত্রগুলোর মাধ্যমে। হিন্দু ও মুসলিম উভয় সমাজের অন্দরমহল সম্পর্কে সম্যক ধারণা মেলে প্রহসনের নারীদের কল্যাণে। ভারতীয় পুরাতন নারীর খোলস ভেঙে আনকোরা নতুন বিপ্লবে মোড়া পাশ্চাত্য নারীর ছায়া এ চরিত্রগুলোর দীপ্তি নিষ্প্রভ করতে পারেনি। কারণ পাশ্চাত্য প্রভাবিত মাইকেল-মানস প্রহসনের চরিত্র সৃষ্টিতে বাঙালি সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও পরম্পরা মেনে নিয়ে তাদের উনিশ শতকের সমান্তরালে প্রতিস্থাপন করেন। পাশ্চাত্যের নারীমুক্তি ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আলোকচ্ছটা তাতে নতুন মাত্রা যোগ করে। উনিশ শতকের ত্রিমুখী টানাপড়েনের প্রভাব চরিত্রগুলোর খোলস একেবারে ভেঙে না ফেলে বাতায়ন উন্মোচন করে। ফলে শিক্ষা ও সহানুভূতির অপ্রতুলতা সত্ত্বেও চরিত্রগুলো নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। সময়ের প্রবাহে তারা অজ্ঞাতেই দ্রোহের স্ফুলিঙ্গ মনের ভেতর জাগিয়ে রাখে। এ কারণেই চিরপুরাতন ও প্রচলিতের প্রতি প্রশ্ন, সমসাময়িকের প্রতি সন্দেহ ও অভ্যস্ত সখার প্রতি একান্ত আনুগত্যে চিড় ধরতে দেখা যায়। দীর্ঘদিনের

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও মাইকেল মধুসূদন দত্ত যেভাবে বাঙালি অন্তঃপুরের নারীদের উনিশ শতকীয় প্ল্যাটফর্মে তুলে ধরেন, তাতে করে তাঁর শিল্পীসত্তার নতুন এক দিক উন্মোচিত হয়। দ্রোহ ও আধুনিকতার উদ্‌গাতা মাইকেল অন্তঃপুরের নারীদের মানস উন্মোচনেও তাই প্রাতিস্বিক হয়েই আছেন।

তথ্যনির্দেশ

১. নীলিমা ইব্রাহিম, *উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী সমাজ ও বাংলা নাটক* (ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ, ১৯৬৪), পৃ. ৯

২. ক্ষেত্র গুপ্ত, *নাট্যকার মধুসূদন* (কলিকাতা : গ্রন্থ-নিলয়, ১৩৬৯), পৃ. ১

৩. নীলিমা ইব্রাহিম, *বাংলার কবি মধুসূদন* (ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, তা.বি.), পৃ. ১৩

৪. মাইকেল মধুসূদন দত্ত, *একেই কি বলে সভ্যতা? বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ*, ড. সুধীর মুখোপাধ্যায় (সম্পা.) (কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ২০০৭), পৃ. ২৬

৫. ক্ষেত্র গুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬

৬. তদেব, পৃ. ৩৪৫

৭. মাইকেল মধুসূদন দত্ত, 'একেই কি বলে সভ্যতা?', *মধুসূদন নাট্যসমগ্র, পত্রাবলী ও অন্যান্য*, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (সম্পা.), (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫), পৃ. ৯১

৮. নীলিমা ইব্রাহিম, *বাংলার কবি মধুসূদন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩

৯. মাইকেল মধুসূদন দত্ত, 'একেই কি বলে সভ্যতা?', *মধুসূদন নাট্যসমগ্র, পত্রাবলী ও অন্যান্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬

১০. নীলিমা ইব্রাহিম, *বাংলার কবি মধুসূদন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫

১১. তদেব, পৃ. ৩৫

১২. মাইকেল মধুসূদন দত্ত, 'একেই কি বলে সভ্যতা?', *মধুসূদন নাট্যসমগ্র, পত্রাবলী ও অন্যান্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮

১৩. তদেব, পৃ. ৯৯

১৪. নীলিমা ইব্রাহিম, *বাংলার কবি মধুসূদন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০

১৫. ক্ষেত্র গুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৮

১৬. মাইকেল মধুসূদন দত্ত, 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ', *মধুসূদন নাট্যসমগ্র, পত্রাবলী ও অন্যান্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৯

১৭. মাইকেল মধুসূদন দত্ত, *একেই কি বলে সভ্যতা? বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ*, ড. সুবীর মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৮

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের উপেক্ষিতাদের আবেগ : পরিপ্রেক্ষিত *ব্রজাঙ্গনা কাব্য* ও *বীরাঙ্গনা কাব্য*

গৌতম গোস্বামী*

সারসংক্ষেপ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) *ব্রজাঙ্গনাকাব্য* রচনা করেছিলেন ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে এবং *বীরাঙ্গনাকাব্য*১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে। দুটি কাব্যের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ আলাদা হলেও এগুলো রচনার প্রেরণা এসেছিল প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য থেকে। *ব্রজাঙ্গনা কাব্যের* প্রেরণা বৈষ্ণব পদাবলী ও বৈষ্ণবসাহিত্য এবং *বীরাঙ্গনাকাব্যের* প্রেরণা ভারতীয় মহাকাব্য। মধুসূদন তাঁর কাব্য দুটিতে উল্লিখিত সাহিত্যকর্ম থেকে কিছু চরিত্র চিহ্নিত করে নবরূপে নির্মাণ করেছেন। এই নির্মাণকার্যে বাংলার নবজাগরণের একটি সক্রিয় প্রভাব লক্ষ করা যায়। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও মহাকাব্যে যে চরিত্রগুলো– বিশেষত নারীরা পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র বা ব্যক্তি-সম্পর্কের যে ক্ষেত্রগুলোতে অবমূল্যায়িত হয়েছে; মধুসূদন তাদের আত্মা নির্মাণ করেছেন রেনেসাঁসের উদ্ভাসিত আলোয়। এই উপেক্ষিতারা কবি করস্পর্শে হয়ে উঠেছে আত্মসচেতন ও ব্যক্তি স্বকীয়তায় পরিপূর্ণ। কাব্যপাঠান্তে তাদের কাউকেই আর 'অন্তঃপুরের অবলা' বলে মনে হয়নি। আমাদের কাছে আবেগ প্রকাশে তারা সপ্রতিভ হয়ে উঠেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে সমাজ ও পারিপার্শ্বিকতার কাছে তারা মৌলিক জিজ্ঞাসা উপস্থাপন করেছে। বিষয়গুলো উক্ত সমাজে অপ্রচলিত বা অবাঞ্ছিত শোনালেও তা অযৌক্তিক ছিল না। সম্পূর্ণ বিষয়টি গভীর নিরীক্ষা করে এই প্রবন্ধে উদিষ্ট চরিত্রগুলোর মানসিক উৎকর্ষ ও ব্যক্তিবোধের স্বরূপ উন্মোচনপূর্বক তাদের আত্মজিজ্ঞাসার একটি যৌক্তিক ব্যাখ্যা প্রদান করার প্রচেষ্টা থাকবে।

১.১

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের মর্মমূলে প্রোথিত ছিল সনাতন ধর্মের আচরণীয় ও জীবনদর্শনের সাংগঠনিক প্রক্রিয়াসমূহ। এ ধরনের সাহিত্য যাঁরা রচনা করেছেন, তাঁরা ছিলেন সেসময়ের শিক্ষিত শ্রেণির শিরোমণি। পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্রে মানুষের মৌলিক কর্তব্যগুলো যেমন ঐ সময়ের সাহিত্যে আলোচিত হয়েছে; তেমনি ঈশ্বর-সম্পর্কিত আধ্যাত্মিক উপলব্ধিও জোরালোভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এ ধরনের টেক্সট বা রচনা সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল না। সমাজের বিশেষ স্থানের ব্যক্তিবর্গ এগুলোর চর্চা করতে পারতেন। রাজসভা বা বিদ্যোৎসাহী সমাগমে এই সাহিত্যগুলো প্রচার পেতো। দেবানুকূল্য বা ঐশীবাণী কখনও কখনও এমন সাহিত্য রচনার প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। প্রায় সব প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যই সংস্কৃত ভাষায় রচিত। দেবভাষার প্রচার

---

*গৌতম গোস্বামী : সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

যেহেতু সর্বকুলে ছিল না, তাই এগুলোর পাঠকও ছিল মুষ্টিমেয়। সময়ের প্রেক্ষিতে ধর্মীয় আবেগ ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সাহিত্য উচ্চশ্রেণির সমাজকে ছাপিয়ে সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হতে শুরু করে। ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি এই সাহিত্যগুলোর বাস্তবিক আকাঙ্ক্ষা সর্বসাধারণের সামনে উন্মোচিত হয়। পৌরাণিক চরিত্ররা হয়ে ওঠেন বাস্তবতার প্রতিবিম্ব। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই বাস্তবনিষ্ঠা মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের অংশ হয়ে ওঠে। সীতা ও রাধা হয়ে ওঠেন চিরায়ত ভারতীয় নারীর প্রতিমূর্তি। রাম, কৃষ্ণ বা পাণ্ডবরা এসে দাঁড়ায় মানুষের কাতারে ।

উনিশ শতকের প্রারম্ভ থেকে আমাদের সাহিত্যে ভাঙ্গাগড়ার কাজ শুরু হয়। পুরাণ ও ইতিহাস বিনির্মাণের সহায়তায় সাহিত্যে নতুন দিকের উন্মোচন হয়। পৌরাণিক চরিত্ররা হয়ে ওঠেন আমাদের ঘরের মানুষ এবং জায়গা করে নেন আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাপনে। মধ্যযুগের সাহিত্যে পৌরাণিক চরিত্র মানুষের কাতারে নেমে এলেও মানুষ হয়ে ওঠেনি। দেবত্বের কারণে তারা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মচর্চার কেন্দ্রে থেকে মানুষের কর্মকাণ্ডকে অবলোকন করেছেন। ব্যতিক্রম দেখা যায় *চণ্ডীমঙ্গল* ও *অন্নদামঙ্গল কাব্যে*– সেখানে দেবীরা লোকায়ত বিশ্বাসের বাতাবরণে মানুষের সাহচর্যে এসেছেন। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যেও এই প্রবেশাধিকার উন্মুক্ত ছিল। ব্যতিক্রম বৈষ্ণবসাহিত্য; পদাবলি ও ভাগবতে জীবাত্মা-পরমাত্মার ভক্তিভাবের বিন্যাসে মানুষের ঈশ্বর হয়ে ওঠা এবং ঈশ্বরের মানুষ ভজনার অনন্য নমুনা রয়েছে। চৈতন্যসাহিত্য বা গৌরাঙ্গ-বিষয়ক সাহিত্যে ব্যক্তি শ্রীচৈতন্য অবতার হয়ে ওঠেন ভক্তকল্পনা ও ভক্তিরসে। বৈষ্ণবদের ধর্মচর্চার প্রাণকেন্দ্র মহাপ্রভুর আরাধনা; তাঁকে কেন্দ্র করে লেখা ভজন-সঙ্গীত বৈষ্ণব সাহিত্যের অন্যতম অনুষঙ্গ। গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদগুলোতে চিরায়ত বৈষ্ণবভাবনার কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়। দেব মহিমাকে মানুষের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে চৈতন্যসাহিত্যেই প্রথম মনুষ্যরূপ দেবতার বিনির্মাণ হয়। উনিশ শতকে মধ্যযুগের সাহিত্যভাবনাকে অতিক্রম করে আধুনিক যুগের প্রারম্ভে বৈষ্ণব সাহিত্যের এই রূপান্তরশীল অভিঘাত নতুন সাহিত্য সৃষ্টিতে বড় অবদান রেখেছিল। মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪–১৮৭৩)-এর কবিমানসে এই পরিবর্তন নিশ্চিতভাবে প্রভাব ফেলেছিল। নিজেকে আধুনিক মানুষ বলেছেন মধুসূদন। কিন্তু এটাও সত্য যে, বহিরাঙ্গে তিনি যতটা ইউরোপীয় বা পশ্চিমা ধাঁচের, অন্তরঙ্গে ততটাই ভারতীয়। এই উভয় দর্শনকে ধারণ করেই তিনি হয়েছেন বাংলা সাহিত্যের তথা বাংলা কবিতার প্রথম আধুনিক কবি।

১.২

মধুসূদন *মেঘনাদবধ কাব্য* লেখেন ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে। এর পূর্বে *তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য* ১৮৬০ এবং পরে *বীরাঙ্গনা কাব্য* ১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দে। যে বছর তিনি *মেঘনাদবধকাব্য* লেখেন, সেই একই বছর লেখেন *ব্রজাঙ্গনা কাব্য*। ভেবে অবাক হতে হয়, একই বছরে দুটি কাব্য তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে সৃষ্টি করেন। তবে উভয়ের প্রেরণাই প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য; নির্দিষ্ট করে বললে বৈষ্ণব সাহিত্য ও ভারতীয় মহাকাব্য।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য রচনার মধ্য দিয়ে মধুসূদন ঐতিহ্যের অবয়বে নতুন পতাকা তুলে ধরেছিলেন। প্রাসঙ্গিকভাবে উদ্ধৃত করা যায় :

> ১৭৫২ সালে ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* রচিত হওয়ার একশো বছর পরে মাইকেলের *ক্যাপটিভ লেডি* এবং অসমাপ্ত নাট্য-কাব্য *রিজিয়া* প্রকাশিত হয়। অবশ্য তা দিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যের পাঠক-সমালোচকদের সন্তুষ্ট করতে পারেননি। ইতিমধ্যে ঈশ্বরগুপ্ত আর-এক দফা পা ফেলেছিলেন সামনের দিকে। তারপরে, ভারতচন্দ্রের ১০৮ বছর পরে ১৮৬০ সালে *তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য* হাতে বেনামিতে আবির্ভাব মাইকেল মধুসূদন দত্তের। প্রথমে বিব্রত হলেও সমালোচকরা পরে স্বীকার করলেন যে, এটা নতুন যুগের সূচনা।[১]

মধুসূদনের এই নতুন যুগ সম্পর্কিত দর্শনে বঙ্গীয় নবজাগরণ বা বাংলার রেনেসাঁস যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। মধুসূদন শুধু নিয়মভাঙা বা গণ্ডি পেরোনোকেই নতুন যুগের সূচনা বলে মনে করেননি; এক সর্বতো দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন সাহিত্যে তাঁর করণীয় কী হতে পারে। খ্রিষ্টান ধর্ম (১৮৪৩ খ্রি.) তিনি গ্রহণ করেছিলেন দ্বৈতমানসিকতা থেকে। কিন্তু এটি তাঁর মানস-গঠনের দৃষ্টান্ত নয়। *দি ক্যাপটিভ লেডি* (১৮৪৯ খ্রি.) প্রকাশের পর কবির কবিত্বকে সম্মান জানিয়ে বেথুন সাহেব অসাধারণ এক মন্তব্য করেছেন : 'কবি যদি ইংরেজির বদলে বাংলাভাষায় তাঁর সাহিত্য নির্মাণ করেন, তা হলে তা অনেক বেশি সফল ও সার্থক হবে। মধুসূদন অনুবাদের মাধ্যমেও বাংলা সাহিত্যের যোগ্য সেবা করে যেতে পারেন।'[২] বেথুন সাহেবের এ মন্তব্য নিশ্চয়ই শিরোধার্য করেছিলেন মধুসূদন। সে কারণেই 'বিবিধ রতন' ভাণ্ডারের বাংলাভাষাতেই তিনি সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস-ঐতিহ্য মধুসূদনকে আত্মবিশ্বাসী করেছিল; সঙ্গে ছিল যুগচেতনার প্রত্যয়। ঐতিহ্য ও পুরাণকে সঙ্গে করে যুগ-আবহে আরও এক চেতনা প্রবাহিত হচ্ছিল– স্বদেশচেতনা। ইংরেজি সাহিত্যের পঠন-পাঠন উন্মুক্ত হওয়ার পর আধুনিকতার প্রবাহ গতিশীল হয়। ইংরেজদের সংস্রব এক্ষেত্রে প্রভাবকের ভূমিকা পালন করেছে। নিজ যুগের চেয়ে ভাবনায় এগিয়ে ছিলেন মধুসূদন; সেকারণেই আধুনিকতার প্রবাহ তিনি অনেকের পূর্বেই অনুধাবন করেছেন। পরাধীন দেশের সামাজিক অবস্থা ও মানুষের মননকে উপলব্ধি করেই তিনি *মেঘনাদবধকাব্য* রচনা করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে বলা যায় :

> দেশ, ধর্ম এবং সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর সবচেয়ে স্পষ্ট বিদ্রোহ প্রকাশ পেয়েছে *মেঘনাদবধ কাব্য*-তে। সিপাহি বিদ্রোহ হয়েছিল এ কাব্য রচনার তিন বছরেরও আগে, ১৮৫৭ সালে। এই বিদ্রোহের সময় বাঙালি 'ভদ্রলোক' শ্রেণি কাকে সমর্থন জানাবে, তাই নিয়ে তাদের মধ্যে দ্বিধা ছিল। কিন্তু দেশে তখনও কোনও জাতীয়তাবাদ দানা বাঁধেনি। বর্তমান অর্থে স্বাধীনতা-চেতনার কোনও লক্ষণও দেখা দেয়নি। তা সত্ত্বেও রাম-রাবণের কাহিনিতে স্বদেশ চেতনার ছাপ পড়েছে কথাটা উড়িয়ে দেয়া যাবে না।[৩]

মেঘনাদবধকাব্য মধুসূদনকে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দেয়। সমকালের বাইরে এটিও উপলব্ধি করা যায় যে,'মধুসূদন মজ্জায় মজ্জায় কবি ছিলেন, সেই কবিস্বভাবকে তিনি গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে অনুশীলিত করেছিলেন। হয়তো বাংলা কবিতা লেখবার

প্রকল্প তাঁর আদৌ ছিল না– কিন্তু কবি হওয়াটা তাঁর অনিবার্য ছিল।'[৪] সে কারণে সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় বিচরণ করলেও মধুসূদন মূলত কবি। জাত মহাকাব্যের বাইরে গিয়ে বাংলাভাষায় তিনি প্রথম সাহিত্যিক মহাকাব্য রচনার অনবদ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। নিজ সময়ে তো বটেই, মধুসূদনের এই কাব্যক্ষমতা তাঁকে কালান্তরেও বড় কবির খ্যাতি প্রদান করেছে।

২.১

পূর্বেই উল্লেখ করেছি মধুসূদন একই বছরে *মেঘনাদবধকাব্য* ও *ব্রজাঙ্গনা কাব্য* রচনা করেন। *মেঘনাদবধকাব্যে*র প্রেরণা ছিল *রামায়ণ* এবং *ব্রজাঙ্গনা কাব্যে*র প্রেরণা বৈষ্ণব সাহিত্য। ব্রজাঙ্গনা অর্থ ব্রজের অঙ্গনা– বৈষ্ণব সাহিত্যে বৃন্দাবনকে ব্রজধাম উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ব্রজের নারীকে ব্রজাঙ্গনা বলাই সমীচীন; এবং এ কাব্যে সুনির্দিষ্ট করে রাধাকে ব্রজাঙ্গনা রূপে বোঝানো হয়েছে। ভারতীয় ঐতিহ্য ও সাহিত্যপাঠে মধুসূদন যে সিদ্ধহস্ত ছিলেন, এ কাব্য পাঠে তা উপলব্ধি করা যায়। মধ্যযুগের কবি তথা বৈষ্ণব কবিগণ শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেমকে উপলব্ধি করে বহুপদ রচনা করেছেন। তাঁদের কাব্যসৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন *ভানুসিংহের পদাবলী*। বর্তমানকালের রচনাতেও বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব প্রকট। মধুসূদনের আত্মভাষ্য থেকে জানা যায়, তিনি একাধিক সর্গে এই কাব্য রচনার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু আঠারোটি প্রস্তাবে মাত্র একটি সর্গই তিনি পূর্ণাঙ্গরূপে রচনা করতে পেরেছেন। সর্গটির নাম 'বিরহ'– তবে বিহার নামে দ্বিতীয় সর্গটিও তিনি শুরু করেছিলেন এবং কিছু পদও রচনা করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য থেকে জানা যায় :

> আপাততঃ এই গ্রন্থখানির 'বিরহ' বিষয়টি ১৮টি প্রস্তাবে প্রথমসর্গে প্রকাশিত হইল; যদি পাঠকবর্গের নিকটে কাঙ্গালিনী ব্রজাঙ্গনাকে সুমধুরভাষিণীরূপে সমাদৃত হইতে দেখা যায়, তাহা হইলে গ্রন্থকারের শ্রম সাফল্য এবং প্রকাশ ব্যয়ের সার্থকতা জ্ঞান করত সোৎসুক চিত্তে শ্রী নন্দের নন্দন শ্রীকৃষ্ণের সহিত বৃকভানু নন্দিনী শ্রীমতী রাধিকার সম্মিলন, সম্ভোগাদি বিষয় ক্রমশঃ সর্গান্তর হইতে সর্গান্তরে প্রকটন পূর্বক ব্রজাঙ্গনাকে সর্বাঙ্গ সৌষ্ঠবাণ্বিতা করিতা যত্নবান হইব ইতি।[৫]

সুকুমার সেনের ধারণা অনুযায়ী রাজনারায়ণ বসু ও অন্যান্য শুভাকাঙ্ক্ষীদের পৃষ্ঠপোষণের অভাবে শেষপর্যন্ত তিনি এ কাব্যের কাজ শেষ করতে পারেননি। বন্ধুদের প্রায় সকলেই তখন ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত ছিলেন। হিন্দু দেবদেবীদের নিয়ে মধ্যযুগীয় ভাবনার কাব্য হয়তো তাঁরা ভালোভাবে নেননি। কবি জয়দেব (১১৭৮-১২০৬) রাধাকৃষ্ণ লীলা নিয়ে প্রথম কাব্য রচনা করেন। মধুসূদন যে জয়দেবের কাব্যের একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যাবে 'জয়দেব' শিরোনামের সনেটে। তাই একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, এ কাব্য রচনার প্রেরণায় জয়দেবের একটি ভূমিকা ছিল। *গীতগোবিন্দ* কাব্যের গঠনের প্রতি খেয়াল রেখেই মধুসূদন *ব্রজাঙ্গনা কাব্য* রচনার পরিকল্পনা করেছিলেন। জয়দেবের কাব্যের প্রথম সর্গের বিষয়বস্তু ছিল বিরহচেতনা; তাই এ সর্গের নামও বিরহ। বৈষ্ণব সাহিত্য রচনার অন্যতম বিষয় রাধাবিরহ। মধুসূদনও বিরহকেই তাঁর কাব্য রচনার বিষয়বস্তু করেছিলেন। *ব্রজাঙ্গনা কাব্যের*

প্রচ্ছদপটে শ্রীকৃষ্ণসার্বভৌম রচিত 'পদাঙ্কদূতম' কাব্যের প্রথম শ্লোকের খানিকটা উল্লেখ করা আছে। কাজেই *ব্রজাঙ্গনা*-য় এ কাব্যের প্রভাব থাকাও অস্বাভাবিক নয়।[৬] এ কাব্যের প্রথম প্রস্তাব বংশী-ধ্বনি, যেখানে রাধার ভাষ্যে এসেছে :

যে যাহারে ভাল বাসে,
সে যাইবে তার পাশে–
মদন রাজার বিধি লঙ্ঘিব কেমনে?
যদি অবহেলা করি,
রুষিবে শম্বর-অরি;–
কে সম্বরে স্মর-শরে এ তিন ভুবনে![৭]

এই বংশী-ধ্বনি প্রকাশ বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন* কাব্যের বংশী খণ্ডের মতো নয়; যেখানে রাধার শরীর- মনকে আকুল করে কৃষ্ণের বাঁশীর সুর। এমনকি বাঁশীর শব্দে রাধার গৃহস্থালি কাজকর্মও ভণ্ডুল হয়ে যায়। রাধা সেখানে দাসী হয়ে শ্রীকৃষ্ণের পায়ে নিজেকে সমর্পণ করেছে। তবে মধুসূদনের রাধার মধ্যে বংশীধ্বনি শুনে দাসীভাব প্রকটিত হয়নি। বরং তিনি ভালোবেসে প্রেমাস্পদের পাশে চলতে চেয়েছেন। ভালোবাসাকে অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা তাঁর নেই। কৃষ্ণের ভালোবাসা দাসী হয়ে নয়, বরং সহচরী হয়ে লাভ করতে চেয়েছেন। এখানেই মধুসূদনের রাধা স্বাধীন ও আপন ব্যক্তিবোধে উদ্ভিন্ন হয়ে উঠেছেন। 'যমুনাতট' প্রস্তাবে রাধার কপালের সিঁদুরকে সধবা চিহ্ন হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তবে কবির মনোভাব এখানে ভিন্ন; এ চিহ্নকে তিনি বিষাদের প্রতিরূপে তুলে ধরেছেন। তার প্রতিক্রিয়ায় মনে হয়েছে এ চিহ্নটুকু তিনি ভীষণ বাধ্য হয়েই রাধার শরীরে রেখেছেন। 'পৃথিবী' প্রস্তাবে রাধা নিজেকে বলেছেন বিরহিনী। শ্যাম বিরহে তার হৃদয়-মন ভারাক্রান্ত। সেই বিরহকে তিনি গোপন করতে পারেননি।

২.২

বিবাহিত নারীর স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের প্রতি আকাঙ্ক্ষা নিন্দনীয়। সময়ের গতি নানা বাঁকবদল করলেও এ দৃষ্টিভঙ্গি অপরিবর্তনীয়। মধুসূদনের কালে এমন ঘটনাকে পাপ হিসেবেও প্রতিপন্ন করা হতো। তবে তাঁর রাধা এ সম্বোধনকে মেনে নেননি :

লোকে বলে রাধা কলঙ্কিনী
তুমি তারে ঘৃণা কেনে কর, সীমন্তিনি?
অনন্ত, জলধি নিধি–
এই দুই বরে তোমা দিয়াছেন বিধি,
তবু তুমি মধুবিলাসিনী![৮]

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের ঋতুবৈচিত্র্যে ভিন্নতা রয়েছে। কিন্তু বসন্তের কিছু চিরায়ত বৈশিষ্ট্য সবস্থানেই দেখা যায়। অন্যসব ঋতুর চেয়ে বসন্ত ঋতু ভিন্ন। রাধা মনে করেন এই পক্ষপাতিত্ব বসুমতি আগ্রহ নিয়েই করেন। তার জিজ্ঞাসা পৃথিবী যদি বসন্তকে ভালোবেসে পক্ষপাত দোষে দুষ্ট না হন, তবে শ্যামকে ভালোবেসে রাধা কেন কলঙ্কিনী হবেন? মধুসূদন রাধার এই চিত্তচাঞ্চল্য উপলব্ধি করেন। তবে তাঁর রাধা *গীতগোবিন্দ*

বা পদাবলীর মতো শুধু প্রেমের জোয়ারে ভেসে চলেন না। তার রয়েছে তীক্ষ্ণ বাস্তববোধ; খেয়াল করেন প্রকৃতি ও বাস্তব পরিবেশকে :

কেনে এত ফুল তুলিলি, স্বজনি–
ভরিয়া ডালা?
মেঘাবৃত হলে, পরে কি রজনী
তারার মালা?[৯]

যদিও 'রজনী' শব্দটি এখানে রাধার রূপকে ব্যবহৃত, তবুও মধুসূদন তা গ্রহণ করেছেন প্রাকৃতিক পরিবেশের আবহে। মেঘযুক্ত আকাশে তারাদের উৎস পাওয়া যায় না; বিষাদগ্রস্ত রাধাও শৃঙ্গার করে প্রিয় প্রতীক্ষায় দিন যাপন করেন না। রাধা এখানে মানুষ, তাই তার প্রকাশও মানবিক। সেকারণে কবি রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার আধ্যাত্মিক রূপক গ্রহণ না করে রাধাবিরহের মানবিক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছেন।[১০] এ বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটেছে আরও কিছু পদে। 'মলয় মারুত' প্রস্তাবে কবি লিখেছেন : 'স্মরি রাধিকার দুঃখ, হইও সুখে বিমুখ–/মহৎ যে পরদুঃখ দুঃখী সে সুজন!'[১১] পরের দুঃখে যারা নিজেদেরও দুঃখী ভাবে তারাই প্রকৃতার্থে বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষী। এটি বিরহকালীন রাধার ব্যক্তি-অনুভূতি, যা বাস্তব বুদ্ধিজাত। এরকম আরও কিছু উদাহরণ পরিদৃষ্ট হয়। 'গোধূলি' প্রস্তাবে লক্ষ করি :

হে মন্দ মলয় সমীরণ,
সৌরভ ব্যাপারী তুমি, ত্যজ আজি ব্রজভূমি–
অগ্নি যথা জ্বলে তথা কি করে চন্দন?[১২]

অথবা,

নিজে যে দুঃখিনী, পরদুঃখ বুঝে সেই রে
কহিনু তোমারে–
আজি ও পাখির মনঃ বুঝি আমি বিলক্ষণ–
আমিও বন্দী লো আজি ব্রজ-কারাগারে![১৩]

লক্ষ করা যায়, কালিদাসের (৩০০-৩৬৮) *মেঘদূত* কাব্যে বিরহী যক্ষ তার প্রিয়ার কাছে হৃদয়-বেদনার আর্তি নিয়ে সংবাদ প্রেরণ করেন এবং অনুরোধ করেন তা যথাযথভাবে পৌঁছে দিতে। মধুসূদনের কাব্যেও 'মলয় সমীরণ' (দক্ষিণী বায়ু) কৃষ্ণের কাছে বার্তা পৌঁছে দিতে প্রস্তুত হচ্ছে। কিন্তু সে বার্তা বিরহবার্তা নয়, বরং পুঞ্জীভূত ক্ষোভ রাধাচিত্তে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে সেটিই এখানে মুখ্য। তাইতো চন্দন-সুবাস দ্রোহের আগুনে পরিণত হয়েছে; একইভাবে উনিশ শতকে নারীর গৃহমধ্যে বন্দিত্বের বিষয়টিও স্পষ্ট হয়েছে। এই ব্রজ-কারাগার প্রকৃতার্থে সে সময়ের পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্রের বিধিনিষেধের কারাগার, যা নারীর স্বাধীনতা বিকাশে ক্রমাগত বাধা সৃষ্টি করেছে। বাস্তবিকভাবে মধুসূদনের এই রাধা উনিশ শতকের সেই বন্দিনীদেরই প্রতীকমাত্র। বৈষ্ণবসাহিত্যের আজন্ম দুঃখ লালিত প্রবঞ্চিত রাধা ইনি নন। এ রাধা অকপটে তার অবস্থানকে তুলে ধরতে পারেন। তার লোকভয় নেই; আছে কিছু সংশয় যাকে তিনি দৃষ্টান্তরূপে তুলে ধরেছেন– 'তাই কাহিনিগত মিল থাকলেও ভাবে বা ভাষায় *ব্রজাঙ্গনা*

কাব্য বৈষ্ণব কাব্যের লক্ষণাক্রান্ত নয়– রাধার বিরহ, আক্ষেপ, হতাশা ফুটিয়ে তুলে কবি রাধাকে মর্ত্যমানবীর রূপদান করেছেন।'[১৪] একটি বিষয়ে উভয় রাধার সত্তা একীভূত হয়েছে– তারা উভয়েই উপেক্ষিতা। উপেক্ষা তাদের উভয়েরই ললাট-লিখন। মধুসূদনের উপলব্ধিতে নারীর এই সার্বিক অবস্থা অধরা ছিল না। পদাবলীর রাধা যতই ভক্তিরসে উপস্থাপিত হোক না কেন মধুসূদন তাকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে ব্রজাঙ্গনাকে ব্রজের একজন গোপবধূ হিসেবেই দেখেছেন। যে কারণে রাধার মধ্য দিয়ে কবি পঞ্চদশ শতাব্দীর সমাজ-শাসনে বন্দিনী এক নারীর হৃদয়মথিত যন্ত্রণাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন।[১৫]

৩.১

রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) জন্মের একবছর পর মধুসূদন লিখলেন *বীরাঙ্গনা কাব্য*। অনুমান করা যায় এটিই বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম পত্রকাব্য। প্রাচ্যের মহাকাব্য ও পুরাণ থেকে এগারোজন নারী তাদের প্রেমিক বা স্বামীর কাছে চিঠি লিখেছেন। সেসব চিঠিতে রয়েছে ভিন্ন পরিস্থিতিতে এই নারীদের মানসিক অনুভূতি ও জিজ্ঞাসার কথা। কখনও তাতে উঠে এসেছে অভিযোগ, কখনও আশ্লেষ। পৌরাণিক চরিত্ররা সেখানে গ্রন্থগত নেই। তারা সজীব ও প্রাণবন্ত এবং রূপকাশ্রিত। এই রূপকের আবরণ সরে গেলে যে কঙ্কালটি বেরোবে সেখানে ফুটে উঠবে ঐ সময়ের সমাজে উপেক্ষিত নারীদের অন্তঃপুরের আত্মকথা। *বীরাঙ্গনা* একটি সমষ্টিক কাব্য। আবার এটিকে মধুসূদনের সীমাবদ্ধতা অতিক্রমের কাব্যও বলা যেতে পারে। সেকালের সমাজে নারীরা পুরুষের সামনে কোনো বির্তকে যেত না। *মেঘনাদবধ কাব্যে* প্রমীলা শেষতক সহমরণে গিয়েছিলেন, তবুও তার স্ফুলিঙ্গ উনিশ শতকের রেনেসাঁসের বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে আধুনিক ও বিদ্রোহীসত্তার প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা যায় :

> ভারতীয় পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত *শর্মিষ্ঠা* নাটকের নায়িকা শর্মিষ্ঠা ও প্রতিনায়িকা দেবযানীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কবি এতটা নিপুণভাবে এঁকেছেন যে কারণে পাঠকের মনে অনুরাগ ও সমবেদনাই জাগে। পদ্মাবতী চরিত্রের কোমলতা ও করুণা যেমন, *কৃষ্ণকুমারী* নাটকেও কুমারী কৃষ্ণার মনোহর চিত্রের বিপরীতে পিতার সামান্যতায় তার আত্মহত্যা সব কিছু মিলিয়ে এসব চরিত্রে শাশ্বত বাঙালি নারী যারা সহজে প্রতিবাদী হতে পারে না বা বিদ্রোহ করার ক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধ তাদের তুলনায় ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। কবির 'বীরাঙ্গনা' পত্রকাব্যও হচ্ছে তাঁর বিদ্রোহী অন্তরের ফসল।[১৬]

বঙ্গীয় রেনেসাঁসের প্রাথমিক পর্যায়েই নারী জাগরণ শুরু হয়েছিল। সতীদাহ প্রথা রদ (১৮২৯) ও বিধবা বিবাহ আইন (১৮৫৬) প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সামাজিকভাবে নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আসে। ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার *স্ত্রী শিক্ষাবিষয়ক* শিরোনামে নারীদের নিয়ে প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন। অবশ্য এর পূর্বেই খ্রিষ্টান মিশনারিরা স্ত্রী শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে ভারতবাসীকে তা বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ভিন্নধর্ম ও ভাষা সমস্যার কারণে তারা বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেননি। মধুসূদন-মানসে এই সামাজিক পরিবর্তন নিশ্চয়ই প্রভাব ফেলেছিল। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিজীবনের

দিকে তাকালে অবাক হতে হয়। ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারি মধুসূদন হেনরিয়েটাকে নিয়ে কলকাতায় চলে আসেন। স্ত্রী রেবেকা ও চার সন্তান তখন মাদ্রাজে। মধুসূদনের আত্মচিন্তা ও লেখালেখি থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, তিনি রেবেকাকে ভীষণ ভালোবাসতেন এবং তার বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারতেন না। অথচ কলকাতায় আসার দীর্ঘ আঠারো বছরে তিনি আর রেবেকাকে স্মরণ করেননি। এ নিয়ে বিস্ময় জাগে, প্রশ্নও তৈরি হয় :

> এই মানুষটি কেন দীর্ঘ ১৮ বছর কোনো কথা বললেন না? সত্যিই কি কোনো কথা বললেন না। না কি দেবযানীর কথায়, কিংবা *বীরাঙ্গনা কাব্য*-এর অঙ্গনাদের যন্ত্রণার ফোঁটা ফোঁটা চোখের জলে মিশে রইল রেবেকার মনের আগুন... চোখের জল... বিদ্রোহের ব্যথা এবং হেনরিয়েটার আশ্রয়ের আকুলতা।... মধুসূদন দত্তের *বীরাঙ্গনা কাব্য*-এর নারীদের বাসনা-আবেগ, কান্না-হাসি, অনুরাগ-বীতরাগ মিশে আছে নিজেরই জীবনানুভূতির মধ্যেই। অন্যভাবে বলা যায়, ব্যক্তি মধুসূদনের এই দ্বন্দ্ব যন্ত্রণা ও সফলতা যেন বহুধারায় ব্যাপ্ত হয়েছে তার সৃষ্টির মধ্য দিয়ে।[১৭]

*বীরাঙ্গনা*র নারীরা যেন মধুসূদনের বহুদিনের চেনা। তাঁরই দেখা প্রকৃতি ও পরিবেশে বড় হয়ে এরা নিজেদের সম্প্রসারিত করেছে। তারা কবির আত্মার আত্মীয়– যেন 'কর্ণে দোলায়, ঘ্রাণে সৌগন্ধ্য দেয়, বোধে আনে অনুরণন। এরা নিজের হয়ে ওঠে।'[১৮] নবচেতনায় নবভাবে মাতৃভাষার প্রতি অনুরক্ত হয়ে মধুসূদন পাশ্চাত্য শিল্পের নবনির্মাণ করেছেন *বীরাঙ্গনা কাব্যে*। একদিকে অসাধারণ দূরদৃষ্টি অন্যদিকে শিল্পের প্রতি অঙ্গীকার– বাংলা ভাষায় শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচনায় তাঁকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করে তোলে। ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে চতুর্দশপদী কবিতায় তিনি লিখেছিলেন 'মাতৃ-ভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে'– দেবাদিষ্ট সেই ধ্বনি যেন সঞ্জীবনীর মতো মধুসূদন চিত্তে এক সৃষ্টি-সম্ভাবনার ঢেউ তোলে। নবচেতনা তখন মননবিশ্ব থেকে সমাহিত কবির বাস্তব বয়ানে : 'এই 'যারে ফিরি ঘরে' প্রকৃতপক্ষে অতুলনীয় এক ধ্রুবপদ যা মধুসূদনকে সঞ্চালিত করেছিল *মেঘনাদবধ কাব্যে* ও *বীরাঙ্গনা কাব্যে*। বস্তুত এইটেই নবচেতনারও প্রধান গোত্রলক্ষণ।'[১৯]

৩.২

*বীরাঙ্গনা কাব্যে*র প্রথম পত্রটি লিখেছেন শকুন্তলা। এই চিঠির সঙ্গে তাঁর অসমাপ্ত অংশে লেখা অনিরুদ্ধের প্রতি ঊষা চিঠিটির ভাবগত মিল পাওয়া যায়; যদিও ঐ চিঠিটি পূর্ণাঙ্গ নয়। রাজা দুষ্মন্তের সঙ্গে শকুন্তলার গান্ধর্ব মতে পরিণয় ঘটে। কিন্তু পরবর্তীকালে রাজা প্রাসাদে ফিরে এসে শকুন্তলার কথা বিস্মৃত হয়েছিলেন। শকুন্তলার কণ্ঠে রাজার সেই মনোভাবের কথা স্পষ্ট ধরা পড়েছে :

> বন-নিবাসিনী দাসী নমে রাজপথে,
> রাজেন্দ্র! যদিও তুমি ভুলিয়াছ তারে,
> ভুলিতে তোমারে কভু পারে কি অভাগী?[২০]

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের (১৯০১-১৯৬০) সেই স্মরণীয় উচ্চারণ এ ক্ষেত্রে স্মৃতিতে আসে 'আমি ভুলিব না, আমি কভু ভুলিব না।' শকুন্তলাও ভোলেননি; কিন্তু তিনি উপলব্ধি করেছেন

রাজা তাকে ভুলে গেছেন। তিনি প্রশ্ন করেছেন, 'কে কবে, কি পাপে সহি হেন বিড়ম্বনা! / কি পাপে পীড়েন বিধি, শুধিব তা কারে?'[২১] তার এই জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে কিছু বিষয় আমাদের কাছে উপস্থাপিত হয়েছে– পরিবেশগতভাবে নারী জন্ম থেকেই একপ্রকার বঞ্চনার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে। সেটি বর্তমান প্রেক্ষাপটেও সত্য, তবে উনিশ শতকের ঐ সমাজে এই প্রবণতা ছিল প্রকট। বঞ্চিতারা মনে করতেন এটিই তাদের নিয়তি; সেকারণে এ নিয়ে কোনো প্রশ্নও তাদের মধ্যে তৈরি হতো না। কিন্তু মধুসূদন তাঁর চরিত্রগুলোর মানসপটকে পূর্বেই অধ্যয়ন করতে পেরেছেন এবং নিজেও সে সত্য উপলব্ধি করেছেন। শকুন্তলার মনের গভীরে উঁকি দিয়ে তিনিই প্রশ্ন করেছেন বঞ্চিতার পক্ষে।

দ্বিতীয় পত্রটিতে অবশ্য প্রশ্নের অবতারণা না হলেও উঠে এসেছে ভিন্ন বিষয়। পত্রটির শিরোনাম 'সোমের প্রতি তারা'– *ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ* ও *দেবীভাগবত পুরাণ* উভয়স্থানেই এই প্রসঙ্গটি আলোচিত। মধুসূদন ঐ কাহিনিকেই নতুন চিন্তায় উপস্থাপন করেছেন এ কাব্যে। প্রকাশের সময় থেকেই এ পত্রটিকে ঘিরে বিবিধ বিতর্ক সৃষ্টি হয়। কাহিনিটি মূলত এরকম– দেবগুরু বৃহস্পতির কাছে অধ্যয়নের জন্য আশ্রমে আসেন সোমদেব বা চন্দ্র। তারা ছিলেন গুরু বৃহস্পতির পত্নী। তিনি সোমদেবের রূপে মুগ্ধ হয়ে প্রবলভাবে আসক্ত হন। এই আসক্তি দৈহিক ও মানসিক। গুরুপত্নীর শিষ্যের প্রতি এ আসক্তি শাস্ত্রানুসারে মহাপাপ। প্রগতিশীল অনেকেই তখন এ বিষয়টি মেনে নিতে পারেননি :

> বাংলা ভাষার প্রথমদিকের সাহিত্যের ইতিহাসটি প্রায় দেড়শো বছর আগে লিখেছিলেন পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন।...ন্যায়রত্ন মশাই বিষম রেগে গেলেন চিঠিটি নিয়ে। যেখানে কিনা 'গুরুপত্নীগমন আমাদের শাস্ত্রানুসারে মহাপাতকের মধ্যে গণ্য', সেখানে মাইকেল এমন 'কামোন্মত্তা পাপীয়সীকে কোন মুখে বীরাঙ্গনা বলিয়া ডাকিলেন?' শুধু তাই নয়, কোন আক্কেলে তাঁকে 'পতিব্রতাপাতকী শকুন্তলা বা রুক্মিনীর সহিত একাসনে উপবেশন করাইলেন?– ছি ছি! লজ্জার কথা!'[২২]

প্রকৃতপক্ষে মধুসূদন এখানে পুরাণের ঘটনাটিকে একটু অন্যভাবে উপস্থাপন করেছেন। *ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে* চন্দ্র সিক্তবসনা তারাকে দেখে বলপূর্বক তাঁকে সম্ভোগ করেছিলেন। গুরুপত্নী অবশ্য তাতে অসম্মত ছিলেন। কিন্তু চন্দ্রকে অভিশাপ দিয়েও ক্ষান্ত করা যায়নি। শেষে দেবাসুরের যুদ্ধ উপনীত হলে ব্রহ্মার মধ্যস্থতায় বৃহস্পতি তার স্ত্রীকে ফিরে পান। পৌরাণিক এই ঘটনাটিকে একটু পরিবর্তন করেন মধুসূদন। অবশ্য *দেবীভাগবতে* এই একই আখ্যান উপস্থাপিত হয়েছে একটু অন্যভাবে যার সঙ্গে মধুসূদনের ভাবনার মিল পাওয়া যায়। চিঠির শুরুতে তারার সপ্রতিভ প্রকাশ আমাদের বিস্মিত করে :

> কি বলিয়া সম্বোধিবে, হে সুধাংশুনিধি,
> তোমারে অভাগী তারা? গুরুপত্নী আমি
> তোমার, পুরুষরত্ন; কিন্তু ভাগ্যদোষে,
> ইচ্ছা করে দাসী হয়ে সেবি পা দুখানি![২৩]

তৃতীয় পত্রটি উপস্থাপিত হয়েছে 'দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিনী' শিরোনামে। রুক্মিনীর বিয়ে স্থির হয়েছিল শিশুপালের সঙ্গে। কিন্তু তিনি ভালোবাসতেন শ্রীকৃষ্ণ তথা দ্বারকানাথকে। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শিশুপালের বিরোধের সূত্র আমরা পেয়েছি *মহাভারতে*। ইন্দ্রপ্রস্থ নগরপত্তনকালে যুধিষ্ঠির আর্য-ভারতের সকল রাজাদের সেখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও শিশুপালও সেখানে আমন্ত্রিত হন। সভায় শ্রীকৃষ্ণকে দেখে শিশুপাল উত্তেজিত হয়ে ওঠেন এবং তাকে ভর্ৎসনা করতে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন শিশুপালের একশ অপরাধ ক্ষমা করবেন তিনি। শিশুপাল সমস্ত অপরাধের সীমা অতিক্রম করলে শ্রীকৃষ্ণ তাকে হত্যা করেন। এই কৃষ্ণের প্রণয়িনীই ছিলেন রুক্মিণী। নিজেকে তিনি শ্রীকৃষ্ণের দাস বলেছেন। এই দাসত্ব শুধু প্রেমের নিগড়ে সৃষ্ট নয়; সমাজে নারীর অবস্থানকেও নির্দেশ করে– সঙ্গে রয়েছে প্রভু-ভৃত্যের মতো প্রচলিত একপ্রথা ও সংস্কার 'জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী।' রুক্মিনীর মধ্যেও অনুরূপ প্রবণতা লক্ষ করা যায় :

নারী দাসী, নারে উচ্চারিতে
নাম তাঁর, স্বামী তিনি; কিন্তু কহি, শুন,
পঞ্চ মুখে পঞ্চমুখ জপেন সতত
সে নাম,–জগত-কর্ণে সুধার লহরী![২৪]

শিশুপালকে যদি আমরা সমাজ-প্রতিকূলতা মনে করি তাহলে বুঝতে অসুবিধা হয় না এই প্রতিকূলতা থেকে মুক্তি চেয়েছিলেন রুক্মিণী। শত বছরের নিষেধের বেড়াজাল থেকে উতরে যাওয়ার জন্যই যেন রুক্মিণীর আহ্বান। আর কৃষ্ণরূপ সমাজ-প্রগতি সেখানে উদ্ধারকর্তা :

কালরূপে শিশুপাল আসিছে সত্বরে;
আইস তাহার অগ্রে। প্রবেশি এ দেশে,
হর মোরে! হর লয়ে দেহ তাঁর পদে,
হরিলা এ মনঃ যিনি নিশার স্বপনে![২৫]

৩.৩

চতুর্থ চিঠিটি কেকয়ী (কৈকেয়ী) লিখেছেন অযোধ্যা রাজ দশরথকে। চিঠিটি যে বাক্য দিয়ে শুরু হয়েছে সেটি প্রায় প্রবাদসম,'এ কি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে, রঘুরাজ*?*'[২৬] অপার বিস্ময় ও হতাশা নিয়ে এ চিঠির সূত্রপাত। বাল্মীকি *রামায়ণে* স্ত্রী কেকয়ীর সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে দশরথ তাকে দুটি বর দিতে চাইলেন। কেকয়ী রাজার এই উদারতায় আনন্দিত হয়ে বর দুটি পরে চেয়ে নেবেন বলে জানান। মোক্ষম সময়ে দাসী মন্থরার কু পরামর্শে তিনি ভরতকে রাজা ঘোষণা করার এবং রামকে বনবাসে পাঠানোর বর চেয়ে বসেন। এর ফলে ভরত রাজা হন এবং রাম বনবাসে পদার্পণ করেন। এই ঘটনাটি মেনে নিতে পারেননি দশরথ। তার মৃত্যু, রামের বনবাসে যাওয়া, সীতাহরণ ইত্যাদি সবকিছুই একে একে সংঘটিত হয়েছিল তারপরে। একটু লক্ষ করলেই উপলব্ধি হয় কেকয়ীর এই বর চাওয়া কাহিনি নির্মাণে কতখানি প্রভাব রেখেছে। বর প্রদানের পূর্বেই

কোনো এক সময়ে দশরথ কেকয়ীকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তার গর্ভজাত সন্তানকে রাজা ঘোষণা করবেন। কিন্তু তিনি সে বিষয়ে বিস্মৃত হলেন। এমনকি রামকে রাজা করার বিষয়ে কেকয়ীর সঙ্গে কোনো পরামর্শও করলেন না। দশরথের নির্দিষ্ট করে ভরতকে যুবরাজ করার প্রতিজ্ঞায় কেকয়ীর দাবিটি অন্যমাত্রা পেল। এই ইঙ্গিতটি মধুসূদন *রামায়ণের* ঘনিষ্ঠ পাঠে উদ্ধার করেছিলেন। রামের রাজ্যাভিষেকে যখন সমগ্র অযোধ্যা প্রস্তুত তখন কেকয়ীর এই ভূমিকা যেন বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো! রঘুবংশীরা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না। তাঁরা জীবন দিয়ে কথার মর্যাদা রাখে; কিন্তু সে বংশেরই প্রতিনিধি হয়ে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছেন দশরথ :

হা ধিক্! কি কবে দাসী– গুরুজন তুমি!
নতুবা কেকয়ী, দেব, মুক্তকণ্ঠে আজি
কহিত,–'অসত্য-বাদী রঘু-কুল-পতি!
নির্লজ্জ! প্রতিজ্ঞা তিনি ভাঙ্গেন সহজে!
ধর্ম-শব্দ মুখে,–গতি অধর্মের পথে!
অযথার্থ কথা যদি বাহিরায় মুখে
কেকয়ীর, মাথা তার কাট তুমি আসি,
নবরাজ; কিম্বা দিয়া চুন কালি গালে
খেদাও গহন বনে![২৭]

রামায়ণে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেও দশরথ কোনো প্রশ্নের মুখোমুখি হননি। কেকয়ী সেখানে খলনারী; কারণ নিজের ইচ্ছে পূরণ করতে গিয়ে তিনি *রামায়ণের* সহজ-সুন্দর গতিপথকে বিপর্যস্ত করে তুলেছেন। মধুসূদনের কেকয়ী দশরথের কাছে বর প্রার্থনা করেননি। তিনি শুধু দশরথকে তার অযোগ্যতা ও নীতিহীনতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। *রামায়ণে* কেকয়ীর এই ব্যক্তিত্ব ছিল না। মধুসূদন তাঁর কাব্যে সেটি সম্ভব করে দেখালেন। কেকয়ীর বক্তব্য সুধী সমাজে গ্রহণযোগ্যতা পেল– 'নবযুগের কবি, রেনেসাঁর কবি এখানে কেকয়ীকে নতুন ভাবনায়, নতুন রূপে সৃষ্টি করে *রামায়ণের* কাহিনির নবনির্মাণ করলেন।'[২৮] বৈদিক যুগ পরবর্তীকালে ভারতের পরিবার ব্যবস্থায় নারীরা স্বামীকে গুরুজন বলে মান্য করে। সময়ের পরিবর্তনে সে ধারণা কিছুটা বদলেছে। তবে উনিশ শতকের ভারতীয় সমাজে সেটি সম্ভব ছিল না। গৃহকাজের বিষয়ে স্বামীর সঙ্গে কিছুটা চিন্তাচর্চা চললেও প্রাতিষ্ঠানিক ও পারিবারিক বৃহৎ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে নারীরা কোনো উচ্চবাচ্য করতেন না। এমনকি সিদ্ধান্ত সমর্থন না করলেও তারা তা মান্য করতেন। তবে উনিশ শতকের কেকয়ীর ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম লক্ষ করা যাচ্ছে : 'স্বামীকে শ্রদ্ধা ও সমীহ করা মানেই যে তাঁর সব সিদ্ধান্তের কাছে অন্ধ আত্মসমর্পণ নয়, কেকয়ী তা আমাদের বোঝান। কিন্তু, স্বামীর আচরণে অপমানিত ও আহত হয়েও স্ত্রী যখন সমাজ নির্দিষ্ট সৌজন্যের সীমা লঙ্ঘন করেন না, তখনই তাতে যুগচিহ্ন বড্ড চড়াদাগে প্রকট হয়ে যায়।'[২৯] নারীর সামাজিক সীমা অতিক্রমের ক্ষেত্রে হয়তো মধুসূদনকেও একটা গণ্ডি মানতে হয়েছে। কেকয়ী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে

আওয়াজ তুলেছে এবং তাকে প্রশ্নও করেছে। কিন্তু সেখানেও অদৃশ্য একটা বেড়াজাল রয়েছে। তিনি উনিশ শতকের সমাজ প্রগতিকে ধারণ করেছেন *রামায়ণ* থেকে সরে এসে। তাতে ঐতিহ্যের কোনো অবনমন হয়নি। কিন্তু নারী হৃদয়ের অস্ফুট জিজ্ঞাসা কঠোর হয়ে সমাজমূলকে বিদ্ধ করেছে।

পঞ্চম চিঠিটি লক্ষ্মণকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন শূর্পণখা। চিঠিটির সঙ্গে মধুসূদনের অসমাপ্ত কবিতা অংশের 'যযাতির প্রতি শর্মিষ্ঠা'-র কিছুটা ভাবগত মিল পাওয়া যায়। বাল্মীকি *রামায়ণে* শূর্পণখা এক ভয়ালদর্শন রাক্ষসী ও রাবণ-ভগিনী। তিনি লক্ষ্মণের প্রতি অনুরক্ত হয়ে প্রত্যাখ্যাত হন। *বীরাঙ্গনা কাব্যের* শূর্পণখা কিন্তু বিকট রূপের আধারে গড়া নন। তিনি স্নিগ্ধ, আত্মবিশ্বাসী এবং লক্ষ্মণের প্রতি একান্ত অনুরক্ত। এই অনুরক্ততা প্রেম ও সৌন্দর্যের নিগড়ে গড়া। তিনি ধন-মন-যৌবনকে অর্পণ করে লক্ষ্মণের সহচরী হতে চেয়েছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শূর্পণখার কিছুটা দম্ভোক্তি প্রকাশ পেয়েছে। সেটি রাবণ-ভগিণী হওয়ার কারণে নয়; নিজের হৃদয়ের সপ্রতিভ ভাবপ্রকাশে স্বতঃস্ফূর্ত হওয়ার কারণেই। লক্ষ্মণকে তিনি প্রেমগুরু বলেছেন :

প্রেম-মন্ত্র দিও কর্ণ-মূলে;
গুরুর দক্ষিণা-রূপে প্রেম-গুরু-পদে
দিব এ যৌবন-ধন প্রেম-কুতূহলে!
প্রেমাধীনা নারীকুল ডরে কি হে দিতে
জলাঞ্জলি,মঞ্জুকেশি, কুল, মান, ধনে
প্রেমলাভ-লোভে কভু?[৩০]

প্রেমের এমন আরেকটি মনোহর প্রকাশ দেখা যায় ষষ্ঠপত্রে 'অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদীর' আত্মনিবেদনে। *মহাভারতের* অর্জুন মহাবীর– আর্যাবর্ত জুড়ে তার বীরত্বের খ্যাতি। দ্রৌপদী অর্জুনকে স্বামী হিসেবে বরণ করেছিলেন তার শৌর্য ও দক্ষতা দেখে। ভাগ্যচক্রে তিনি অর্জুনসহ আরও চার ভাইকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হন। কিন্তু তার মন অর্জুনের প্রতি সমর্পিত ছিল। বেদব্যাস কর্তব্য ও রাজনৈতিক সূচি নিশ্চিত করতে গিয়ে উপেক্ষা করে গেছেন দ্রৌপদীর হৃদয়বৃত্তিকে। মধুসূদন দ্রৌপদীর মনোভাবকে সমাজভাবনার প্রচ্ছন্ন পরিবেশ থেকে আলোর পথে নিয়ে এলেন :

পঞ্চালীর চির-বাঞ্ছা, পাঞ্চালীর পতি
ধনঞ্জয়! এই জানি, এই মানি মনে।
যা ইচ্ছা করুন ধর্ম, পাপ করি যদি
ভালবাসি নৃমণিরে,– যা ইচ্ছা, নৃমণি![৩১]

মধুসূদনের মেয়েরা কার্যতই সর্বকর্ম নিপুণা। তারা যেমন দ্রোহে তাপদায়ী সূর্যের মতো, তেমনি ভালোবাসায় শিশিরের মতো স্বচ্ছ। শূর্পণখা ও দ্রৌপদী আলাদা মহাকাব্যের ভিন্ন পরিস্থিতির দুই আলাদা চরিত্র; অথচ মনোবাঞ্ছা প্রকাশে তারা উভয়েই সরল ও সমচিন্তাকে ধারণ করেন। এই মেলবন্ধন শুধু হৃদয়বৃত্তিরই নয়, প্রাচ্য দুই মহাকাব্যের এক অদৃশ্য বাঁধনও বটে! এই পাঠ থেকে ভারতীয় পুরাণের প্রতি মধুসূদনের

অনুরক্ততার প্রমাণ পাওয়া যায়। একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন যে,'একজন অত্যন্ত ভালো খ্রিষ্টান যুবক হিসেবে আমি হিন্দুধর্মকে এক তিলও পরোয়া করি না। কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষের ঐশ্বর্যমণ্ডিত পুরাণগুলোকে আমি ভালোবাসি।'[৩২]

সপ্তম চিঠিটি লিখেছেন দুর্যোধনের স্ত্রী ভানুমতি। তার পত্রের বিষয়বস্তু স্বামী দুর্যোধনকে যুদ্ধ থেকে বিরত করা। ভানুমতি স্বামীর দোষ-অন্যায় নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন। চিঠির শেষে স্বামীর প্রাণসংশয় হেতু তাকে যুদ্ধবন্ধের আকুতি জানিয়েছেন। সন্ধি প্রস্তাবে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের জন্য পাঁচটি গ্রাম চেয়েছিলেন। দুর্যোধন সেটিও অমান্য করেন। এ অবস্থা পরিদৃষ্টে ভানুমতি প্রমাদ গুণলেন; কারণ অর্জুনের বীরত্ব সম্পর্কে তিনি অবগত :

শুন, নাথ; নিদ্রা-আশে মুদি যদি কভু
এ পোড়া নয়ন দুটি; দেখি মহাভয়ে
শ্বেত-অশ্ব কপিধ্বজ স্যন্দন সম্মুখে!
রথমধ্যে কালরূপী পার্থ! বাম করে
গাণ্ডীব– কোদণ্ডোত্তম।[৩৩]

পাণ্ডবদের সামগ্রিক বীরত্বের কথা স্মরণ করেই ভানুমতি স্বামীকে ফিরিয়ে আনতে উদ্যত হন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এ যুদ্ধে স্বামীর প্রাণসংশয় হতে পারে। একই ধরনের সংশয় ছিল দুঃশলার– তিনি অবশ্য একরকম নিশ্চিত ছিলেন জয়দ্রথের মৃত্যু নিয়ে। তবুও স্ত্রীধর্ম পালনের প্রবল আকুতি ছিল তার মধ্যে। জয়দ্রথ অন্যায় যুদ্ধে অভিমুন্যকে বধ করতে সাহায্য করেছে। এই হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য অর্জুন জয়দ্রথের প্রাণ নেয়ার প্রতিজ্ঞা করে। প্রতিজ্ঞার কথা জেনে দুঃশলা ভীত-উদ্‌বিঘ্ন হয়ে পড়ে। সে পুত্র ও স্বামীকে নিয়ে আপন রাজ্যে ফিরে যেতে চায়। অষ্টমপত্রে দুঃশলা তার ভাই দুর্যোধনের জন্মের সময় হওয়া নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অলৌকিক ঘটনার স্মরণ করে বলেন :

শুনিয়াছি আমি, যেদিন জন্মিলা
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, অমঙ্গল ঘটিল সেদিনে!
নাদিলে কাতরে শিবা; কুকুর কাঁদিল
কোলাহলে; শূন্যমার্গে গর্জিল ভীষণে
শকুনি গৃধিনীপাল! কহিলা জনকে
বিদুর,– সুমতি তাত! 'ত্যজ এ নন্দনে,
কুরুরাজ! কুরুবংশ-ধ্বংসরূপে আজি
অবতীর্ণ তব গৃহে!'[৩৪]

ধৃতরাষ্ট্র অবশ্য স্নেহান্ধ হয়ে পুত্রের প্রতি কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। তার ভয়ানক ফল হিসেবে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অতীতের ঐ ঘটনাকে স্মরণ করে দুঃশলা উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়েন। যুদ্ধ পরিত্যাগ করে স্বামীকে তার সঙ্গে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন :

ছদ্মবেশে রাজদ্বারে থাকিব দাঁড়ায়ে
নিশীথে; থাকিবে সঙ্গে নিপুণিকা সখী,
লয়ে কোলে মণিভদ্রে। এস ছদ্মবেশে,

না কয়ে কাহারে কিছু! অবিলম্বে যাব
এ পাপ নগর ত্যজি সিন্ধুরাজালয়ে![৩৫]

৩.৪

নবম পত্রটি জাহ্নবী লিখেছেন শান্তনুকে। অন্য পত্রগুলোর থেকে এটি একটু ভিন্ন। এটি আসলে প্রেমপত্র নয়; বরং একে প্রত্যাখ্যান পত্রই বলা যায়। 'পত্নীভাবে আর তুমি ভেবো না আমারে।'[৩৬] –এ উক্তির মধ্য দিয়ে স্বামীর প্রতি যেন তীক্ষ্ম প্রত্যাখ্যানের ইঙ্গিতই করেছেন জাহ্নবী। যৌথ জীবন নয়; বরং পুত্র দেবব্রতকে নিয়ে এক ভিন্ন জীবন কাটানোর পরামর্শও দিয়েছেন জাহ্নবী :

যাও ফিরি, নববর, আন গৃহে বরি
বরাঙ্গী রাজেন্দ্রবালে; কর রাজ্য সুখে!
পাল প্রজা; দম রিপু; দণ্ড পাপাচারে–
এই হে সুরাজনীতি;– বাড়াও সতত
সতের আদর সাধি সংক্রিয়া যতনে!
বরিও এ পুত্রবরে যুবরাজ-পদে
কালে।[৩৭]

'পুরুরবার প্রতি উর্বশী' *বীরাঙ্গনা কাব্যের* দশম পত্র। রাজা পুরুরবা ছিলেন চন্দ্রবংশের প্রথমরাজা। তিনি সূর্য ও ঊষার সঙ্গে যুক্ত এবং কিংবদন্তি অনুসারে বিশ্বজগতের মধ্যবর্তী স্থানে বসবাস করেন। *ঋগ্‌বেদ* অনুসারে তিনি ইলার পুত্র ছিলেন। *বিষ্ণুপুরাণ* অনুসারে তার পিতা ছিলেন বুধ এবং তিনি ছিলেন পুরুরবা গোত্রের পূর্বপুরুষ, যাদের উত্তরসূরী হলো *মহাভারতের* যাদব, কৌরব ও পাণ্ডবগণ। উর্বশী শাপগ্রস্ত হয়ে পৃথিবীতে এলে পুরুরবার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ও প্রণয় সংঘটিত হয়। এক পর্যায়ে উর্বশী শাপমুক্ত হয়ে স্বর্গে চলে যান। কিন্তু রাজা পুরুরবা তাকে ভুলতে পারেননি। মধুসূদন এখানে চরিত্রের বৈশিষ্ট্য খানিক বদলে দিয়েছেন এবং বারাঙ্গনা হওয়া সত্ত্বেও উর্বশীর প্রেমকে মর্যাদা দিয়েছেন। উর্বশী বলেছেন :

কঠোর তপস্যা নর করি যদি লভে
স্বর্গভোগ; সর্ব অগ্রে বাঞ্ছে যে ভুঞ্জিতে
যে স্থির-যৌবন-সুধা–অর্পিব তা পদে!
বিকাইব কায়মনঃ উভয়, নৃমণি,
আসি তুমি কেন দোঁহে প্রেমের বাজারে।[৩৮]

একাদশ ও শেষ পত্রটি এ কাব্যে সবচেয়ে ব্যতিক্রম। জৈমিনি *মহাভারত* ও কাশীদাসী উৎস থেকে আহৃত মহিষী জনা তাঁর স্বামী নীলধ্বজকে পত্রটি লিখেছেন। মাহেশ্বরী পুরীর যুবরাজ প্রবীর অশ্বমেধ–যজ্ঞাশ্ব ধরলে অর্জুন তাকে সম্মুখ যুদ্ধে আহ্বান জানান। প্রবীর বীরের মতো যুদ্ধ করে অর্জুনের শরাঘাতে নিহত হন। কিন্তু পুত্র প্রবীরের হত্যাকারীর সঙ্গেই সন্ধি স্থাপনে উদ্যোগী হন নীলধ্বজ। একজন প্রজা হিসেবে, একজন মা হিসেবে এই সিদ্ধান্ত মেনে নেননি জনা। অনেকটা কেকয়ীর মতো তিনি পিতা-স্বামী-রাজা নীলধ্বজের কাছে এর প্রতিকার জানতে চেয়েছেন। *মেঘনাদবধ কাব্যে* বীরবাহুর

মৃত্যুতে রাবণের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন চিত্রাঙ্গদা। তখন তিনিও রাজ্যের প্রজা হিসেবে, মা হিসেবে রাবণের সম্মুখে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। চিত্রাঙ্গদা উল্লেখ করেন একজন সাধারণ প্রজা হিসেবে তিনি তাঁর পুত্রসম ধন রাজার কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন। কিন্তু সে ধন রাবণ রক্ষা করতে পারেননি। চিত্রাঙ্গদা রাক্ষসরাজকে মনে করিয়ে দেন :

একটি রতন মোরে দিয়েছিল বিধি
কৃপাময়; দীন আমি থুয়েছিনু তারে
রক্ষাহেতু তব কাছে, রক্ষঃকুল–মণি,
তরুর কোটরে রাখে শাবকে যেমতি
পাখী। কহ, কোথা তুমি রেখেছ তাহারে,
লঙ্কানাথ? কোথা মম অমূল্য রতন?
দরিদ্র-ধন-রক্ষণ রাজধর্ম; তুমি
রাজকুলেশ্বর; কহ, কেমনে রেখেছ,
কাঙ্গালিনী আমি, রাজা, আমার সে ধনে?[৩৯]

প্রায় একই রকম পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে জনার ক্ষেত্রে। তিনি বিলাপ করে বলেছেন :

কেন বৃথা, পোড়া আঁখি, বরষিস আজি
বারিধারা? রে অবোধ, কে মুছিবে তোরে?
কেন বা জ্বলিস মনঃ? কে জুড়াবে আজি
বাক্য-সুধারসে তোরে? পাণ্ডবের শরে
খণ্ড শিরোমণি তোর; বিবরে লুকায়ে,
কাঁদি খেদে, মর্, অরে মণিহারা ফণি;–[৪০]

শোক পালনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি রাজার কর্তব্য নিয়েও প্রশ্ন উত্থাপন করেন। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম শত্রু বিনাশ করে রাজ্য ও রাজ্যবাসীকে নিরাপদ করা। রাজা নীলধ্বজ সে কাজে ব্যর্থ হয়েছেন বলে মনে করে জনা। সে কারণে পুত্রহন্তা হয়েছে রাজ অতিথি :

যে দারুণ বিধি, রাজা, আঁধারিলা আজি
রাজ্য, হরি পুত্রধনে, হরিলা কি তিনি
জ্ঞান তব? তা না হলে, কহ মোরে, কেন
এ পাষণ্ড পাণ্ডুরথী পার্থ তব পুরে
অতিথি?[৪১]

অর্জুনের অতীত জনার স্মরণে আছে। তিনি তার (অর্জুন) পূর্বপুরুষ ও পরিবারের রমণী মহলের চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলে জিজ্ঞাসা করেছেন– এমন পরিবারের সভ্যরা রাজ অতিথি হবার যোগ্য কি-না :

কুলটা যে নারী–
বেশ্যা–গর্ভে তার কি হে জনমিলা আসি
হৃষীকেশ? কোন্‌শাস্ত্রে, কোন্ বেদে লেখে–
কি পুরাণে– এ কাহিনী?[৪২]

অর্জুনের জন্ম ও কুন্তীর চরিত্র সম্পর্কিত এরকম প্রশ্ন বোধ হয় সমাজের অভিমূলে আঘাত করার মতোই। সনাতন হিন্দুধর্মের অনুসারীরা একালেও *মহাভারতকে* ধর্মগ্রন্থের মতো শ্রবণ ও শ্রদ্ধা করে। আর মধুসূদনের সময়ে তা ছিল পুণ্য অর্জনের অন্যতম মাধ্যম। *মহাভারতের* নায়ক অর্জুন– বাসুদেব কৃষ্ণ তার রথের সারথী; তার জন্ম নিয়ে এমন ভয়ঙ্কর মন্তব্য নিশ্চিতভাবেই ধর্মবেত্তাদের খুশি করেনি। এও এক পুরাণ ভেঙ্গে পুরাণ গড়া– মাতৃহৃদয়ের পুরাণ। পুত্রশোকে কাতর মা নিশ্চল শাসকরূপ বিবেকের কাছে এর চেয়ে প্রগাঢ়ভাবে আর কী প্রতিবিধান চাইতে পারে! মধুসূদন যেন এক ঢিলে দুই পাখী শিকার করলেন– একদিকে তিনি পুত্রশোকে চিরায়ত মাতৃহৃদয়ের ক্রোধ ও হতাশাকে উন্মোচন করলেন, অন্যদিকে অন্যায় সহ্যকারী অকার্যকর শাসকরূপ বিবেক মূর্তিকে উপস্থাপন করলেন। এতো সমাজকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে তার অসাড়তা প্রদর্শনেরই দৃষ্টান্ত। আরও বৃহত্তর পরিসরে যদি চিন্তা করি তবে সম্ভ্রম হারানো পরাধীন ভারতবাসী যেন শাসকরূপ অন্ধ বিবেকের কাছে তাদের হারানো ঐতিহ্যের কৈফিয়ত চাইছে। মধুসূদন এখানে পুরাণকে উতরে যান এবং প্রতিষ্ঠিত করেন অধিকার সচেতন ভারতবাসীর মনকে। নবযুগের নববোধ তাঁকে রাজনৈতিকভাবেও সচকিত করে তুলেছিল।

৪.১

মধুসূদনের সাহিত্যের মূল্যায়ন কালে কালে বিভিন্নভাবে হয়েছে এবং এ ধারা চলমান। মানুষ হিসেবে জীবন-নিরীক্ষায় বিশ্বাসী মধুসূদন নিজের জীবনের পাশাপাশি সাহিত্যকেও বৈচিত্র্যময় করেছিলেন। উনিশ শতকে বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ, বিশেষত হিন্দু সমাজ নতুন দর্শনে অভিষিক্ত হয়ে সমাজ পরিবর্তনের অঙ্গীকার করলে মধুসূদনের চিত্তে তা প্রকটভাবে প্রভাব ফেলেছিল। তিনিও ধর্মীয় অনুশাসনকে এই প্রগতির বিপরীত মুখ হিসেবে চিহ্নিত করলেন। তাঁর ক্ষেত্রে অনুঘটক ছিল নিজেরই পরিবার। উদার মনোভাবের এমন এক পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যাঁরা তাঁকে প্রগতিমুখী ও কুসংস্কারমুক্ত করে গড়ে তোলে। যদিও পরবর্তীকালে তাঁর খ্রিষ্টান হওয়ার বিষয়টি পরিবার মেনে নেয়নি। এ নিয়ে দুরকম মত পাওয়া যায় :

> ... তাঁর বাবা, যাঁর সঙ্গে তিনি এক গড়গড়ায় ধূমপানও করেছেন, তাঁর সঙ্গে তীব্র মনান্তর শুরু হলো মধুসূদনের বিয়েকে কেন্দ্র করে। বাবা-মায়ের স্থির করা জমিদার কন্যাকে কিছুতেই বিয়ে করতে তিনি রাজি নন। মধুসূদনের ভ্রাতুষ্পুত্রী মানকুমারী বসু লিখেছিলেন যে 'অশিক্ষিতা, হীনচেতা হিন্দু মহিলার পরিবর্তে শিক্ষিতা, স্বাধীন-বিহারিণী, উন্নতমনা খ্রীস্ট্রীয় মহিলার পাণিগ্রহণে বিশেষ ইচ্ছুক ছিলেন।[৪৩]

গোলাম মুরশিদ অবশ্য বিষয়টিকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে :

> ১৮৫৪ সালের জুন মাসে– তিনি মাদ্রাজের পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে দ্য অ্যাংলো-স্যাক্সন অ্যান্ড দ্য হিন্দু নামে একটি লিখিত বক্তৃতা করেছিলেন। পরে এই বক্তৃতাটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়। এতে তিনি দাবি করেছেন যে, প্রাচ্য সভ্যতার তুলনায় পাশ্চাত্য সভ্যতা অনেক উন্নত। ভারতবর্ষের তুলনায় ইউরোপ শ্রেষ্ঠ।... এরকম ঢালাও মূল্যায়ন ছাড়াও, খ্রিস্টধর্ম আর পাশ্চাত্য

> সভ্যতাকে তিনি অভিন্ন গণ্য করেন। আর, খ্রিস্টধর্মকে তিনি বিবেচনা করেন 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন' হিন্দুধর্মের থেকে শ্রেষ্ঠ বলে।[৪৪]

আবার অনেকে মনে করেন ইংরেজি ভাষার প্রতি প্রবল আকর্ষণ ও ইংরেজ কবিখ্যাতি পাওয়ার জন্যই মধুসূদন খ্রিষ্টান হয়েছিলেন। উল্লিখিত কারণগুলোর মধ্যে মানকুমারীর বক্তব্য অন্য কারণে বিশিষ্ট। ঐ বক্তব্যগর্ভে লুকিয়ে আছে নারীর প্রতি মধুসূদনের আলাদা এক দৃষ্টিভঙ্গি– তিনি চাইতেন সমাজের নারীরা শিক্ষিতা স্বাধীন ও উন্নতমনা হোক। এ কারণে তাঁর দাম্পত্যজীবন ঐরকম নারীদের সঙ্গেই কেটেছে। তাঁর কাব্যের নারীরা এই মানস-চৈতন্যের উত্তরাধিকার বহন করেছে। যে সমাজে মেয়েরা স্বেচ্ছাবন্দিত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হতো, সেই একই সমাজে মধুসূদনের বীরাঙ্গনারা শেকল ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছে। বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলা, আয়েশা, কুন্দনন্দিনী, ভ্রমর বা অনেক পরে রবীন্দ্রনাথের বিনোদিনীও যেখানে সমাজ-প্রভাব বর্জিত হয়ে স্বাধীন হতে পারেনি; সেখানে মধুসূদনের মেয়েরা 'বহিবার শক্তি'তে আপন পতাকা হাতে তুলে নিয়েছিলেন। এক তারা চরিত্র প্রতিষ্ঠা করেই তিনি বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। বিষয়টি যে তিনি অনুমান করেননি তা নয়। কিন্তু কী করতে চান সে বিষয়ে বোধকরি নিশ্চিত ছিলেন। গবেষকের দৃষ্টিতে, মধুসূদনের অসামান্য শক্তি এই যে, উনিশ শতকের পুরুষতন্ত্র-নিমজ্জিত সমাজে বসে তিনি এমন এক মেয়েকে নায়িকা করেছেন, 'বীরাঙ্গনা' আখ্যা দিয়েছেন, যে রীতি সর্বস্ব দাম্পত্যকে 'সাত জনমের সৌভাগ্য' বলে দেখতে রাজি নয়, নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে সে নিজের ভাগ্য জয় করতে চায়, নিজের জীবনে সার্থকতা চায়।[৪৫]

যে সমাজে সতীদাহ প্রথা রদ করতে গিয়ে রামমোহন (১৭৭২-১৮৩৩) বার বার আক্রান্ত হয়েছেন; বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) বিধবা বিবাহ প্রচলন করতে গিয়ে পদে পদে হয়েছেন লাঞ্ছিত, সেই ভূমিতে দাঁড়িয়ে মধুসূদন তাঁর তিনটি নাটকের নাম করলেন স্ত্রী চরিত্রের নাম অনুসারে; বিষয়টিকে তো প্রতিবাদই বলতে হয়। অনেকে তাঁর প্রথম দাম্পত্য সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন তোলেন; তাঁর দায়িত্ববোধ নিয়েও থেকে যায় কিছু প্রশ্ন। জীবনের প্রতি উদাসীনতা তাঁর ছিল; আর ছিল অপরিমিত ব্যয়ের অভ্যাস– তবুও 'মদ্যপ হলেও মদ্যপায়ীদের অনাচারের জোরালো বক্তব্যে প্রতিবাদ করেছেন। স্ত্রী ত্যাগ করে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করলেও, বেশ্যালয়ে রাত কাটাননি। পিতার ধর্ম ত্যাগ করে পিতার পয়সায় স্বেচ্ছাচার তাঁর রুচিবোধের বিরোধী ছিল...।[৪৬]

মধুসূদন তাঁর যুগের যুগচারী। বাংলা কবিতার আধুনিকতার সূত্রপাত তাঁর হাতেই। বিশ্বপরিব্যাপ্ত ছিল তাঁর কবিমানস। ইউরোপের আধুনিকতার দর্শন ও প্রাচ্য পুরাণের ঐতিহ্যকে মিশিয়ে তিনি এমন এক মানসলোক নির্মাণ করেছিলেন যাতে ঐতিহ্য ও আধুনিকতা আপন আপন মানদণ্ড নিয়ে স্বকীয়তায় ছিল উজ্জ্বল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে হয় মধুসূদন বাংলা কাব্য সাহিত্যে প্রথম দ্বার উন্মোচনকারী। আরও সুনির্দিষ্ট করে বললে :

> বিংশ শতাব্দীতে কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত মন্তব্য করেছিলেন যে, বিশ্বের আদিম উর্বরতা আর নেই। সারা বিশ্ব ভ্রমণ করে কবিতার বীজ সংগ্রহ না করলে কাব্যের কল্পতরু জন্মানোর সম্ভাবনা নেই। এই উপলব্ধি মাইকেলের হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতেই। তিনি কবিতার বীজ সংগ্রহ করেছিলেন পশ্চিমা বিশ্ব থেকে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়ে বাংলা কবিতার গতিপথ তিনি বদলে দিয়েছিলেন।[৪৭]

*বীরাঙ্গনা কাব্যে*র নারীরা শুধু পুরুষের ভোগ্যবস্তু নয়; তাদের ঐশ্বর্য পুরুষের সমকক্ষ। নিজের প্রেম, আকাঙ্ক্ষা, যৌনতা, বঞ্চনার কথা তারা সাবলীলভাবে উচ্চারণ করতে পারেন। তারা শুধু সন্তান উৎপাদনের কলে পরিণত হননি; 'পুরুষের দৈহিক শৌর্যবীর্যের ন্যায় নারী তেজস্বিনী রূপিণী, সন্তানহারা শোক সহ্যশক্তিধারিণী, ব্যক্তিত্ব সম্পন্না কোমল রুদ্ররূপী...।'[৪৮] বাল্যকালে মায়ের কষ্ট মধুসূদনকে নিশ্চয়ই বিচলিত করেছিল। তাঁর মানস গঠনে সেই অভিজ্ঞতা একটা প্রভাব রেখেছে। সংসারে নারীরা সবকিছু দিয়েও থেকে যান উপেক্ষিতা। তাদের আবেগের যথাযথ মূল্যায়ন হয় না। সংখ্যার দিক থেকে কমলেও সেই উপেক্ষা পুরোপুরি দূর হয়নি। একজন মানুষ হিসেবে মধুসূদন এই উপেক্ষিতাদের মানসকে গভীরভাবে অনুধাবন করেছেন। উনিশ শতকের সমাজ পরিবর্তনের স্রোতে তিনি নারীমুক্তির প্রস্তাবটি পরিপুষ্টভাবে তুলে ধরেছিলেন তাঁর লেখনিতে। মধুসূদনের এই দিকটি তাঁকে শুধু কবি হিসেবেই নয়, ব্যক্তিমানুষ হিসেবেও স্বতন্ত্র মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।

তথ্যনির্দেশ

১. গোলাম মুরশিদ, "মাইকেলের জন্ম ও পুনর্জন্ম", সুমন সেনগুপ্ত (সম্পাদিত), ৯১ বর্ষ, ৮ সংখ্যা, *দেশ*(শ্রী মধুসূদন), কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, পৃ.১৫ [এরপর থেকে প্রাবন্ধিক, প্রবন্ধ ও পত্রিকার নাম উল্লেখ করা হবে]

২. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, "মাইকেল মধুসূদন ও তাঁর কাল", *দেশ*, পূর্বোক্ত, পৃ.২১

৩. গোলাম মুরশিদ, "মাইকেলের জন্ম ও পুনর্জন্ম", *দেশ*, পূর্বোক্ত, পৃ.১৬

৪. অভ্র বসু, "কবির দেমাক ও এক দুর্মরতম কুসংস্কার", তাপস ভৌমিক (সম্পাদিত), বইমেলা সংখ্যা *কোরক সাহিত্য পত্রিকা* (দ্বিশতজন্মবর্ষে নানা মধুসূদন), জানুয়ারি-এপ্রিল ২০২৪, পৃ. ১৩ [এরপর থেকে প্রাবন্ধিক, প্রবন্ধ ও পত্রিকার নাম উল্লেখ করা হবে]

৫. বিকাশ পাল,"মধুসূদন দত্তের ব্রজাঙ্গনা পাঠ পরিক্রমা", বীজেশ সাহা (সম্পাদিত), বর্ষ ৯, সংখ্যা ৪-৫, *কৃত্তিবাস* (সাহিত্য সংখ্যা, দ্বিশতবর্ষে মাইকেল মধুসূদন), ১৬ জানুয়ারি-১লা ফেব্রুয়ারি (যুগ্ম সংখ্যা) ২০২৪, পৃ.৬৫ [এরপর থেকে প্রাবন্ধিক, প্রবন্ধ ও পত্রিকার নাম উল্লেখ করা হবে]

৬. তদেব, পৃ.৬৫-৬৬

৭. মাইকেল মধুসূদন দত্ত, *ব্রজাঙ্গনা কাব্য*, ক্ষেত্র গুপ্ত (সম্পাদিত), *মধুসূদন রচনাবলী*, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ২০০৪ [প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৫], পৃ. ১১৯ [এরপর থেকে কবি ও কাব্যগ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হবে]

৮. তদেব, পৃ. ১২৩

৯. তদেব, পৃ. ১২৪

১০. সঞ্জয়কুমার ঘোষ, "ব্রজাঙ্গনা কাব্য : মাইকেল মধুসূদনের এক অভিনব সৃজন", অভিজিৎ রায় (সম্পাদিত), ১৩০ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা* (মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিশেষ

সংখ্যা),কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৪৩০ (নভেম্বর ২০২৩), পৃ.২৩৬ [এরপর থেকে প্রাবন্ধিক, প্রবন্ধ ও পত্রিকার নাম উল্লেখ করা হবে]

১১. মাইকেল মধুসূদন দত্ত,*ব্রজাঙ্গনা কাব্য*, পূর্বোক্ত, পৃ.১২৬

১২. তদেব, পৃ. ১২৭

১৩. তদেব, পৃ. ১২৮

১৪. সঞ্জয়কুমার ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৬-২৩৭

১৫. দীপঙ্কর মল্লিক, "ব্রজাঙ্গনা কাব্য ও ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী : একটি তুলনামূলক পাঠ", *সাহিত্য- পরিষৎ-পত্রিকা* (মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিশেষ সংখ্যা), পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৬

১৬. শ্যামলেন্দু দাস, "মধুসূদনের সাহিত্যে নারী", কুমুদরঞ্জন মণ্ডল (সম্পাদিত), চতুর্দশ সংখ্যা, *উত্তরণের সন্ধানে* (মধুসূদন জন্ম দ্বিশতবর্ষ), কলকাতা, অক্টোবর ২০২৩, পৃ. ৯২[এরপর থেকে প্রাবন্ধিক, প্রবন্ধ ও পত্রিকার নাম উল্লেখ করা হবে]

১৭. মনোরঞ্জন সরদার,"উনিশ শতকের নারী, মধুসূদন ও তাঁর বীরাঙ্গনা কাব্য," *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা* (মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিশেষ সংখ্যা), পূর্বোক্ত, পৃ.৪০৫-৪০৬

১৮. শহীদ ইকবাল, "মধুসূদনের দু'শ বছরের জন্ম", অমলকুমার মণ্ডল (সম্পাদিত), *দ্বিশতজন্মবর্ষে মাইকেল মধুসূদন দত্ত*, এডুকেশন ফোরাম, কলকাতা, ২০২৩, পৃ. ২৩৯

১৯. তপোধীর ভট্টাচার্য,"কবি মধুসূদন : দ্বিশতবার্ষিক পুনঃপাঠ",*দ্বিশতজন্মবর্ষে মাইকেল মধুসূদন দত্ত*, পূর্বোক্ত, পৃ.২০০

২০. মাইকেল মধুসূদন দত্ত, *বীরাঙ্গনা কাব্য*, পূর্বোক্ত, পৃ.১৩৩

২১. তদেব, পৃ. ১৩৪

২২. অভিষেক ঘোষাল, "একটি কাব্য, একজন কবি ও উত্তরসাধনা,"*দেশ*, পূর্বোক্ত, পৃ.২৭

২৩. মাইকেল মধুসূদন দত্ত, *বীরাঙ্গনা কাব্য*, পূর্বোক্ত, পৃ.১৩৫

২৪. তদেব, পৃ. ১৩৭

২৫. তদেব, পৃ. ১৪০

২৬. তদেব

২৭. তদেব, পৃ. ১৪১

২৮. বেলা দাস, "উনিশ শতক, মধুসূদন এবং নারী",*সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা* (মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিশেষ সংখ্যা), পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৮

২৯. অভিষেক ঘোষাল, "প্রসঙ্গ বীরাঙ্গনা : মধুসূদন ও এক 'অনুসারী' কবি,"*কোরক সাহিত্য পত্রিকা* (দ্বিশতজন্মবর্ষে নানা মধুসূদন), পূর্বোক্ত, পৃ. ১০০

৩০. মাইকেল মধুসূদন দত্ত, *বীরাঙ্গনা কাব্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৩

৩১. তদেব, পৃ. ১৪৫

৩২. উদ্ধৃত, গোলাম মুরশিদ, "মাইকেল-মানসে ইউরোপ", *মাইকেলের দুশো বছর*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০২৪, পৃ. ১১৬

৩৩. মাইকেল মধুসূদন দত্ত, *বীরাঙ্গনা কাব্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৮

৩৪. তদেব, পৃ. ১৫১

৩৫. তদেব, পৃ. ১৫২

৩৬. তদেব, পৃ. ১৫৩

৩৭. তদেব

৩৮. তদেব, পৃ. ১৫৪

৩৯. মাইকেল মধুসূদন দত্ত, *মেঘনাদবধ কাব্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯-৪০
৪০. মাইকেল মধুসূদন দত্ত, *বীরাঙ্গনা কাব্য*,পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৭
৪১. তদেব, পৃ. ১৫৫
৪২. তদেব, পৃ. ১৫৬
৪৩. স্বাতী ভট্টাচার্য, "*বীরাঙ্গনা কাব্য* : একটি নারীবাদী পাঠ," *কোরক সাহিত্য পত্রিকা* (দ্বিশতজন্মবর্ষে নানা মধুসূদন), পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০
৪৪. গোলাম মুরশিদ, "মাইকেল-মানসে ইউরোপে", *মাইকেলের দুশো বছর*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৪-১১৫
৪৫. স্বাতী ভট্টাচার্য, "*বীরাঙ্গনা কাব্য* : একটি নারীবাদী পাঠ," *কোরক সাহিত্য পত্রিকা* (দ্বিশতজন্মবর্ষে নানা মধুসূদন), পূর্বোক্ত, পৃ. ৯১
৪৬. শম্পা ভট্টাচার্য, "মাইকেলের মেয়েরা", *কৃত্তিবাস* (সাহিত্য সংখ্যা, দ্বিশতবর্ষে মাইকেল মধুসূদন), পূর্বোক্ত, পৃ. ১০১
৪৭. রাজীব সরকার, "জন্মদ্বিশতবর্ষে মাইকেল : তাঁর বিদ্রোহের স্বরূপ", সুব্রত বড়ুয়া (সম্পাদিত), বিংশ বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা, *কালি ও কলম*, ঢাকা, মাঘ ১৪৩০ : জানুয়ারি ২০২৪, পৃ. ১২
৪৮. কাকলি মুখার্জী, "মাইকেল মধুসূদন দত্ত :*বীরাঙ্গনা কাব্য*", *উত্তরণের সন্ধানে* (মধুসূদন জন্ম দ্বিশতবর্ষ), পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫

মধুসূদন দত্ত ও তাঁর নাট্যসাহিত্যের সময়

শাকিলা আলম*

সারসংক্ষেপ

মধুসূদন দত্ত উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক সময়ে শিল্পী হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠায় ছিলেন বদ্ধপরিকর। আত্মপরিচয় ও আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জনের প্রত্যাশায় তিনি ছাত্রজীবন থেকেই সাহিত্যপাঠ ও সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। কিন্তু ঔপনিবেশিক প্রতিবেশ তাঁকে যে আত্মপরিচয়-প্রশ্নের সম্মুখীন করে তার প্রত্যুত্তর তিনি যশোর থেকে কলকাতায় স্থানান্তরের অভিজ্ঞতা থেকেই উপলব্ধি করেন। পাশ্চাত্যের জ্ঞান ও প্রাচ্যের সংস্কৃতির সম্মীলনে তিনি অর্জন করেন প্রচলিতকে না-মানার প্রবণতা। এই স্বকীয় রুচি তাঁকে কবি হিসেবে নতুন শিল্পনিরীক্ষণের দৃষ্টি প্রদান করে। শিল্প-নিরীক্ষণের সেই শৈলী তাঁর নাট্যসাহিত্যেও পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু, নাট্যসাহিত্যের শিল্পরীতিতে পুরাণ ও সমাজ মধুসূদন দত্তের সমসময়ের সাহিত্যকর্ম থেকে স্বতন্ত্র হয় কেন? সময়ের বোধ লেখকের মননে যে স্বাজাত্যবোধের জন্ম দেয় তার উৎসরূপ কেমন? এই নাট্যশৈলীর স্বরূপ কেমন এবং উৎসবিন্দু কোথায় তা অন্বেষণ করা এই প্রবন্ধের লক্ষ্য। উক্ত জিজ্ঞাসাসমূহের মীমাংসা তাঁর সৃষ্টিশীলতার সময়কে নির্দেশ করে। মধুসূদন দত্তের নাট্যসাহিত্য তাঁর সময়ের স্বভাবজাত, নাকি তাঁর স্বভাবই সময়ের পাঠ-বিনির্মাণ করে–এই স্বরূপ এষণাই এই প্রবন্ধের অভিলক্ষ্য।

ছাত্রজীবন থেকেই কবি হওয়ার বাসনা এবং প্রভূত সাহিত্যপাঠের অভিজ্ঞতাসহ বাংলা নাটকের উন্মেষপর্বেই পাওয়া যায় লেখক মধুসূদন দত্তকে (১৮২৪-১৮৭৩)। যাপিত জীবন ও সাহিত্যকর্মে প্রচলিত রীতির ব্যত্যয় তাঁকে স্বতন্ত্রভাবে বিম্বিত করে। তাঁর মনন গঠনের উনিশ শতকীয় প্রতিবেশ ঔপনিবেশিক শিক্ষানীতি দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ও পরিচালিত। এই প্রতিবেশ পরিবর্তনশীল অর্থনীতির অন্তর্গত কাঠামোতেই প্রভাব বিস্তার করে এবং তৎকালের একটি প্রজন্মকেই[১] পর্যবেক্ষণের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে সহায়তা করে। তথাপি মধুসূদন দত্ত ছিলেন স্বকীয়। বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন এবং *মেঘনাদবধ কাব্যে* (১৮৬১) পুরাণ-বিনির্মাণের পাশাপাশি বাংলা নাটকের স্বভাব নির্ণয়ে তাঁর শিল্পচিন্তা পরবর্তীকালের নাট্যরুচিকে পরিচালিত করে। তাঁর *মেঘনাদবধ কাব্যে* বিধৃত স্বকীয় শিল্পচিন্তার প্রাক্‌ভূমিতেও রয়েছে নাট্যচর্চাজাত সমাজ-সাংস্কৃতিক চিন্তার প্রস্তুতি।[২] কিন্তু শিল্পরীতির নবিশি পর্যায়ভুক্ত অর্থাৎ তথাকথিক দুর্বল শিল্পরীতির অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ায় মধুসূদন দত্তের নাট্যসাহিত্য তাঁর কাব্যসাহিত্যের তুলনায় অনাবিষ্কৃত। আবার, তাঁর শিল্পচর্চার ভিত্তিভূমি কাব্যচর্চার পাশাপাশি নাটকচর্চাতেও গ্রথিত রয়েছে। কিন্তু, এদিকটি রয়ে

---

*শাকিলা আলম : সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

গিয়েছে অনালোচনায় আবৃত।*মেঘনাদবধ কাব্যে* রচনার পূর্বে তিনি একাধিক নাটক রচনা করেন। সে সকল নাটকের বিষয়গত উপাদান সমাজ, পুরাণ ও ইতিহাস। কিন্তু এসকল বিষয় উপস্থাপনার দৃষ্টিকোণ, চরিত্রসৃজন, দ্বন্দ্ব নির্ণয় এককথায় শিল্পভাব ও শিল্পভাষ্যে প্রতিভাত হয় রুচির বিশিষ্টতা। এসকল নির্মিতির স্বরূপ ও সংশ্লেষণও মধুসূদন দত্তের শিল্পস্বভাবকে চিহ্নিত করে। অর্থাৎ, মধুসূদন দত্তের নাট্যসাহিত্য তাঁর শিল্পচিন্তার অন্যতম নির্ণায়ক।

অপরাপর শিল্পী ও শিল্পাঙ্গিকের মতো সময়ই মধুসূদন দত্তের শিল্পরীতি নির্ধারণ করে। এই 'সময়' বৃহদার্থে সমাজ, দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতির সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। বিপরীতক্রমে, শিল্পরীতি যুগসৃষ্টি করে না; বরং যুগমানস শিল্পরীতির সৃষ্টি করে। প্রকৃতপক্ষে, শিল্পরীতির সূত্রে বিগত সময়ের প্রকৃতি যেমন উন্মোচন ও উপলব্ধি করা যায়, একইসঙ্গে তা চিহ্নিত করে যুগমানসকে, তার গতিপ্রকৃতিকে। মধুসূদন দত্ত তাঁর বন্ধু গৌরদাসকে লিখিত পত্রে উল্লেখ করেন, 'You Know that the man's style is the reflection of his mind' (ক্ষেত্রগুপ্ত : ২০০৯ : ৫১৮)। অর্থাৎ মানুষের রুচিই তার মনের অভিপ্রকাশ। সমসূত্রে, শিল্পরীতিতে অভিপ্রকাশ ঘটে যুগমানসের। মধুসূদন দত্তের নাট্যসাহিত্যের উপাদানগত উৎস পুরাণ, ইতিহাস এবং সমাজ, যা ঐ সময়ের সাহিত্যকর্মে সাধারণভাবে চর্চিত হয়েছে। কিন্তু মধুসূদন দত্তের সাহিত্যকর্মের আকরণগত সমন্বয়সূত্র তাঁর বিশেষ ও নিরীক্ষাপ্রিয় শিল্পদৃষ্টি। লেখকের নাট্যসাহিত্যের আকরণ কীরূপ এবং এর মধ্যদিয়ে পুরাণ ও সমাজ কীভাবে সমন্বিত হয়েছে তা নির্ধারণ করে লেখকের সময়জাত মনন। লেখকের মনন-এষণার বিস্বপটে বিধৃত থাকে সময়ের প্রতিলিখন।

ঔপনিবেশিক পটপ্রেক্ষা : মধুসূদন দত্তের ঐতিহাসিক প্রজ্ঞা

মধুসূদন দত্তের মনন ঔপনিবেশিক সময়ে বিকাশ লাভ করেন। তৎকালে অর্থাৎ উনিশ শতকের বাঙালি সমাজে পেশাগত সফলতা অর্জন করতে ফারসি ভাষা আয়ত্ত করার বিশেষ গুরুত্ব ছিলো। মধুসূদন দত্তের পিতা রাজনারায়ণ দত্ত এই ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং পেশাগত সাফল্যও অর্জন করেন। আবার, ব্রিটিশ শাসনামল শিক্ষাক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করে। মধুসূদন দত্ত যশোরের গ্রাম্য পরিবেশে শিক্ষাজীবন শুরু করলেও তিনি ভাষাগত দক্ষতায় অগ্রসর ছিলেন তাঁর কায়স্থ পিতার সচেতনার কারণে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক ব্রাত্য বসুর (জ. ১৯৬৯) সুস্পষ্ট মন্তব্য হলো :

> রাজনারায়ণ দূরদর্শী ছিলেন। যশোরের সদর দেওয়ানি কোর্টে তিনি যখন ওকালতি করতেন, তখন আদালতের সওয়াল-জবাবের মূল ভাষা ছিল ফারসি। রাজনারায়ণ ইংরেজি জানতেন না, কিন্তু তিনি এত ভাল ফারসি জানতেন যে, তাঁকে যশোরে বলা হত মুনশি রাজনারায়ণ। মধুও তাঁর ছেলেবেলায় গ্রামের পাঠশালায় মৌলবির কাছে খুব ভাল করে ফারসি শিখেছিলেন। কিন্তু বাংলার শিক্ষিত সমাজে তখন ইংরেজি ভাষা শেখার চাহিদা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। রাজনারায়ণ যে তাঁর জীবিত একমাত্র ছেলেটিকে নিয়ে অত দূরে কলকাতা শহরে পাড়ি দিলেন, তার কারণ তিনি

> বুঝেছিলেন, ছেলেকে যদি পাকা উকিল বানাতে হয়, তা হলে শুধু ফারসি ভাষা দিয়ে চলবে না। সমাজে আসা নতুন ভাষা ইংরেজি ছেলেকে শেখাতেই হবে। ('হিঁদু বাবার কেরেস্তান ছেলে' : আনন্দবাজার : ২০২৩)

সুতরাং, পিতার পেশাগত কারণে এবং পুত্রের শিক্ষাগত কারণে কলকাতায় তাঁরা স্থানান্তরিত হন। কলকাতার স্কুলে ভর্তি হলে তাঁর ভাষাগত দক্ষতা তাঁকে শিক্ষার পরিবেশের সঙ্গে তাল মেলাতে সহায়তা করে। উচ্চারণে আঞ্চলিকতাথাকায় যদিও তিনি নতুন সাংস্কৃতিক পরিবেশে প্রথমেই প্রতিকূলতা পেয়েছেন, কিন্তু তা অতিক্রমও করেছেন স্বল্প সময়েই। পিতার অর্থগরিমা এক্ষেত্রে ছিলো তাঁর বস্তুগত হাতিয়ার। আর, মধুসূদন দত্তের মেধাগত হাতিয়ার ছিলো একান্নবর্তী পরিবার ও মায়ের কাছে শেখা সুহৃদ্যতা। তৎকালে নারীশিক্ষায় সমাজের প্রবল বিরুদ্ধতা থাকলেও মাতা জাহ্নবী দেবী ছিলেন সেকালের শিক্ষিত নারী। তাঁর কবিতা-পাঠ পুত্রকেও কবিতা ভালোবাসতে অনুপ্রাণিত করে। কলকাতার জীবন শুরু হওয়ার পরে ইংরেজির প্রবল দৌরাত্ম্য মধুসূদন দত্তকে আচ্ছন্ন করে ফেললেও শৈশবের কবিতাপাঠ তাঁকে তাঁর সাংস্কৃতিক শেকড়ের সঙ্গে আত্মিক সংযুক্তি বজায় রাখতে সাহায্য করে। আর, যৌবনের বিশ্বসাহিত্য-পাঠ তাঁকে কাব্যচর্চার প্রতি করেছে আনত। কিন্তু, নাট্যচর্চা এই সকল সীমানার অতিক্রান্ত যুগমানসের শিল্পসংবেদ। কারণ মধুসূদন দত্তের নাট্যচর্চার সূচনা কলকাতার সংস্কৃতিক প্রচর্চা দ্বারা অনুপ্রণিত ও প্রভাবিত হয়।

মধুসূদন দত্ত ১৮৩৭ সালে হিন্দু কলেজে ছাত্র হিসেবে যোগদান করেন। তৎকালে, হিন্দু কলেজে ঔপনিবেশিক কারণেই বাংলার তুলনায় ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য অত্যাধিক গুরুত্ব প্রাপ্ত হত। পরমেশ আচার্য (জ. ১৯৩৩) তাঁর 'বাঙালি ভদ্রলোকের শিক্ষাচিন্তা : উনিশ শতক' শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে হিন্দু কলেজের স্থাপয়িতা বাঙালি ভদ্রলোকেরা অ্যাংলোসিস্ট মতানুসারে দেশীয় শিক্ষিত শ্রেণি গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন। রক্তে, বর্ণে ভারতীয় কিন্তু রুচিতে, মননে ইংরেজ হবে; এমন শ্রেণি গড়ে তোলার শিক্ষানীতি জ্ঞাত থাকলেও তৎকালের আধুনিকতাপন্থী বাঙালি ভদ্রলোকেরা ইউটিলিটারিয়ান শাসকদের সমর্থক ছিলেন। ফলে, হিন্দু কলেজে ইংরেজি শিক্ষাই ছিলো মূল লক্ষ্য। এ প্রসঙ্গে গোলাম মুরশিদ (১৯৪০-২০২৪) উল্লেখ করেন :

> বাংলা পড়ানোর জন্য হিন্দু কলেজে ছিলেন একাধিক শিক্ষক–জুনিয়র বিভাগে রামতনু লাহিড়ী এবং সিনিয়র বিভাগে রামচন্দ্র মিত্র। কিন্তু বাংলা পড়ার দিকে ছাত্রদের বিশেষ নজর ছিলো না। (২০২০ : ৩৫)

হিন্দু কলেজের শিক্ষক রিচার্ডসনের (১৮০১-১৮৬৫) কাব্যচর্চা এবং স্নেহ; তার পাশাপাশি কলেজের পাঠ্য ইউরোপীয় ধ্রুপদী সাহিত্য এবং ইতিহাস শিক্ষা মধুসূদন দত্তকে প্রাথমিক পর্যায়ে ইংরেজি সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি প্রভূতভাবে আকর্ষণ করে। তথাপি কাব্য ও ইতিহাসচর্চার জ্ঞান তাঁকে স্বাদেশিকতার বোধ অর্জনে সহায়তা করে। এছাড়াও ইউরোপীয় সাহিত্যপাঠে তাঁর নারী ও নারীশিক্ষা বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি প্রগতিপন্থী হয়ে ওঠে। তিনি তাঁর ১৮৪২ সালে রচিত একটি প্রবন্ধে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন :

> Extensive dissemination of knowledge amongest women is the surest way that leads a nation to civilization and refinement, for it is woman first gives ideas to the future philosopher and the would-be poet. (ক্ষেত্রগুপ্ত ২০০৯ : ৫৯৫)

অর্থাৎ, একটি জাতির সভ্যতা এবং মার্জিত সংস্কৃতি অর্জন করার ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি নারীর জ্ঞান অনিবার্য। এই রচনায় আষ্টাদশ বছর বয়সী লেখক আরো উল্লেখ করেন যে, কবি এবং দার্শনিক হিসেবে একজন মানুষকে পরিপূর্ণরূপে গড়ে তুলতেও প্রয়োজন নারীর জ্ঞানার্জন এবং একজন পুরুষকেও উজ্জীবিত হতে একজন 'enlightened partner' প্রয়োজন। মধুসূদন দত্তের পূর্ববর্তী সমাজচিন্তক রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) নারী-সমাজের মঙ্গলচিন্তায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তিনি সতীদাহ 'প্রথা রদ' করতে এবং সমাজকাঠামোর মানবিক পরিবর্তনসাধনে সক্রিয় ছিলেন। তিনিও অ্যাংলোসিস্ট প্রক্রিয়ারই সমর্থক ছিলেন বলে মন্তব্য করেন সমালোচক পরমেশ আচার্য তাঁর প্রাগুক্ত প্রবন্ধে। কিন্তু রামমোহন রায় আপাতদৃষ্টিতে ইউটিলিটারিয়ান প্রশাসকের রুচি অনুসারে সমাজ সংস্কারে প্রচেষ্ট থাকলেও ব্রাহ্মসমাজে[৩]র প্রতিষ্ঠা করেন যা ভারতীয় সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য বিনির্মাণে তৎকালে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে। এর পরবর্তীকালে এবং মধুসূদন দত্তের সমসময়ে ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও (১৮২০-১৮৯১) সমাজকাঠমোর সংস্কার সাধনে 'বিধবাবিবাহ' প্রবর্তন এবং 'বাল্যবিবাহ' নিরোধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। সমসময়েই মধুসূদন দত্তও অনুভব করেন নারীশিক্ষার গুরুত্ব। পূর্বোক্তি প্রবন্ধে তারই যুক্তিনিষ্ঠ উপলব্ধি প্রকাশিত হয়। এছাড়াও, বিবেচ্য বিষয় এই যে, উক্ত রচনাটি লেখকের আঠারো বছর বয়সে প্রকাশিত হয়, যা তাঁর রুচির পাশাপাশি সমাজমানসের পরিচায়ক। তৎকালের সামাজিক প্রতিবেশে যেখানে নারীর জীবনধারণের অধিকারও পূর্ণরূপে স্বীকৃত নয়, এমন পরিসরে লেখকের নারীশিক্ষা বিষয়ক চিন্তা তাঁর মানসিক প্রাগ্রসরতার পরিচায়ক। একালেরই অব্যবহিত পূর্বে রামমোহন রায় 'সতীদাহ প্রথা' রদ করতে ক্রমাগত লিখেছেন এবং আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। আর, ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও নারীর জীবনকে মানবিক অধিকার প্রাপ্ত করে তুলতে সমাজের স্থবিরতার বিপরীতে প্রবল প্রতিবাদ নিয়ে লিখেছেন এবং সমাজে তার চর্চা-প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট থেকেছেন। উল্লেখ্য, 'ডেভিড হেয়ার স্কুল সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮১৮ সালে। ১৮১৭ সালে 'হিন্দু কলেজ' প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরে উক্ত স্কুল সোসাইটির প্রতিষ্ঠা তৎকালের কোম্পানি সরকারকেও নারীশিক্ষা বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে উৎসাহ যোগায়। কলকাতায় নারীশিক্ষা বিষয়ক তর্ক-বিতর্ক এসময়ে প্রবলভাবে সামাজিক-আলোড়ন সৃষ্টি করে। এরই ধারাবাহিকতায় জন এলিয়ট ড্রিংক ওয়াল্টার বিটন (১৮০১-১৮৫১) তাঁর প্রধান সহকারী ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগে একটি মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হন। এই স্কুলই পরে 'বেথুন কলেজ' নামে পরিচিতি পায়। ১৮৪৯ সালে এই কলেজের

প্রতিষ্ঠা শিক্ষাক্ষেত্রে অবশ্যই এবং নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী অধ্যায় সূচনা করে। একইসঙ্গে এটি ছিলো বাংলার সামাজিক ইতিহাসের একটি কাঠামোগত উত্তরণের অধ্যায়। এরই পরবর্তীকালে ১৮৫৬ সালে মদুসূদন দত্ত মাদ্রাজ থেকে ফিরে আসেন কলকাতায়। (গোলাম মুরশিদ ২০২০ : ১৬০)। আর তিনি ক্রমান্বয়ে উপলব্ধি করতে পারেন কলকাতার সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিবেশে রুচির পরিবর্তনের সংস্পর্শ। নারী অধিকারের পাশাপাশি ১৮৫৬ সালে সংঘটিত হয় 'সিপাহী বিদ্রোহ'। শাসিতের প্রতি শাসকের বৈষম্যমূলক ও অমানবিক রীতিনীতির আর শোষণের উদাহরণ এই বিদ্রোহ। কলকাতার বাঙালি সমাজে যার প্রত্যক্ষ সক্রিয়তার পরিচয় পাওয়া না গেলেও এর পরোক্ষ প্রভাবে ভারতীয় মানসে স্বাদেশিকতার বোধ উদ্বোধন লাভ করে। ১৮৫৯ সালে ঘটে 'নীল বিদ্রোহ'। এই বিদ্রোহ আবারও প্রমাণ করে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকের শোষণের তীব্রতা। ১৮৬০ সালেই এই বিদ্রোহকে অবলম্বন করে দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩) রচনা করেন নাটক *নীলদর্পণ*। সাম্প্রতিক ঘটনাকে আশ্রয় করে রচিত এর নাটক তৎকালে কলকাতার সমাজে ও রাজনীতিতে তোলে প্রবল আলোড়ন। মধুসূদন দত্ত এরূপ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যেই সাহিত্যচর্চার মূলপর্ব অর্থাৎ, তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সর্বাধিক সৃষ্টিশীল অধ্যায় যাপন করেন। এই অধ্যায়ের স্থায়িত্ব ১৮৫৮ সাল থেকে ১৮৬১ সাল পর্যন্ত। এর পরবর্তীকালেও তিনি সাহিত্য চর্চা করেছেন, কিন্তু উক্ত তিন বছর তাঁর জীবনের সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠার মূলপর্ব।উনিশ শতকের প্রারম্ভ পর্যায়ের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি ঐসময়ের স্বভাব বিনির্মাণ করে। ঐ সময়ের স্বভাবই আত্মসচেতনতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সর্বোপরি স্বাধিকার বোধে প্রত্যুজ্জ্বল। মধুসূদন দত্ত সময়ের সেই উজ্জ্বলতায় হয়েছেন উদ্বোধিত।

যদিও ঐসময়ে সাহিত্যে বাংলাভাষার প্রয়োগরীতি বিশেষত বাংলা-গদ্যের প্রয়োগ বিষয়ে তিনি সুনিশ্চিত ছিলেন না। কিন্তু, তৎকালে কলকাতায় বাংলা নাটকই পাশ্চাত্যের নাটকের কৌশলে মঞ্চায়নের উদাহরণ তাঁকে সাহিত্যচর্চার ভাষা ও মাধ্যম সম্পর্কে নতুনভাবে ভাবিত করে। রামনারায়ণ তর্করত্নের (১৮২২-১৮৮৬) নাটক *রত্নাবলী*র (১৮৫৮) অনুবাদকর্ম তাঁকে বাংলা ভাষাতে নাটক রচনার জন্য উদ্বোধিত করে। কলকাতায় বাঙালি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালায় নাট্যমঞ্চায়নের প্রচলন তেজস্বী করে তোলে বাংলা নাটকের ধারাকে। এর পূর্বে বাংলা নাটক বলতে কেবল যাত্রা বা পালাধর্মী উপস্থাপনাকেই উদাহরণ হিসেবে পাওয়া যায়। কিন্তু অনুবাদ নাটকের সূত্র ধরে নাট্যশালায় বাংলা ভাষায় নাটক উপস্থাপনা বাংলার সাংস্কৃতিকচর্চার ক্ষেত্রেও নতুন পর্ব সংযুক্ত করে। আর এই প্রাথমিক পর্যায়েই মধুসূদন দত্ত বাংলা নাটকের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। সময়ের স্বভাবে তিনি আত্মযোগ সাধন করতে হয়েছিলেন সক্ষম। কারণ তাঁর পূর্ববর্তী জীবনেই ছিলো তাঁর নিজস্ব সময়পাঠ। ছাত্রজীবনে যশোর শহর ছেড়ে কলকাতায় স্থানান্তর এবং হিন্দু কলেজে অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করেছিলেন তিনি। এটি

ছিলো তাঁর উপনিবেশিত হয়েও আত্মস্বীকৃতি এবং আত্মবিকাশ লাভের একটি পরোক্ষ প্রক্রিয়া। নতুন সাংস্কৃতিক প্রতিবেশে কৈশোরের উদ্ভিন্ন সময়ের এই সংশ্লেষে মধুসূদন দত্ত হয়ে ওঠেন রূপদিদৃক্ষু। ইউরোপীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিচিতি ও তাতে প্রবেশ অর্থাৎ উপলব্ধির পরিসীমায় আনয়ন সক্ষমতা তাঁকে করে তোলে আবেশিত। কিন্তু, কুলীন কূলোদ্ভূত এবং পিতৃসূত্রে তৎকালের আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে উচ্চবর্গীয় হয়েও কলকাতায় ব্রিটিশ শক্তির নিকটে বৈষম্যের স্বীকার হওয়া তাঁকে করে মর্মাহত।[৪] খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলেও, অবাঙালি স্ত্রীগ্রহণ করলেও সময়জাত মনন তাঁকে স্বাদেশিকতা ও আত্মপরিচয়ের বোধে রেখেছিলো জাগরুক। পাশাপাশি বাঙালি সমাজে রীতিনীতির আড়ম্বরতা অথচ যুক্তিনিষ্ঠায় পশ্চাৎবর্তিতা বিশেষত নারীর প্রতি সমাজের অবমূল্যায়ন তৎকালের সমাজমানসে মনস্তাত্ত্বিক শূন্যতা সৃষ্টি করে। নারী সমাজের অর্ধাংশ হওয়ার পরেও নারীর প্রতি অবমূল্যায়ন, বৈষম্য সমাজিক পশ্চাৎপদতা ছাড়াও নারী-পুরুষ উভয়ের হৃদয়ে হতাশার উদ্রেক করে, আর এখান থেকে জন্ম নেয় উক্ত শূন্যতা। কিন্তু নারীকে মানুষ হিসেবে অস্বীকার করে সমাজের মানুষের দ্বারা বিশেষত পুরুষ ও পুরুষশাসিত সমাজের দ্বারা আত্মিক-পূর্ণতা অর্জন সম্ভব নয়। এর উদাহরণ রয়েছে পুরাণে, মিথে এমনকি রাজতন্ত্রের ইতিহাসেও। নারীর প্রণয়কে বা নারীরত্নকে প্রাপ্ত করতে সর্বত্রই ঘটেছে সংঘাত। *রামায়ণ*, *মহাভারত*, *ইলিয়াড* প্রভৃতি ধ্রুপদী সাহিত্যে রয়েছে এই সংঘাতের স্বরূপ।নারীকে কেন্দ্র করে সংঘাত সৃষ্টির এই প্রক্রিয়াকেই সেলিম আল দীন (১৯৪৯-২০০৮) চিহ্নিত করেন 'ধ্রুপদী-প্রক্রিয়া'হিসেবে। মধুসূদন দত্তের *কৃষ্ণকুমারী* (১৮৬১) নাটকের ট্রাজিক ধরন প্রসঙ্গে আলোচনার্থে তিনি উল্লেখ করেন :

> মধুসূদন একে রোমান্টিক ট্রাজেডি বলেছেন। তবু আমি এ থিমকে ধ্রুপদী বলতে চাই এই জন্য যে–এতে *রামায়ণ* ও *ইলিয়াডে* সীতা কিংবা হেলেনের রূপ যেমন যুদ্ধ ও ভাঙনকে অনিবার্য করে তুলেছিল–তার গন্ধ আছে। চরিত্রগতভাবে কৃষ্ণাকে কেন্দ্র করে যে রাষ্ট্রসংঘাত উন্মুখ হয়ে উঠে তা নিশ্চিতই ধ্রুপদী বিষয়। (২০১১ তৃতীয় খণ্ড : ৪৫৫)

অর্থাৎ, নারীকে কেন্দ্র করে সংঘাতের সৃষ্ট করা সেলিম আল দীনের মতে শিল্পের একটি ধ্রুপদী রীতি। কিন্তু, উনিশ শতকের প্রারম্ভের বাঙালি সমাজে নারীর যে প্রবল অবমূল্যায়ন সেস্থলে নারীকে একটি স্বাতন্ত্র্য বা স্বরসহকারে (অভিমত) উপস্থাপন করার সাহিত্যিক প্রয়াশই সময়ের দায়ের স্বাক্ষর। নারীর স্বতন্ত্র স্বরের উপস্থাপনা পাওয়া যায় দীনবন্ধু মিত্রের (১৮৩০-১৮৭৩) *নীল-দর্পন* (১৮৬০) নাটকেও। এ নাটকের নারীরা সমাজের সাধারণ মানুষ, অধিকাংশই আবার প্রান্তিক বর্গের। অপরদিকে, মধুসূদন দত্তের নাটকের অভিলক্ষ্যে থাকা নারীচরিত্ররা উচ্চবর্গীয়। পাশাপাশি উপস্থিত হয়েছে নিম্নবর্গীয় নারীচরিত্র ও অপরাপর নিম্নবর্গীয় চরিত্র। প্রহসন *একেই কি বলে সভ্যতা?* (১৮৬০), *বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁর* (১৮৬০) প্রেক্ষাপট কলকাতার উনিশ শতকীয় বাঙালি সমাজ। প্রহসন দুটির চরিত্ররা কলকাতার বাঙালি সমাজজাত। উচ্চবর্গের মধ্যে প্রান্তিক বা পুরুষের Subordinateহলো নারী, আবার নিম্নবর্গের নারী-পুরুষ উভয়ই

উচ্চবর্গের Subordinate. (এই চরিত্রগুলোতে ভাষাগত সাবলীলতা রয়েছে কারণ নাটকের প্রয়োজনেসংলাপে ব্যবহৃত হয়েছে কথ্যরীতি)। বাকি নাটক চারটির প্রেক্ষাপট পৌরাণিক ও রাজবর্গীয়। ফলে এই নাটকসমূহের Subordinate চরিত্রগুলো নিম্নবর্গের হলেও তারা কলকাতার নিম্নবর্গীয়দের সমবর্তী নয়। কিন্তু, এসকল চরিত্র সৃষ্টিতেও মধুসূদন দত্তের সমাজমানসের সৃষ্টিবাসনাই প্রতিফলিত হয়। নারীর উপস্থাপনাই অর্থাৎ, স্বরসহকারে নারীচরিত্রের স্বতন্ত্র মনোরূপনির্মাণ করার সচেতনতা ঐ সময়ের স্বভাবের শব্দধ্বনি। নারীর সামাজমানস পরিস্থিতি ও এর নিরসনে করণীয় সম্পর্কে রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২) তাঁর রচিত প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন বিশ শতকের প্রারম্ভে। আর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪-১৮৯৪) তাঁর *সাম্য*শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন ১৮৭৯ সালে। উনিশ শতকের প্রারম্ভ পর্যায়ের সাংস্কৃতিক মানস পরিবর্তনের ধারাই এই চিন্তকদ্বয়ের লেখনীতে স্পষ্টতা ও তীব্রতা লাভ করেছে। যার প্রাক্ভূমিতে রয়েছে প্রাগুক্ত সমাজসংস্কারকবর্গের বুদ্ধিবৃত্তিক বীজ পাশাপাশি সাহিত্যশিল্পী মধুসূদন দত্তের নন্দন-চিন্তা।

সুতরাং, মধুসূদন দত্তের দৃষ্টিভঙ্গি এবং রুচি ইউরোপীয় আধুনিক, কিন্তু ঐ উন্নত সভ্যতার সংস্পর্শজাত জ্ঞান তাঁর মননে স্বাদেশিকতাবোধেরও উন্মেষ ঘটায়। মধুসূদন দত্তের নাটকের শিল্পরীতির সময়োপযোগিতাই স্বীকৃত হয় সেলিম আল দীনের আলোচনায়। তিনি তাঁর 'মহাকবির নাট্য রচনা বিষয়ে' শীর্ষক রচনায় উল্লেখ করেন যে, 'মধুসূদনের নাট্যভাবনা–কালের সঙ্গে যুঝতে চেয়েছিল। মহাকবির কাম্য অমরতার বদলে *কৃষ্ণকুমারী*তে তিনি যেন সমকালের নাট্যদাবিকে বড় করে দেখেছেন।' (২০১১ তৃতীয় খণ্ড : ৪৫২)। মধুসূদন দত্ত তাঁর সাহিত্যকর্মে ভারতীয় পুরাণের কাছে অকপটভাবে ঋণী।পুরাণ ও প্রাগ্রসর সমাজমানসের যৌথতায় নারীর স্বর সৃষ্টিতে এবং বিশেষত প্রান্তিক পর্যায়বর্তী চরিত্রের স্বর সৃষ্টিতে তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রাতিস্বিক জ্ঞানপ্রকল্প স্রষ্টা।

শিল্পবৈচিত্র্যের সাধনা : সময়ের দায়

মধুসূদন দত্তের কবিতাশিল্পে যতি স্থাপনের বৈচিত্র্যই বাংলা ছন্দের চৈতন্যমুক্তির স্বরূপ। বাংলা ছন্দ বস্তুসদৃশ ভাবগহ্বরের শৃঙ্খল থেকে অবমুক্ত হয়ে উন্নীত হয় চেতনদীপের অবারিত প্রবাহে। এর মাধ্যমেই আসে বাংলা ছন্দে ভাব ও ধ্বনির প্রবহমানতা এবং অন্তহীন সম্ভাবনার অমোঘ প্রাকৃতিকতা। যতি স্থাপনের ন্যায় শিল্পে নিরীক্ষাপ্রিয়তা এবং বৈচিত্র্য সৃষ্টির মানস তাঁর নাটকের চরিত্রসৃষ্টির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে নাট্যদ্বন্দ্ব সৃষ্টির ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। ছন্দ-বৈচিত্র্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যের বহুকাল ধরে প্রচলিত ছন্দে সূক্ষ্ম হলেও গভীর ও তীব্র পরিবর্তন সাধন করেন। যতি স্থাপনের জন্য চরণের আকারকে প্রধান্য না দিয়ে তিনি প্রাধান্য দেন ভাবের পূর্ণতাকে। আর তাতেই ঘটে যায় যুগান্ত। বিশ্বসাহিত্যের বোধ থেকে অর্জিত বীক্ষণ বাংলা সাহিত্যেও প্রয়োগ করেন তিনি। এর ফলেই সৃষ্ট সংশ্লেষণ উক্ত সম্ভাবনা ও প্রাণময়তার

উন্মেষ ঘটায়। মধুসূদন দত্তের জীবনের কাঠমো ও দর্শনে সংশ্লেষিত হয়েছে স্বদেশ ও উপনিবেশ, যা অন্তঃপ্রবাহ লাভ করেছে তাঁর সাহিত্যবোধে। প্রচলিতকে অতিক্রম করে যাওয়ার প্রবণতা এর জ্ঞান-আয়ুধ।সমাজের প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রবিন্যাস দিয়ে দর্শন এবং প্রদর্শনের মাধ্যমে নতুন বিন্যাস অর্জন করে সমাজদৃষ্টিভঙ্গির প্রচলিত অভ্যাস। ফলে সৃষ্টি হয় লেখকের চিন্তন প্রবহমাণতার অন্তহীন সম্ভাবনা ও এরশিল্পসূত্র।
উনিশ শতকের প্রারম্ভেই শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাঙালি সমাজের প্রচলিত অচলায়তন, সংস্কৃতির ওপরে ব্রিটিশ শাসিত ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রশাসন স্থাপিত হয়। এর ফলে, মানুষের বিশেষত নাগরিক মানসে সূচিত হয় সার্বজনীনতার বিনির্মাণতন্ত্র। সেই প্রক্রিয়াতেই রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সমাজচিন্তক 'সতীদাহ প্রথা' রদ, 'বিধবাবিবাহ' প্রবর্তন ও শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবৃদ্ধি করণার্থেসক্রিয় হন। রামমোহন রায়ের পরবর্তীকালের এবং ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমসাময়িক হলেও মধুসূদন দত্তপূর্বোল্লিখিত প্রসঙ্গসমূহকে সাহিত্যের বিষয় হিসেবে প্রয়োগ করেননি। যা অনুভব ও উপলব্ধি করা যায় না, তাকে আশ্রয় করে সাহিত্যসৃষ্টি করতে চেষ্টা করলে সেখানে বানিয়ে তোলার প্রচেষ্টা থাকে, যা হয়ে পড়ে কৃত্রিম। এ কারণেই ভারতের মুসলিমবর্গের ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক উপাদান সাহিত্যে প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেও তিনি তা নিজ সাহিত্যচর্চায় প্রয়োগ করেননি। *Rizia* নাটকে মুসলিম নারী চরিত্রকে সাহিত্যের উপাদন হিসেবে ব্যবহার করেন তিনি। কিন্তু সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার বা অভিজ্ঞতা ব্যতীত কোনো সংস্কৃতি বা ঐতিহ্যকে সাহিত্যে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা তৈরি হয়। বন্ধু রাজ নারায়ণকে লিখিত পত্রে (৭১ সংখ্যক পত্র) তিনি ইসলামিক ঐতিহ্য মহর্‌রমের সাহিত্যগত সম্ভাবনার বিশ্লেষণ করেন(ক্ষেত্রগুপ্ত, ২০০৯:৪৯৪)।তাঁর ধারণার গ্রহণযোগ্যতার অভিপ্রকাশ পরবর্তীকালে মীর মশার্‌রফ হোসেনের (১৮৪৭-১৯১২) *বিষাদসিন্ধু* (১৮৮৫-৯১) উপন্যাসে পরিলক্ষিত হয়। *মেঘনাদবধ* কাব্য রচনা শেষ করার পরে তিনি তাঁর বন্ধুকে চিঠিতে মহর্‌রমের এই সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন, (গোলাম মুরশিদ,২০২০ : ২১১) যা তাঁর সম্প্রদায়গত ঐতিহ্য ও ঐক্যচিন্তারই উপস্থাপক। কবিতায় মূলত থাকে ভাবনির্যাস। লেখকের প্রজ্ঞা ও পরিপার্শ্ব সমন্বিত উপলব্ধি থেকেই জন্ম নেয় কবিতার অর্থাৎ, সাহিত্যশিল্পের ভাবনির্যাস। ভাবনির্যাস শিল্পীর ভাষা ও ভাষ্য থেকে পাঠকের মননে সঞ্চারিত হয়ে বিনির্মাণ করেজাতীয় বা ঐহিত্যগত সাংস্কৃতিক আবেগ। সুতরাং, শিল্পীর আন্তরিক আবেগ ও উপলব্ধিই করে সাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা। এর স্থলে স্রেফ বানিয়ে তোলার প্রচেষ্টার ছাপ সাহিত্যকর্মকে করে তোলে কৃত্রিম। নাট্যসাহিত্যে পরিলক্ষিত হয় যে, মধুসূদন দত্ত স্বকীয় জীবনোপলব্ধির ও অনুষঙ্গের অনুবর্তী সংকটকেই চিহ্নিত করেন। এই সাহিত্যকর্মে সমাজের প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রবিন্যাস করার প্রক্রিয়া নিহিত থাকলেও তা হলো আত্মআবিষ্কারের প্রাবল্যজাত। বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যের অনুসারেই সমাজের প্রবিন্যাস পরোক্ষভাবে সাহিত্যকর্মে পরিণত হয়।

মধুসূদন দত্ত ১৮৫৬ সালে মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন। নিজের কলকাতাস্থ পৈতৃক সম্পত্তি এবং পেশাজীবন পুনরুদ্ধার ছিলো এসময়ে তাঁর বিশেষ লক্ষ্য। ব্যক্তিজীবনের অস্তিত্ব যখন প্রতিকূলতায় আকীর্ণ ছিলো, তখন বাংলার রাজনৈতিক আবহও ছিলো প্রতিকূলতা ও বিক্ষুব্ধতায় পূর্ণ। ১৮৫৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে সংঘটিত হয় 'সিপাহী বিদ্রোহ'। স্বাধিকার অর্জনের লক্ষ্যে এই বিদ্রোহের সূচনা ঘটে। বৈষম্য ও নিপীড়ন রোধে ১৮৫৯ সালে বাংলায় সংঘটিত হয় 'নীল বিদ্রোহ'। কলকাতার বাঙালি সমাজে এই সকল বিদ্রোহের প্রভাব ছিলো পরোক্ষ। এর কারণ, সমকালে জাতীয়তাবোধ প্রবল আকার ধারণ করেনি, কিন্তুসক্রিয় ছিলো স্বাজাত্যবোধ (গোলাম মুরশিদ, ২০২০ : ৪৭)। মধুসূদন দত্তের পূর্বোল্লিখিত ৭১ সংখ্যক পত্রে হরিশ মুখার্জির নাম উল্লেখ করা হয়েছে, যিনি ১৮৬১ সালে মৃত্যুবরণ করেন। হরিশ মুখার্জি ছিলেন সমসময়ে *Hindoo Patriot* (1853) পত্রিকার সম্পাদক, তিনি বিদ্রোহ প্রসঙ্গকে পত্রিকায় লেখনীর মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছিলেন এবং স্বাদেশিকতা বোধকে নিজ লেখনীর মাধ্যমে উজ্জীবিত করতে সচেষ্ট ছিলেন। সমকালের এই সকল রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও দৃঢ়ব্যক্তিত্বের চিন্তকবর্গের সঙ্গে মধুসূদন দত্তের সংযোগ তাঁকে কালস্পন্দন অনুভব করতে সাহায্য করে। তাঁর পূর্ববর্তীকালে রাজা রামমোহন রায় 'ব্রাহ্ম আন্দোলনে'র সূত্রে প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র উপনিষদের আলোচনা উপস্থাপন করেন। এর প্রভাবে ভারতবাসীর সাংস্কৃতিক জীবনও আলোড়িত হয়। পরবর্তীকালে, ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের বঙ্গানুবাদ করেন। মধুসূদন দত্তের পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *কৃষ্ণচরিত*তেও প্রাচীন ভারতীয় পুরাণের পুনঃপাঠ উপস্থাপিত হয়। এসকল রচনাকর্ম স্বাজাত্যবোধ থেকেই উৎসারিত হয়। *শর্মিষ্ঠা* (১৮৫৮), *পদ্মাবতী* (১৮৬০), *কৃষ্ণকুমারী* (১৮৬১) ও *মায়াকানন* (১৮৭৪) প্রভৃতি নাটকে মধুসূদন দত্ত পুরাণ ও ইতিহাসকে আশ্রয় করে বিনির্মাণ সাধন করেছেন। ঐ সকল উপাদান মূলত ভারতীয় জীবনেরই অংশ।

মধুসূদন দত্তের ট্রাজেডি ও ট্রাজেডিধর্মী নাটকসমূহ*শর্মিষ্ঠা*, *পদ্মাবতী*, *কৃষ্ণকুমারী* ও *মায়াকানন*প্রভৃতির মূলভূমিতে দেখা যায় নামকরণে সংশ্লিষ্ট নারীচরিত্রগুলোকে। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় (১৮৫৮-১৮৬১) রামনারায়ণ তর্কালঙ্কারের (১৮২২-১৮৬৮) *রত্নাবলী* (১৮৫৮) নাটকের অভিনয় উপভোগ করা মধুসূদন দত্তের নাট্যোপভোগের প্রথম অভিজ্ঞতা। তাঁর নাট্যচর্চার সূচনা প্রসঙ্গে অজিতকুমার ঘোষ (১৯১৯-২০০৫) মন্তব্য করেন :

> *রত্নাবলী* নাটকের অভিনয় উপলক্ষেই মাইকেল মধুসূদন নাট্যশালার সংস্পর্শে আসেন। পাইকপাড়ার রাজাদের অনুরোধে তিনি *রত্নাবলী* নাটকটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। রাজারা তাঁর মতে একটি নিকৃষ্ট নাটকের জন্য কত টাকা খরচ করছেন দেখে তিনি খেদ প্রকাশ করেছিলেন এবং জেদের বশে সংস্কৃত নাট্যরীতি বর্জন ক'রে পাশ্চাত্ত্য নাট্যরীতি অনুসরণে *শর্মিষ্ঠা* নাটকটি রচনা করেন। (অজিতকুমার ঘোষ, ২০১০ : ৪৭)

প্রথমত, মঞ্চায়নের জন্য মধুসূদন দত্ত নাট্যচর্চা শুরু করেন। দ্বিতীয়ত, *রত্নাবলী*র তুলনায় অধিক শিল্পমণ্ডিত নাটক রচনা ছিলো তাঁর নাটচর্চার শুরুর উদ্দেশ্য। ১৮৫৮ সালেই মধুসূদন দত্তের*শর্মিষ্ঠা* প্রকাশিত ও বেলগাছিয়া নাট্যশালাতেই অভিনীত হয়। সংস্কৃতজ্ঞ শিক্ষাবিদ রামনারায়ণ তর্করত্নের নাটকের সংস্কৃতজ্ঞানের পরিচয় বিধৃত রয়েছে এবং পাশাপাশি নাটকটি শ্রীহর্ষ-রচিত সংস্কৃত নাটক *রত্নাবলী*র বঙ্গানুবাদ (ক্ষেত্রগুপ্ত, ২০০৯ : ৬৩৭)। *রত্নাবলী*তে পৌরাণিক বিষয়, সংস্কৃত নাটকানুসারী সংলাপ ও সংগীত অর্থাৎ নাট্যভাষার উর্ধ্বে রয়েছে এ নাটকের মঞ্চায়ন উপযোগিতা। কিন্তু এমন নাট্যকৃতিতে শিল্পের প্রকাশ ও প্রক্রিয়াকে সীমায়িত হতে দেখেন মধুসূদন দত্ত। ফলে, ভিন্নতর শিল্পরুচি নিয়ে তিনি রচনা করেন নাটক*শর্মিষ্ঠা*। এই নাটকের বিষয় পৌরাণিক চরিত্র যযাতিকে আশ্রয় করে নির্ধারিত হয়। কিন্তু যযাতীর আখ্যানের মাধ্যমে নাট্যকারের সমকালের সামাজিক সমস্যার ভাবসংশ্লেষণের উপস্থাপন প্রয়াস লক্ষ করা যায়। সমকালের উপলব্ধি থেকে, সমকালকেই কনটেক্সট হিসেবে নাটকে যেমন প্রাগুক্ত প্রক্রিয়ায় দীনবন্ধু মিত্র উপস্থাপন করেন *নীলদর্পণ* নাটকে, তেমনি রামনারায়ণ তর্করত্নের প্রথম নাটক *কুলীনকুলসর্বস্ব* (১৮৫৪) সমকালীন সামাজিক সংকট এবং সংস্কারাচ্ছন্নতাকে আশ্রয় করে রচিত। সমাজে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা যেমন অসহায় আবার কুলীন হওয়ায় বর্ণপ্রথার অবাধ সুযোগ ভোগ করে কিছু মানুষ। সমাজের এই বৈষম্য যে নাটকে উপস্থিত হতে পারে এমন দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেন রামনারায়ণ তর্করত্ন। আরকুলীন বা ক্ষমতাবানের একাধিক বিবাহ প্রসঙ্গকে সামনে রেখেই মধুসূদন দত্ত রচনা করেন *শর্মিষ্ঠা* নাটক। সমকালের সংকটের কাছাকাছি পুরাণকেও স্থাপন করার দৃষ্টিকোণ এই নাটকে বিদ্যমান, যা নাটকটিকে স্বতন্ত্র করে তোলে। একইসঙ্গে নাটকের দৃষ্টিকোণও প্রণীত হয় বৈষম্যের শিকার হওয়া 'অসুর'দের প্রেক্ষণবিন্দু থেকে। দৈতরাজ বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠা চরিত্রটিও নাটকটির অভিলক্ষ্য। শর্মিষ্ঠার কনিষ্ঠ পুত্র পুরুর সাহসিকতা ও পিতৃভক্তি এই দানবমাতা এবং দৈত্যকুলকে নাটকে মহিমান্বিত করে। পুরুর আত্মত্যাগের প্রতিফলেই পিতা যযাতি সহস্রবছর যৌবনভোগ করে এবং দর্শনক্ষেত্রে উপলব্ধির নতুন সূত্র সংযোজন করে।[৫] অপরদিকে, দানবনন্দিনী শর্মিষ্ঠার পুত্র পুরুই পিতার আশীর্বাদে রাজ্যক্ষমতা অর্জন করে এবং পুরুই *মহাভারতে*র আদিপর্ব অনুসারে কুরু ও পাণ্ডবদের পূর্বপুরুষ। এছাড়াও নাটকটির প্রথমাঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে, প্রথম উক্তিতেই প্রহরারত দৈত্যের কণ্ঠে উচ্চারিত হয় সুর ও অসুরের সমরসম্ভাবনা। পাশাপাশি অসুর-ভূমির সৌন্দর্য বর্ণিত হয় ভূমিপুত্র[৬] দৈত্যের কণ্ঠে। নাটকে উচ্চকিত হয় অসুরের দৃষ্টিকোণ এবং স্বর। এই নাটকের রচয়িতা মধুসূদন দত্তও অবচেতনে যিনি একজন ভূমিপুত্র, তিনি বাঙালি ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির উপত্যকায় অবস্থান করে নাট্যসাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। নাট্যকার *শর্মিষ্ঠা* নাটক রচনার পরে জন্মগ্রহণ করা নিজ কন্যাসন্তানের নামকরণও করেন শর্মিষ্ঠা। ফলে স্পষ্ট হয় যে, দানবনন্দিনী শর্মিষ্ঠার প্রতি সংবেদনশীলতা লেখকের অভিপ্রেত। উনিশ শতকীয় সাংস্কৃতিক

প্রতিবেশে অবস্থান করে, পাশ্চাত্য জ্ঞানকাণ্ডের সূত্রে প্রাপ্ত প্রজ্ঞায় তাঁর নাটক *শর্মিষ্ঠা* ভারতীয় সংস্কৃতির একটি দার্শনিক প্রতিপাঠ।

উনিশ শতকীয় সমাজে সংস্কারাচ্ছন্নতার একটি বৃহৎ ক্ষেত্র বর্ণপ্রথা। ঔপনিবেশিক কালপর্বে উপনিবেশগুলোর আর্থ-সামাজিক কাঠামো পরিবর্তিত হতে থাকে। ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন ভারতীয় সমাজকে পরিচালিত করতে থাকে পুঁজিবাদের পথে। ফলে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কেন্দ্র উভয়ই স্থানান্তরিত হয়ে যায়। বিনয় ঘোষের (১৯১৭-১৯৮০) উল্লিখিত 'Push factor' (যুদ্ধ ও বিপর্যয়) ও 'Pull factor' (শহরের আকর্ষণ শক্তি)[৭] বাংলার বর্ণপ্রথাকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে করে দেয় অকার্যকর। ফলে, সাংস্কৃতিকভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদ পূজনীয় হলেও অর্থনৈতিক দিক থেকে উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণেরা হীন ও পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এই সামাজিক সূত্রে মধুসূদন দত্তের নাট্যসাহিত্যে ব্রাহ্মণ ও সংস্কারপন্থী বৈষ্ণব চরিত্রগুলো পশ্চাৎপদতা ও নেতিবাচকতা নিয়ে উপস্থিত হয়; যেমন *শর্মিষ্ঠা* ও *পদ্মাবতী* নাটকের দুইজন বিদূষক চরিত্র, প্রহসন *একেই কি বলে সভ্যতা?*র বাবাজী, *বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ*র ভক্তবাবু। সামাজিক বদ্ধচেতনার অন্তর্গত স্থাপনাকে অস্থিতিশীল করে তোলে নাট্যসাহিত্যের উক্ত চরিত্রগুলো। সুতরাং, মধুসূদন দত্ত সমকালের প্রাগ্রসর এবং সাংস্কৃতিক মুক্তির ভাবধারাকে অনুসরণ করে নাট্যচর্চায় উপনীত হন। নাটক যেহেতু দর্শক-শ্রোতার সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্তির একটি শিল্প মাধ্যম, ফলে স্বাভাবিকভাবেই একে হতে হয় সমকালের। সমাজ ও সংস্কৃতি নির্মাণে এই শিল্প আঙ্গিকের ভূমিকাও তাই প্রত্যক্ষ। মধুসূদন দত্ত নাট্যশিল্পের এই স্বকীয়তাকে বজায় রেখেই ভারতীয় ঐতিহ্যকে তাঁর শিল্পে করেন বিনির্মিত। আর এই প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে তিনি হয়ে ওঠেন সমকালের শিল্পরুচির প্রতিভূ।

শিল্পভাষা : সময়ের দায়

সেলিম আল দীন মনে করেন যে, বাংলা গদ্যে একটি গীতসুর অন্তর্নিহিত থাকে, একারণে কাব্যপথেই মধুসূদন দত্তের শিল্পভাষা যতটা স্বাচ্ছন্দ্য ও গতিময়, গদ্যপথে ততটা নয়। বরং গদ্যভাষা তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিতে তৈরি করেছে প্রতিবন্ধকতা (২০১১ তৃতীয় খণ্ড : ৪৪৯)। এই সূত্রে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, তাঁর নাট্যসাহিত্যের উচ্চবর্গীয় চরিত্রগুলোর ভাষায় সংস্কৃত নাটকের অনুরূপ শিল্পস্বভাব উপস্থিত রয়েছে। পাশাপাশি, স্বগত উক্তির মাধ্যমে নাটকের কাহিনিসূত্র প্রদান করা, একাধিক বিশ্লেষণমূলক পদের প্রয়োগ এবং সংগীতের মাধ্যমে ভাবসংবেদ আরোপণ ইত্যাদি তাঁর নাটকে স্বল্পমাত্রায় হলেও বিদ্যমান। কিন্তু, গদ্যভাষ্যে উৎকর্ষ সৃষ্টি হয়েছে এমনসব স্থানে যেখানে চরিত্ররা উচ্চবর্গীয় নয় এবং তাঁদের ভাষাও সংস্কৃতানুগ বা ইংরেজি নাটকে শেক্সপিয়রের (১৫৬৪-১৬১৬) ভাষানুগ প্রাচীনপন্থী নয়। নিম্নবর্গীয় চরিত্র যখন নিত্যতা নিয়ে তাঁর নাট্যসাহিত্যে উপস্থিত হয়েছে তখনই নাট্যসাহিত্যের প্রাণময়তা সঞ্চারিত হয়েছে। ফলে, *শর্মিষ্ঠা* নাটকের দানবনন্দিনী শর্মিষ্ঠা, দাসী পূর্ণিকা ও দেবিকা,

নটী; *একেই কি বলে সভ্যতা?*র গৃহস্থ নারীচরিত্র প্রসন্নময়ী, নৃত্যকালী, কমলা, হরকামিনী; *বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ*র ভগী, পক্ষী, পুঁটি বিশেষত ফাতেমা চরিত্র, *পদ্মাবতী* নাটকের সখী, কঞ্চু, পরিচারিকা; *কৃষ্ণকুমারী*র মদনিকা, ধনদাস, *মায়াকানন*ের সুনন্দা প্রভৃতি চরিত্র ভাষাপ্রয়োগে এবং নাট্যদ্বন্দ্ব সৃষ্টিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। নাটকের ঘটনাপ্রবাহকে এসকল ভূমিকাযুক্তিনিষ্ঠ করে তোলে। ভূমিপুত্রের ভাষাসৃষ্টি সর্বোপরি চরিত্রসৃষ্টিতে নাট্যকারের স্বতঃস্ফূর্ততা বাংলা ভাষার গতিপথকে চিহ্নিত করে। একইসঙ্গে তা চিহ্নিত করে বাংলা নাটকের শক্তির ও সম্ভাবনার ক্ষেত্রকে।

মধুসূদন দত্তের প্রতিটি নাটকেই অর্থাৎ *শর্মিষ্ঠা*, *পদ্মাবতী*, *কৃষ্ণকুমারী* এবং *মায়াকানন*ের মোট চারটি নাটকের প্রতিটিরই সংকট উৎস নায়িকা বা নারীচরিত্রসমূহ। নাটকের নামকরণ এবং কেন্দ্রীয় নাট্যদ্বন্দ্ব চরিত্র অর্থাৎ, ব্যক্তিমুখী হওয়ায় মধুসূদন দত্তের নাটকসমূহের আলোকপ্রক্ষেপ বিন্দুসমূহে ধ্রুপদী ভাবানুসরণ দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়। কিন্তু তাঁর এই চারটি নাটকই সমজাতীয় একটি সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের দায় বহন করে চলে। আর তা হলো, ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতির সারাৎসার নির্ণয় করা। এক্ষেত্রে, রোমান্টিকতার বাতাবহে আদর্শপন্থী প্রণয় মধুসূদন দত্তের উপলক্ষ্য এবং নাটকের পটপ্রেক্ষার উপাদানসমূহ হলো অভিলক্ষ্য। এর পটপ্রেক্ষাতেই আবৃত থাকে উনিশ শতকীয় সমাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতির অন্তঃসংস্থান।

শিল্পভাষ্য : সময়ের দায়

সময়জাত মনন মধুসূদন দত্তের নাটকে পুরাণ ও ইতিহাসের বিনির্মাণ ঘটায়। মূলত নাটকসমূহে সমাজ ও সংস্কৃতিতে বিদ্যমান বর্ণভেদ প্রথা, নারীর প্রতি নিগ্রহ, সর্বোপরি শাসনব্যবস্থায় বিদ্যমান ঐতিহ্যবিচ্যুত উন্মূলতা পুরাণ ও ইতিহাসের আখরে বিশ্লিষ্ট হয়। বিশেষত মধুসূদন দত্তের শিল্পসৌকর্যপূর্ণ নাট্যসাহিত্য *কৃষ্ণকুমারী*তে কুমারী কৃষ্ণা গ্রিক ট্রাজেডির রীতি অনুসারে নিয়তি তাড়িত নয়। আবার, শেক্সপিরীয় ট্রাজেডি অনুসারে ব্যক্তির কর্মফল ভোগীও নয়। যদিও দ্বিধা-দ্বন্দ্বই চরিত্রকে ভুলের পথে পরিচালিত করতে পারে এবং ট্রাজেডির কারণ তৈরি করতে পারে; কিন্তু কুমারী কৃষ্ণার মৃত্যু চরিত্রটির কোনো দ্বিধা থেকে সৃষ্ট নয়। বরং তার পূবসুরী সতী পদ্মিনীর আহ্বান এবং ধর্মপরায়ণতা অর্থাৎ ঐতিহ্যের অন্ধ অনুসরণ তাকে মৃত্যুর পথে পরিচালিত করে। মূলত তৎকালীন ভারতীয় সংস্কৃতিতে যেমন একজন নারীকে কোনো সামাজিক অপরাধ না করেও সতীদাহের কারণে মৃত্যুর শাস্তি ভোগ করতে হয়। একইভাবে, বিবিধ সামাজিক প্রথা-পদ্ধতির কারণে নারীই হয় সংকটভোগী। ফলে,নাটকটিতে হৃদয়বেদনা সৃষ্টি হলেও কোনো রূপ দ্বিধার জন্ম হতে দেখা যায় না।

কিন্তু, ট্রাজেডি নাটক অবশ্যম্ভাবীরূপে ট্রাজেডির নায়ক দাবি করে। অর্থাৎ, ট্রাজেডি সংঘটিত হতে প্রয়োজন হয় একজন ট্রাজিক নায়কের। *কৃষ্ণকুমারী* নাটকের ট্রাজিক নায়ক কে? অ্যারিস্টটল (খ্রি.পূ.৩৮৪-খ্রি. পূ.৩২২) *পোয়েটিকস্* গ্রন্থে গ্রিক ট্রাজেডিতে মানুষের জীবনের ট্রাজেডির কারণ নির্ণয় করতে নির্দেশ করেন যে, ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি

বা টাইপ চরিত্র যা অপরিবর্তনশীল এমন চরিত্র ট্রাজেডির নায়ক হতে পারে না। কুমারী কৃষ্ণার মৃত্যু অপর যে চরিত্রকে জীবিত থেকেও মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা এবং হাহাকার ভোগ করিয়েছে, তিনি কৃষ্ণার পিতা রাণা ভীমসিংহ। সেক্ষেত্রে, দ্বিধা বা 'error' দেখা যায় প্রধানতরাণা ভীমসিংহের ব্যক্তিত্বে। রাজ্যরক্ষার্থে রাণা ভীমসিংহ তাঁর পিতৃসত্তাকে অবদমন করেন। মন্ত্রী সত্যদাসের মন্ত্রণায় রাজা রাজ্য সংকট নির্মূল করতে কন্যার মৃত্যুর আদেশ দেন। সুতরাং, রাজ্যের স্তম্ভ স্বরূপ রাজার ব্যক্তিত্বের অন্তর্গত দ্বিধাই কৃষ্ণার মৃত্যু এবং একইসঙ্গে রাণা ভীমসিংহের অন্তর্দ্বন্দ্বের মূল কারণ। মূলত জাতীয় ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত রাজা তাঁর পিতৃসত্তাকে রাজার অবস্থান থেকে ভিন্নভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। ভারতীয় ঐতিহ্য সাক্ষ্য দেয় যে, প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে রাজা মাত্রেই পিতা এবং প্রজা মাত্রেই সন্তান। সমধর্মী সুর প্রত্যক্ষভাবে উচ্চারিত হয় মধুসূদন দত্তের শেষ নাটক *মায়কাননের* তরুণ রাজা অজয়ের কণ্ঠে। পাঞ্চালরাজের প্রেরিত দূতকে রাজার নীতি প্রসঙ্গে বলা হয় :

> আপনি বৃদ্ধ ও পণ্ডিত ব্যক্তি, বিশেষতঃ নীতিজ্ঞও বটেন? আপনি কি জানেন না যে, যে ব্যক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ কর্ত্তে অভিলাষ করে, তার রাজ্যই ভার্য্যা আর প্রজাবর্গই সন্তানসদৃশ হওয়া উচিত। (ক্ষেত্রগুপ্ত ২০০৯ : ৩৪৯)

ফলে, জৈবিক সন্তান কৃষ্ণার মৃত্যুতে রাজা অতিমাত্রায় শোকাহত হতে পারেন, কিন্তু যথার্থ দার্শনিক ও ঐতিহ্য অনুসারী রাজা কন্যা বা প্রজা উভয়ের প্রাণকেই অধিকতর মূল্যায়ন করবেন এবং প্রয়োজনে রাজ্যরক্ষায় সমরপন্থা গ্রহণ করবেন। এর প্রতিফলে, পরাজয় সম্ভাব্য হলেও আত্মপীড়ন এবং অন্তর্দহন সম্ভাব্য হয়ে ওঠে না। এই অন্তর্দহন যা বিবেকের তাড়নাজাত তা-ই মূলত এই নাটকের ট্রাজেডির উৎস। এই ট্রাজেডি আপন ঐতিহ্য বিস্মৃত রাজার উন্মূলতার দণ্ডস্বরূপ। সেখানে নারী বিনা অপরাধেই দণ্ডিত। ফলে, নাটকটি পরোক্ষভাবে ভারতীয় পুরাণ ও উনিশ শতকীয় সমাজের সাংস্কৃতিক চিত্রের প্রতিবেদন ধারণ করে।

কৃষ্ণকুমারী নাটকে রাণা ভামসিংহের বিপরীতে রাজস্থানের অপর একাধিক রাজন্যকে সমরের ঘোষণা করতে দেখা যায়। ১৫২৭ সাল পরবর্তীকালে সম্রাট আকবরের (১৫৪২-১৬০৫) রাজস্থানে শাসন প্রতিষ্ঠার পরবর্তীসময়ে রাজস্থানের সকল রাণা তাঁর আধিপত্য মেনে নেননি। সেসময় থেকে রাজস্থানের রাজনৈতিক ইতিহাস জটিল সমীকরণের রূপান্তরিত হয়। শের শাহ্-কেও (১৪৭২-১৫৪৫) দেখা যায়, রাজপুত রাজন্যদেরকে শক্তিতে পরাস্ত করতে না পেরে কৌশলের আশ্রয় নিতে। এমনই একটি স্বাধীনচেতা জাতি মধুসূদন দত্তের নাটকের পরিপ্রেক্ষিত বা বস্তুভিত্তি। তিনি রাজস্থানের সংকটাপন্ন রাজনৈতিক আবহের ইতিহাস থেকে এমন একটি বিষয়কে তাঁর *কৃষ্ণকুমারী* নাটকের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করেছেন যেখানে আপাতদৃষ্টিতে মূলালোক কুমারী কৃষ্ণার প্রতি আপতিত থাকলেও নাটকের অবস্থিত সংকটচেহারার মূল উৎসনিহিত রয়েছে এর শিল্পবস্তুতে। অর্থাৎ, কৃষ্ণাকে কেন্দ্র করে ট্রাজেডি রচনা করার সূত্রে নাট্যকার ভাগ্যাহত

ভারতীয় রাজার দার্শনিক সংকটকেও স্থান দেন এর ক্যানভাসে। একটি উপনিবেশিত সময়ে উপনিবেশিত ভূমির স্থানিক ও কালিক ঐতিহ্য, ইতিহাসকে সাহিত্যে রূপদানের মধ্যে যেমন লেখকের স্বাদেশিকতার বোধ নিহিত থাকে, তেমনি এরূপ সাহিত্যবোধ লেখকের শিল্পীমানসের অবচেতনে গ্রথিত সময়ের দায়কেও ধারণ করে।

পরিশেষে, বন্ধু রাজনারায়ণকে লিখিত পত্রে মধুসূদন দত্ত মিথলজির প্রতি বিশেষত ভরতবর্ষীয় মিথের প্রতি নিজের একাগ্রতা ও আবেগ অভিব্যক্ত করেন। পত্রে তিনি উল্লেখ করেন যে, 'He (Madhusudan himself) didn't care pin's head for hinduism, I love the grand mythology of our ancestors, it is full of poetry (ক্ষেত্রগুপ্ত, ২০০৯ : ৫২৫)। পত্রটিতে একইসঙ্গে প্রকাশিত হয় হিন্দুত্ববাদের প্রতি বিবিক্তি। ফলে, ভারতীয় সংস্কৃতির ভেতর থেকে সংস্কারকে ছেকে ফেলে বিশুদ্ধ চেতনাকে আবিষ্কার করেন তিনি। উনিশ শতকের প্রারম্ভকালের যুগাবহ ব্যক্তি মানুষের আত্মদ্বন্দ্ব জন্ম দেয়। এসময়ে বেড়ে ওঠা ব্যক্তিমানুষ রোমান্টিক সত্তাস্পৃষ্ট হয়েই বোহেমিয়ান হয়ে পড়ে। উপনিবেশের ফাঁদেমগ্ন ও ভগ্ন স্রোতে ভেসে উন্মূলিত হয় উপনিবেশিত মানুষ। মধুসূদন দত্ত এতদ্‌সত্ত্বেও উন্মূল নন। তিনি ভারতীয় মিথকে ও তার শক্তিকে আবিষ্কার করে উচ্চারণ করতে পারেন, 'A fellow with an inventive head can manufacture the most beautiful things out of it.' (প্রথমোক্ত সূত্র)। মধুসূদন দত্তের নাট্যসাহিত্যের উপলক্ষ্য পুরাণকথা যা তাঁর ভাবনাপ্রতিভারই ছায়ানুসৃতি। নাট্যশালা, ট্রাজেডি নির্মাণ, সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য রীতির সংশ্লেষণ প্রভৃতির রূপদৃশ্যের মুকুরে গ্রথিত হয়ে থাকে একটি প্রবল অহম। যশোর থেকে কলকাতায় পরিবেশে, সর্বোপরি বৃহৎ বৈশ্বিক পরিবেশে নিজের আত্মবোধকে প্রত্যুজ্জ্বল করে তোলার অভিপ্রায়ে তিনি সর্বদা শিল্পসাধনা অব্যাহত রাখেন। সময়কে পরাজিত করে খ্যাতিমান হওয়ার অভিপ্রায় বারংবার উল্লিখিত হয়েছে তাঁর পত্রে। উপনিবেশিত সময়ে অবস্থান করে, উপনিবেশের আলোকে উদ্ভাসিত হয়েও তিনি দগ্ধ হননি। ভারতীয় পুরাণের আপন আলোয় আত্মকে, স্বাদেশিকতাকে তিনি তাঁর নাট্যসাহিত্যে করে তোলেন অমেয়।

টীকা

১. একটি প্রজন্ম দ্বারা উপনিবেশিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিফলে বেড়ে ওঠা মানুষদের নির্দেশ করা হয়েছে। এই প্রজন্ম বর্ধিত হয়েছিলো একটি গোষ্ঠীকে আশ্রয় করে, যার কেন্দ্র ছিলেন ডিরোজিও। ১৮২৮ সালে হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১) হিন্দু কলেজের সাহিত্য ও ইতিহাসের শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ উদার কথোপকথন ও স্বাধীন তর্ক-বিতর্ক করার সুযোগ-প্রদানের জন্য শিক্ষার্থীরা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়। বালকদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটায় ডিরোজিওকে কেন্দ্র করে একটি গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। এই গোষ্ঠীই 'ইয়ং বেঙ্গল' শিরোনামে পরিচিত। 'ডিরোজিওর সংস্রবে আসিয়া হিন্দু কলেজের ছাত্রগণের মনে মহাবিপ্লব ঘটিত লাগিল' (শিবনাথ শাস্ত্রী, ২০০৯ : ৬১)। মধুসূদন দত্ত ডিরোজিওর শিষ্য ছিলেন না। ডিরোজিও মৃত্যুবরণ করার পরে ১৮৩৭ সালে তিনি হিন্দু কলেজে

ভর্তি হন। 'তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে, খ্রিস্টান হলে তাঁর এ বিয়ে ভেঙে যাবে। এমন কি, বিলেতে যাওয়ার পথটাও তা হলে প্রশস্ত হতে পারে। ... হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে সবার আগে সাহেবী পোশাক পরেন, সবার আগে মাতাল নামে বিখ্যাত হন। সবার আগে বঙ্গদেশ থেকে দূরে গিয়ে চাকরি খোঁজেন। সবার আগে শেতাঙ্গিনী বিয়ে করেন। এসব কাজে তাঁর কোনো লজ্জা অথবা সংকোচ ছিলো না, বরং নিজেকে অন্যদের কাছে জাহির করার মনোভাব ছিলো।' (গোলাম মুরশিদ, ২০১৫ : ১৩১)।

২. ১৮৬১ সালে *মেঘনাদবধ* রচনার পূর্বেই তিনি ইংরেজি নাটক *রিজিয়া* রচনা করেন। 'মাদ্রাসে *Rizia*নাটক লেখার মাধ্যমেই নাটক রচনায় তিনি হাত মক্স করেছিলেন। এছাড়া কাহিনী নির্মাণে তাঁর একটা স্বাভাবিক পটুত্বও ছিলো। হিন্দু কলেজের আমল থেকেই তিনি কবিতার মধ্যেও কাহিনী নিয়ে আসতে আরম্ভ করেছিলেন।... আখ্যানমূলক কবিতায় তাঁর হাত খুলতোও ভালো।...*Rizia*-য় যে-নাটকীয়তা ছিলো, *শর্মিষ্ঠায়* তা অনেকাংশে অনুপস্থিত।' (গোলাম মুরশিদ, ২০২০ : ১৬৩)।

৩. ১৮২৮ সালে রাজা রামমোহন রায় কলকাতায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমাজ ব্রাহ্ম আন্দোলনের একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ। রামমোহন রায় ১৮১৫ সালে অবসর গ্রহণের পরে তিনি কলকাতায় বসবাস করতে শুরু করেন। রাখালচন্দ্র নাথ উল্লেখ করেন যে, 'রামমোহন রায়ের ধর্মীয় সংস্কার ছিল সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের হাতিয়ার। (রাখাল চন্দ্র নাথ, ২০১৬ : ২)

৪. খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করার পরে মধুসূদন দত্ত বিশপস্ কলেজের হোস্টেলে কিছুকাল বসবাস করেন। এসময় তিনি প্রচুর বিদেশি সাহিত্য পাঠের সুযোগ লাভ করেন। ফলে, তিনি সাহিত্যপাঠে বুদ হয়ে পড়তেন, এসময়ে তাঁর মদ্যপানের অভ্যাস তাঁকে পীড়িত করতো। হোস্টেলের ডাইনিংয়ে মদ্য পরিবেসন করা হতো। কিন্তু, এক্ষেত্রে ইংরেজ ছাত্ররাই অগ্রধিকার লাভ করতো। বৈষম্যের এই চেহরা তিনি বিদেশে যাত্রকালসহ পরবর্তী জীবনের সর্বদা প্রত্যক্ষ করেছেন। বৈষম্যের শিকার হওয়ার ফলেই তিনি নিজেকে জাহির করার স্বভাব আত্মস্থ করেন। কিন্তু বৈষম্যের নানা স্তর যে তাঁকে ব্যথিত করতো তার অভিপ্রকাশ রয়েছে তাঁর সাহিত্যকর্মে স্বর ও বয়ান সৃষ্টির অভ্যন্তরে। দানবনন্দিনী শর্মিষ্ঠা, রাক্ষস রাবণ, মেঘনাদ চরিত্রসৃষ্টি, ভারতীয় পুরাণের বিনির্মাণে ভারতীয় রাজার স্বরূপ সৃষ্টির মাধ্যমে। (গোলাম মুরশিদ, ২০২০ : ৮৪-৮৭)

৫. সহস্রবছর যৌবনভোগের মাধ্যমে যযাতি উপলব্ধি করেন যে, 'কাম্যবস্তুর উপভোগে কামের উপশম হয় না। পৃথিবীতে সমস্ত ধন ও সমস্ত রমণী সম্ভোগ করলেও পরিতৃপ্ত হয় না।' (সুধীরচন্দ্র সরকার, ১৪১৬ : ৪৪৭)

৬. 'ভূমিপুত্র' শব্দটি Native-শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। উপনিবেশিত দেশগুলো বা ভূমিগুলোতে (যেমন এশিয়া, আফ্রিকা) যে মানুষেরা বসবাস করে তাদের বলা হয় ভূমিপুত্র। ঔপনিবেশিক শক্তি ইউরোপ উপনিবেশগুলোতে একটি এলিট শ্রেণি তৈরির কাজ করত। তাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারের সূত্রে এই শ্রেণিতে স্থান লাভ করত উপনিবেশগুলোর সম্ভাবনাময় যুবকেরা। তারা মানবতাবাদের কথা বলত এবং তাতে থাকত উপনিবেশগুলোর মানুষগুলোর হীনতার উন্মোচন। এদেরকে ঝা পল সার্ত্র (১৯০5-১৯৮০) তাঁর রচনায় 'ভূমিপুত্র' হিসেবে চিহ্নিত করেন। (আমিনুল ইসলাম ভুঁইয়া, ২০০৬ : ভূমিকা)

৭. ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন শুরু হওয়ার পরে বাংলার বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত যুদ্ধ ও বিপর্যয় মানুষকে কলকাতামুখী করে। হিন্দু বণিকদের প্রতি ইংরেজদের উদার ব্যবহারের কথা প্রচারিত হলেও মানুষ উচ্চবিত্ত নিম্নবিত্ত নির্বিশেষে কলকাতামুখী হয়। এই অবস্থা যা মানুষকে কলকাতার দিকে ঠেলে দিয়েছে তাকেই বিনয় ঘোষ Push factorহিসেবে চিহ্নিত করেন। আর

কলকাতায় পুঁজিলাভের ও টিকে থাকার প্রচারণা মানুষকে করেছে আকর্ষিত। একেই চিহ্নিত করা হয়েছে Pull factorদ্বারা। (বিনয় ঘোষ, ২০০৯ : ৬৬)

সহায়ক গ্রন্থ

আমিনুল ইসলাম ভুইয়া [অনূদিত] (২০০৬)। *জগতের লাঞ্ছিত*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
ক্ষেত্রগুপ্ত [সম্পা.] (২০০৯)। *মধুসূদন রচনাবলী*। সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।
গোলাম মুরশিদ (২০২০)। *আশার ছলনে ভুলি*। আনন্দ, কলকাতা।
গোলাম মুরশিদ (২০১৫)। *রেনেসন্স বাংলার রেনেসন্স*। অবসর, ঢাকা।
বিনয় ঘোষ (২০০৯)। *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা*। প্রকাশ ভবন, কলকাতা।
রাখাল চন্দ্র নাথ, (২০১৬)। *উনিশ শতক ভাব-সংঘাত ও সমন্বয়*। কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা।
শিবনাথ শাস্ত্রী (২০০৯)। *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*। নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা।
সুধীরচন্দ্র সরকার [সংকলিত] (১৪১৬)। *পৌরাণিক অভিধান*। এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, কলকাতা।
সেলিম আল দীন (২০১১)। *রচনাসমগ্র* ৩। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
সেলিম আল দীন (২০১১)। *রচনাসমগ্র* ৯। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
স্বপন বসু ও ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী [সম্পা.] (২০০৩)। *উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি*। পুস্তক বিপণি, কলকাতা।
ব্রাত্য বসু, 'হিঁদু বাবার কেরেস্তান ছেলে', (২০২৩)।
https://www.anandabazar.com/editorial/essays/essay-all-you-need-to-know-about-michael-madhusudandutt/cid/1404488#goog_rewarded
Aristotle (2021).*Poetics*.Classics, India.